সূচী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বংশ : প্রায় আড়াইশো বছর আগে হৃদয়নাথ ত্রিবেদী নামে জনৈক পশ্চিম দেশীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া বৈদ্যপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর প্রপৌত্র বলভদ্র জেমো রাজবাড়ীতে বিয়ে করে জেমোয় বাস করতে থাকেন। বলভদ্রের পুত্র কৃষ্ণসুন্দর, কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর, গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর।

জন্ম : ২০.৮.১৮৬৪/৫ ভাদ্র ১২৭২/জেমোকান্দি।

শিক্ষা : এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম ১৮৮২/এফ. এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় ১৮৮৪/বিজ্ঞানে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম ১৮৮৬/ বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম ১৮৮৭/পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ১৮৮৮।

কর্মজীবন : ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক রূপে রিপন কলেজে যোগদান। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমরণ ঐ কলেজের অধ্যক্ষ।

সাহিত্য কর্ম : পঠদ্দশায় প্রবন্ধরচনার সূত্রপাত। প্রথমে 'নবজীবন' পত্রিকায় ও পরে 'সাধনা', 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ। কালানুক্রমিক গ্রন্থতালিকা : প্রকৃতি (১৩০৩), পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা (১৩০৭), জিজ্ঞাসা (১৩১০), ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ (১৩১৮), চরিতকথা (১৩২০), কর্মকথা (১৩২০), বিচিত্র প্রসঙ্গ (১৩২১), শব্দকথা (১৩২৪), যজ্ঞকথা (১৩২৭), বিচিত্র জগৎ (১৩২৭)।

মৃত্যু : ৬,৬,১৯১৯ / ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ / কলকাতা।

জিজ্ঞাসা

নিবেদন

বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল। কয়েকটি প্রবন্ধের প্রচুর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। 'আত্মার অবিনাশিতা,' 'মাধ্যাকর্ষণ,' 'মাক্সওয়েলের ভূত,' 'প্রকৃতি-পূজা' এই চারিটি প্রবন্ধের নামেরও পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে জ্ঞানিসমাজ যে সকল জাগতিক তথ্য নিরূপণের জন্য ব্যাকুল, তন্মধ্যে কতিপয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য বিষয় বিতণ্ডার ক্ষেত্র। বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের মত সঙ্কলনে যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে ঐ সকল দুরূহ তত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকারের এই প্রয়াস জিজ্ঞাসামাত্র। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় স্বতন্ত্রভাবে বাহির হইয়াছিল। একই বিষয়ের আলোচনা ঘটায় বহু স্থলে পুনরুক্তি হইয়াছে। তাহার পরিহারের উপায় দেখি না।

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু আশঙ্কা করি, সেই সূত্রের অনেক স্থলে অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের দশ-বৎসরব্যাপী আলোচনায় লেখকের মতের পরিবর্ত্তন ও ও পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট অনুকম্পা প্রার্থনা করি।

কলিকাতা
ফাল্গুন, ১৩১০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

* * * * *

দশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে 'জিজ্ঞাসা' বাহির করিয়াছিলাম ; তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ এত দিনে বাহির হইল।

এই সংস্করণের প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ধরিয়া কালানুক্রমে সাজাইয়াছি। কেবল অতিপ্রাকৃত সম্পর্কে দুইটি প্রবন্ধ ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থলে প্রকাশিত হইলেও আলোচ্য বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া একত্র পর পর রাখিয়াছি। উত্তাপের অপচয় প্রবন্ধটি পুরাতন, উহার নামটি নূতন। 'প্রকৃতি-পূজা' নামক প্রবন্ধটিকে সরাইয়া আমার 'কর্ম্ম-কথা' নামক পুস্তকে গত বৎসর স্থান দিয়াছি ; এই জন্য 'জিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয় সংস্করণে উহা থাকিল না।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পরবর্ত্তী কালে লিখিত চারিটি নূতন প্রবন্ধ এই দ্বিতীয় সংস্করণে যোগ করিয়াছি। 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধটি ১৩০৫ সালে 'পুণ্য' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তখন উহা ছোট ছিল ; এখন নূতন কলেবরে বড় হইয়াছে। অতি-প্রাকৃত সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে' বাহির হয়। 'মায়াপুরী' নামক প্রবন্ধটি ১৩১৬ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। পরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল. মহোদয় ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ বিবিধ-বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ধারাবাহিক ভাবে পাঠের সঙ্কল্প ও ব্যবস্থা করেন ; সেই সঙ্কল্পের সূচনা ও প্রবর্ত্তনার জন্য ঐ প্রবন্ধ গঠিত হয়। ১৩১৬ সালের 'সাহিত্য' পত্রে উহা মুদ্রিত হয় এবং সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র পুস্তি-কাকারে প্রচারিত হয়। 'দেবালয়' নামক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলাম। তজ্জন্য উক্ত সমিতি ১৩১৭ সালের ৭ই ভাদ্র কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুট হলে যে সভা আহ্বান করেন, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহোদয় তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ প্রবন্ধ 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির প্রকাশের তারিখ সূচীপত্রে নির্দ্দিষ্ট হইল।

আমি দুই বৎসর হইতে মস্তিষ্কপীড়ায় অবসন্ন ; ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রবন্ধগুলির সম্যক্ সংশোধন করিতে পারি নাই। প্রুফের মুখে যা কিছু সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছি। ইচ্ছামত প্রুফ দেখিবারও ক্ষমতা না থাকায় ছাপার ভুলও বহু স্থলে রহিয়া গিয়াছে। পাঠকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সুখ না দুঃখ ?

মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায় বা যে যা বুঝে, তাহারই জন্য অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতর প্রাণীর পক্ষে সুখের চেষ্টাই জীবনপ্রবাহ, এবং স্থূল হিসাবে সুখান্বেষণ-চেষ্টার ফলেই জৈবিক অভিব্যক্তি। এ স্থলে সুখ কি, সুখের অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতর্ক তোলার প্রয়োজন নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে, সে তাহাই লক্ষ্য-স্বরূপে গ্রহণ করে। একের উদ্দেশ্য—একের লক্ষ্য পদার্থ অন্যের প্রার্থনীয় হউক আর নাই হউক, নিজ নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চেষ্টার সমবেত ফলে জগৎ চলিতেছে; জীবজগতে অভিব্যক্তি তাহার ফলেই ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তি-প্রণালী স্থূল কথায় এই।

যদিও আবহমান কাল ধরিয়া মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, তথাপি মানবের জীবনে সুখের ভাব অধিক, কি দুঃখের ভাব অধিক, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহু কাল হইতে এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে জীবনে সুখের মাত্রা নিশ্চিতই অধিক; অন্য পক্ষ বলেন, দুঃখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিক মাত্রায় পাইয়াছেন; তাহারা সুস্থ চোখে সকলই সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ আপন জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্যশালী নহেন; তাঁহাদের রুগ্ন চক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্ব্বলতায় তাঁহাদের শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পঙ্ক হইতে উঠিয়া সুখের শুষ্ক বর্ত্মে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতামত আপন আপন জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়া মাত্র; জগতে সুখদুঃখের তারতম্য নির্ণয়ে তাঁহাদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর, তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা; নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে, তাহা ঠিক দেখিবার উপায় থাকিলে এতদিন মীমাংসা হইয়া যাইত। কেন না, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন স্বভাবদত্ত চশমা চোখে না দিয়া থাকিতে পারেন না; কাজেই কেহ বলেন এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্।

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই:—জীবনে সুখ অধিক, জীবনের অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন? মানুষ যে বাঁচিতে চায়,—অবশ্য দুই চারিটা আত্মঘাতীকে বর্জ্জন করিয়া—ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে। মানবজীবনে দুঃখের ভাগ অধিক হইলে মানবের জন্য দড়ি কলসী যোগান এত দিন বিরাট ব্যাপার হইত; বসুধা এত দিন জীবহীন মরুভূমিতে পরিণত হইত। আধিব্যাধি,

মরণ-যাতনা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, প্রণয়ে কৃত্রিমতা, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, সকলের উপর ধর্মের মুখোস্-পরা অধর্ম্মের জয়জয়কার, এ সব নাই এমন নহে; তবে স্নেহ দয়া ভক্তি মমতা সরলতা প্রেম, ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এই সকলও জগতে বর্ত্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহার-নিদ্রা সম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও অত্যন্ত ব্যাপৃত; নতুন অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি ব্যাপারটা এতদিন লোপ পাইত, এবং সমাজতত্ত্বজ্ঞদিগকে অভিব্যক্তবাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বরক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রকে নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। কেন না দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্দ্ধনই অভিব্যক্তির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য; দুঃখ না থাকিলে অভিব্যক্তি ঘটিত না; অভিব্যক্তি যখন ঘটিতেছে, তখন দুঃখ আছে বইকি। নিরবিচ্ছিন্ন সুখলাভই মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীবনের প্রবাহ সেই উদ্দেশ্যের মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা সমাজের পক্ষে মোটের উপর সুখপ্রদ, তাহাই ধর্ম্ম, আর যাহা দুঃখপ্রদ বা মোটের উপর দুখপ্রদ, তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মের এইরূপ তাৎপর্য্য শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে, কিন্তু 'সুখ' শব্দটার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চ অর্থ প্রয়োগ করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ শব্দে কেবলই নিম্ন পর্য্যায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক সুখই বুঝিতে হইবে, এমন আইন নাই। সুখ কি? না যাহাতে জীবন বর্দ্ধন করে, এবং জীবনবর্দ্ধনের ন্যায় মহৎ উদ্দেশ্য আর কি আছে? এইরূপে সুখ শব্দটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। যাহা হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি ক্রমশঃ হইতেছে, ইতিহাস যদি ইহা সমর্থন করে, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে বলিতে হইবে। কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্ব্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রা অপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক নতুবা লোকে জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত; ধর্ম্মনীতি উল্টাইয়া যাইত; দয়াদাক্ষিণ্য পাপের পর্য্যায়ে ও চুরি ডাকাতি ধর্ম্মের পর্য্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের লিখিত পুঁথি কয়খানা জগতের দৃশ্যপটকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শান্তি, প্রীতি ও মাধুর্য্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা দ্বেষ শোণিততৃষ্ণা ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্তরসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম! জীবজগতে বিদ্যমান এই নির্ম্মম দ্বন্দ্ব আবার মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির মূল, এ কথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি অক্ষের অভিনয় যে শীঘ্র থামিবে, এরূপ ভরসা অল্প।

কিন্তু যাঁহারা জগতের বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে নবগঠিত ধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছি, হর্বাট স্পেন্সর ইহার এক জন প্রধান প্রচারক; এবং হর্বাট স্পেন্সর একালের অভিব্যক্তিবাদের এক জন প্রধান 'পাণ্ডা'।

ডারুইনের প্রদর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই দুঃসাহসিক ব্যাপার হয়; কেন না, হিংসা ও রক্তপাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আবার সুখ কি? রক্তপাত করিয়া ঘাতকের আপন মনের মত তৃপ্তি কিয়ৎপরিমাণে জন্মিতে পারে; কিন্তু সেও ক্ষণিক মাত্র; কেন না, জঠরজ্বালারূপ সদাতন মহাদুঃখ নিবারণের জন্যই জীবের এই হত্যাব্যবসায়; এবং আহার সম্পাদনের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান, তাহার পরোপকার-বৃত্তি যে সে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হয়, এবং তজ্জন্য সে পরার্থ জীবনদান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, ডারুইনতত্ত্বের অন্যতর প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ আলফ্রেড ওয়ালাস ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস এ-হেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, হিংসা আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই। হত্যাকর্ম্মের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কর্ম্মটা নিষ্পন্ন হইতেছে, সে ততটা ভয় পায় না। দয়াশীলা প্রকৃতির এমনই সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না; এমন কি, তাহার বোধশক্তি হননকালে লোপ পায়, এরূপ অনুমানের হেতু আছে। প্রহারের দর্শন শ্রবণ বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে তেমন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষা করিতে সম্মত হইবেন কিনা সন্দেহ। তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়ালাসের প্রয়াস কত দূর সফল হইয়াছে, বলা যায় না। প্রহারভোগে যেন ক্লেশ খুব অল্প হইল বা না হইল, তবে প্রহারদর্শনও ত নিত্য ঘটনা। এবং প্রহারদর্শনে যদি দুঃখ হয় ও প্রহারের নিবারণও যদি অসাধ্য হয়, তবে জগতে দুঃখের লোপ হইল কই? আবার দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায়; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। একের অস্তিত্ব অন্যের সাপেক্ষ। আবার দুঃখ হইতে মুক্তির চেষ্টাই ত অভিব্যক্তি। কাজেই দুঃখ অস্তিত্বহীন বলিতে গেলে বর্ত্তমান জীবনদ্বন্দ্বমূলক অভিব্যক্তিবাদই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ওয়ালাসও যে স্বপ্রচারিত অভিব্যক্তিবদের এই মূলোচ্ছেদে সম্মত হইবেন, তাহা বিশ্বাস হয় না। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখের লঘুকরণের অভিমুখী এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ও-পক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান! কই, খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য; পক্ষান্তরে দুঃখের মত সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান; ধনী কয়টা?

অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায়? আবার অধর্ম্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম্ম অধিক, না অধর্ম্ম অধিক? ধার্ম্মিক যেখানে দুইটা, অধার্ম্মিক সেখানে দু-শটা; আবার ধার্ম্মিক দুইটার ধার্ম্মিকত্ব প্রমাণসাপেক্ষ; অধার্ম্মিক দু-শটার অধার্ম্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবনচেষ্টা যাহাকে বল, সে ত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াস মাত্র। কিন্তু হায়, অধিকাংশ স্থলে সেই প্রয়াস কি পণ্ডশ্রম মাত্র নহে? আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। কামনা বা আকাঙ্ক্ষা লইয়াই জীবনের সমুদয় কার্য্য; বুদ্ধি, কি চিন্তা কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত কামনারই ভরণপোষণ ও পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত। সেই কামনার অর্থ কি? না, বর্ত্তমান অভাবের, বর্ত্তমান ক্লেশের দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে কামনা থাকিত না, জীবনের প্রয়োজন থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের স্রোত হইল, দুঃখময়তার দূরীকরণের নিষ্ফল প্রয়াসেই জীবনের সমাপ্তি হইল, সেখানে জীবন দুঃখময়, কি সুখময়, তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবন-প্রবাহও রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা, সুখের ইচ্ছা নহে, উহা দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা; তবে নিষ্কৃতি ঘটে না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছুই নাই? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহাতেই বা কি দেখা যায়? ধর, সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয়, তত কমে, দুঃখ যত থাকে, তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায়; দুঃখকে সুখ হইতে কখনও দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক হিংসা ঈর্ষ্যা পরিতাপ সবই দুঃখময়; যৌবন স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাব মাত্র; ধন মান প্রণয় সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ; স্নেহ দয়া মমতা, ইহারা ত অধিকাংশই দুঃখেরই মূল; জ্ঞান ধর্ম্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়।" যে জ্ঞানী, যে ধার্ম্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক; তাহার দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠ-পাথরের আবার দুঃখ কি?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, অতএব ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি প্রখর; নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভবশক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখও অধিক। ফিজি দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায়; বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে: কার দুঃখ অধিক?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে।

মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকটে মানুষের পূর্ণ অধীনতা সপ্রমাণ করে মাত্র। মানুষ অন্ধ শক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে; ফাঁদ এড়াইতে গিয়া ফাঁদে পা দিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না; তথাপি সে বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য। বুদ্ধিমান্—যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

একালের দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যান অগ্রণী। সুখের আশা নাই; সভ্যতার বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর; কামনা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যে সমাহিত হউক। স্ফূর্ত্তিমান ইংরেজ যে মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায়; কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মনিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, ভাল বুঝা যায় না।

এদেশের দার্শনিকদের মুক্তিবাদ বা নির্ব্বাণবাদ এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, ফল দাও, পশু দাও, প্রজা দাও বলিয়া যাঁহারা যাগাগ্নিতে হব্যধারা ঢালিতেন, তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তির ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধ পন্থায় তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে জীবলোকের মুক্তি প্রদানের চেষ্টাই ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন। তার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে। যিনি যখন বুদ্ধগৌতমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা; কামনা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মুক্তি লাভ করিবে। আধুনিক ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে, কাব্যে যাহা দেখি, তাই কবির নিজ জীবনের অনুভবের প্রতিবিম্ব মাত্র। কালিদাস যে কখনও সুখ ও সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না; ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে "প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" বলিয়া ফুৎকার উড়াইয়া দিয়া কেবল সৌন্দর্য্যদর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন, বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য-অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর, বৈরাগী হইও না; ইহাই রামায়ণের উপদেশ। শেক্ষপীয়রের মনঃকল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেখানেই শেক্ষপীয়র জীবনের রহস্যভেদের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেখানেই প্রীতির নৈরাশ্য, ধর্ম্মের অবমাননা ও জীবনের নিষ্ফলতায় উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছেন।

বন্ধু-শোকার্ত্ত টেনিসন বিশ্বলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃতদেহের সহিত জগৎ-সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা কখনও বা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা ;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে ; কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন তাহার খেয়াল হইবে, নিষ্ঠুর ভাবে তখনই তোমায় বলিদান দিবে ; তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান জীবের জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন গভীর উদ্দেশ্য আছে বুঝা যায় না।

মোট কথা, পুরস্কারের আশা নাই ; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না ; প্রকৃতির এই উপদেশ।

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক্ দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

সত্য

যে সকল জাগতিক ব্যাপারকে আমরা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, সত্য নাম তাহার সর্ব্বত্র উপযুক্ত কি না, বিচার করিয়া দেখিলে অনেক স্থলেই সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে আমরা সর্ব্বদা নিরপেক্ষ সত্য বা পূর্ণ ধ্রুব সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা বিচারে সাপেক্ষ সত্যের বা অপূর্ণ অধ্রুব সত্যের স্বরূপে প্রকাশ পায়। যাহাকে সনাতন সার্ব্বভৌমিক সত্যরূপে অকুণ্ঠিত ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহার সত্যভাব সঙ্কীর্ণ-দেশব্যাপী অথবা সঙ্কীর্ণ-কালব্যাপী দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে কোন্ ব্যাপারকে সত্য বলিব, তাহা নিশ্চয় করা বড় সহজ নহে। সত্যের লক্ষণ নির্ণয়ের জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই বোধ করি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নাই। হর্বট স্পেন্সর প্রচলিত লক্ষণগুলির সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, কোনটিই বিচারমুখে দাঁড়ায় না। স্পেন্সর নিজেও সত্যের একটি সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমরা যাহার অন্যথা কল্পনা করিতে পারি না, তাহাই সত্য। যেমন কালের আরম্ভ ও দেশের সীমা। কালের আরম্ভ আমাদের কল্পনায় আইসে না ; আকাশের পরিধি আছে, তাহাও আমাদের কল্পনার অগোচর। সুতরাং কালের অনাদিতা ও দেশের অসীমতা, এই দুইটা স্পেন্সরের

সংজ্ঞামতে সত্য। আবার জড়ের ও শক্তির অনশ্বরতা, এই দুইটাও ঐ হিসাবে সত্য। দর্শনশাস্ত্রে একটা প্রচলিত বাক্য আছে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না—অসৎ হইতে সৎ জন্মে না। জড় ও শক্তির উৎপত্তি নাই ও ধ্বংস নাই, এই তত্ত্ব এই ব্যাপকতর সত্যের অন্তর্গত। মোটের উপর 'কিছু-না' হইতে ইহাদের উৎপত্তি এবং 'কিছু না'তে ইহাদের লয় আমাদের ধারণায় আইসে না; সুতরাং উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

আমাদের কল্পনায় আসে না, আমরা ধারণা করিতে পারি না—এই বাক্যেই গোল থাকিল। যাহা আমাদের কল্পনায় আসে না, তাহা অন্যের কল্পনায় আসিতে পারে। আমরা যাহা কল্পনা করিতে পারি না, আর কেহ যে তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না, এরূপ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং যাহা আমাদের নিকট সত্য, তাহা স্বচ্ছন্দে অন্যের নিকট অসত্য হইতে পারে; তাহাকে পূর্ণ সত্য, নিরপেক্ষ সত্য, এরূপে নির্দ্দেশ করিলে আমাদের অধিকারের সীমা ছাড়িয়া যাইতে হয়। দেশের সসীমতা আমরা কল্পনা করিতে পারি না; হয়ত এমন জীব আছে, যাহাদের মানসিক বৃত্তি আমাদের অপেক্ষা পূর্ণ, তাহারা আকাশের অবধি কল্পনা করিতে সমর্থ; শুধু সমর্থ কেন, হয়ত আমাদের কল্পিত অসীম আকাশকে তাহারা স্পষ্টই সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়। এরূপ জীবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু অপূর্ণ জ্ঞান লইয়া আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, এরূপ জীব বর্ত্তমান নাই। হেলমহোলৎজ ক্লিফোর্ড প্রভৃতি পণ্ডিতেরা আমাদের এইরূপ অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেখাইয়াছেন যে, ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাগুলিকেও পূর্ণ সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে আমরা অধিকারী নহি। লবাচুস্কী ও রীমানের সময় হইতে যাঁহারা জ্যামিতিবিদ্যাকে পুনর্গঠিত করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের পরিচিত আকাশকে অসীম মনে করা আবশ্যক বোধ করেন না। জড় পদার্থের ধ্বংস নাই, এই সত্যের আবিষ্কার করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা আস্ফালন করিতেন; কিন্তু ইলেক্‌ট্রনের আবিষ্কারের পর হইতে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে মূকতা আশ্রয় শ্রেয়ঃ বোধ করিয়াছেন।

ফলতঃ, সত্য অর্থে যাহা আমাদের পক্ষে সত্য; নিরপেক্ষ নহে—সাপেক্ষ; পূর্ণ নহে—আংশিক; সার্ব্বভৌমিক নহে—প্রাদেশিক; সনাতন নহে—তাৎকালিক। স্পেন্সরের দত্ত সত্যের সংজ্ঞাও বিচারের ধারে খণ্ডিত হইয়া এইরূপ দাঁড়ায়।

আর একটা ব্যাপার বহু দিন হইতে এইরূপে সত্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে Uniformity of Nature; বাঙ্গালায় ইহাকে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি চিরদিন একই নিয়মে কাজ করে;—প্রকৃতির খেয়াল নাই। অর্থাৎ অতিপ্রাকৃত ঘটনা,—যাহাকে ইংরেজীতে মিরাকল বলে,—প্রকৃতিতে কোথাও তাহার স্থান নাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিব কি না, ইহা লইয়া তর্কসংগ্রাম বহুকাল চলিয়াছে; শীঘ্র যে সেই সংগ্রাম নিরস্ত হইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। তবে মিরাকল শব্দের অর্থটা স্পষ্ট সম্মুখে রাখিলে বিবাদের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসে। অসাধারণ ঘটনামাত্রই অতিপ্রাকৃত নহে,

মিরাকল নহে। তাহা হইলে ফারাডে ক্রুক্‌স্‌, অথবা নিকলা তেসলার আবিষ্কৃত ব্যাপার গুলার ন্যায় অবিশ্বাস্য মিরাকল উহাদের আবিষ্কারকালে কিছুই ছিল না। সুতরাং অতিপ্রাকৃত অর্থে অসাধারণ নহে; অতিপ্রাকৃতের অর্থ প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচারী বা বিরুদ্ধচারী। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অপূর্ণ, এবং চিরকাল অপূর্ণই রহিবে। জ্ঞানের পরিধির অন্তর্গত আলোকিত প্রদেশের অপেক্ষা জ্ঞানের পরিধির বাহিরে অন্ধকারময় দেশের প্রসার চিরদিনই অধিক থাকিবে। অতএব এই ব্যাপার প্রাকৃত নিয়মের বহির্ভূত, নিঃসংশয়ে এরূপ নির্দ্দেশ করিতে কাহারও সাহসে কখন কুলাইবে বোধ হয় না। এটা প্রাকৃত, ওটা অতিপ্রাকৃত, এরূপ নির্দ্দেশ কখনই চলিবে না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, যাহা আপাততঃ অসাধারণ অপরিচিত ও নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কালক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধি-সহকারে তাহা সাধারণ পরিচিত ও নিয়মানুযায়ী স্বরূপে প্রকাশিত হইবে। আমাদের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে এখন মনে হইতে পারে, প্রকৃতির নিয়ম এইখানে ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানের সীমা প্রসারিত হইলে দেখা যাইবে, প্রকৃতির নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই। নিয়ম এই ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, ঐ ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়াছে কি না, তাহা লইয়া তর্ক করিতে ইচ্ছা হয় কর; কিন্তু তাহার মীমাংসায় উপনীত হইবার ক্ষমতা এখন আমাদের নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই পর্য্যন্ত আশা করেন যে, কালে প্রতিপন্ন হইবে, প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গে না। অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই, মিরাকলের স্থান নাই, প্রকৃতিতে খেয়াল নাই, নিয়ম আছে। প্রকৃতির চপলতা নাই,—ইহা একটা সত্য।

ফলে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা—নেচারে ইউনিফরমিটি—একটা সত্য এবং অতি-প্রাকৃতের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি মাঝে মাঝে যে আক্রমণ হয়, তাহাতে এই সত্যের ভিত্তিমূল নড়াইতে পারে না। যাহা কিছু জ্ঞানগোচর, তাহাই প্রকৃতির অঙ্গ; তাহা যতই অদ্ভূত হউক না, তাহা প্রাকৃত; তাহা অতিপ্রাকৃত কিরূপে হইবে? অভিনব অদ্ভূত ঘটনা, যাহাতে মানুষে বিশ্বাস করিতে চায় না, তাহা পূর্ব্বে কখন ঘটিতে দেখা যায় নাই, তাহা অলীক ও অমূলক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে প্রাকৃত নিয়মের অতিচারী, তাহার প্রমাণ হয় না। কোন নিয়মের অনুযায়ী, তাহা শীঘ্র বাহির হইতে না পারে; কিন্তু কালে বাহির হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ভূয়োদর্শন এইরূপ বলে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতি পত্রে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

সুতরাং প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা একটা সত্য। কিন্তু কেমন সত্য? প্রকৃতিতে নিয়ম আছে, খেয়াল নাই। কে বলিল? ভূয়োদর্শন বলিয়াছে। নিয়মের লঙ্ঘন এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সূর্য্য একই নিয়মে ঘুরিতেছে; নদী একই নিয়মে চলিতেছে; বায়ু একই নিয়মে বহিতেছে। আবার প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদের পরিচিত মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি যে নিয়মে এত কাল চলিতেছিল, সেই নিয়মের হিসাবেই হালীর ধূমকেতু ঘুরিয়া আসিয়াছিল ও নেপচুনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ভূয়োদর্শন বলিতেছে, আজ যে নিয়মে জাগতিক কার্য্য চলিতেছে, হাজার বৎসর

পূর্ব্বেও ঠিক সেই নিয়মে চলিয়াছিল। আবার হাজার বৎসর পরে কেমন চলিবে তাহাও আমরা গণিয়া বলিতে পারি। গণনা ও ঘটনা উভয়ে মিল ভিন্ন অমিল কখনও দেখা যায় নাই।

কিন্তু একটা কথা আছে, ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থে ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহু কাল ব্যাপিয়া দর্শন ও বহু দেশ ব্যাপিয়া দর্শন; উহা চিরকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃও বহু নগণ্য মাত্র! উভয়ের তুলনা হয় না।

মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম, কালি ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটি বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম। কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? আবার মাধ্যাকর্ষণের যে নিয়ম লোষ্ট্রখণ্ডে আছে, তাহাই চন্দ্রে আছে, পৃথিবীতে আছে, শনৈশ্চরের মেখলাতে আছে ও বরুণ গ্রহের পার্শ্বচরে আছে, লুব্ধক তারকা ও তাহার অনুচরে আছে; কিন্তু সর্ব্বত্র আছে কে বলিল? ভূয়োদর্শনের দৃষ্টি তত দূর বিস্তৃত নহে; সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর নাই। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের যে সার্ব্বভৌমিকত্ব বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহা অনেকটা গায়ের জোর মাত্র।

সূর্য্য আজ যেমন উঠিয়াছে, কাল তেমনই উঠিয়াছিল, পরশু তেমনই উঠিয়াছিল, আমার জীবনের ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তেমনই ভাবে উঠিতেছে, তোমার জীবনের আশী বৎসরেও সেই নিয়মে উঠিয়া আসিতেছে; এবং মানব-জীবনের গত অযুত বৎসর ও পৃথিবীর জীবনের গত লক্ষাধিক বৎসরও সেই এক নিয়মই প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই দেখিয়া সাহস করিয়া বলিয়া থাকি, কালও সূর্য এই নিয়মে উঠিবে; দশ বৎসর, সহস্র বৎসর, কি কোটি বৎসর পরেও সেই নিয়মে উঠিবে। ইহারই নাম গণনা। গণনাও এ পর্য্যন্ত কখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় নাই। তাই গণনাতে আমাদের বিশ্বাস ও সাহস। এ পর্য্যন্ত যত মানুষ জন্মিয়াছে, তাহার অধিকাংশই মরিয়াছে। কাল পর্য্যন্ত যাহারা ছিল, তাহাদের অনেকে আজ নাই। তাই ভরসা করিয়া বলি, আমি মরিব, তুমি মরিবে, যাহারা এখন আছে, তাহারা সকলেই মরিবে, যাহারা জন্মিবে, তাহারাও মরিবে। সাহসের সহিত আমরা গণিয়া বলি; গণনাও সফল হয়; তাই গননাতে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু এই সাহসের মাত্রা সময়ে সময়ে কিছু অধিক বলিয়া বোধ হয়। দুঃসাহস অনেক সময় বিপদের মূল হইয়া দাঁড়ায়। নির্ব্বাপিত আগ্নেয় পর্ব্বতের পাদদেশে অতিবিশ্বাসী মানুষ ঘর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে; একদিন অকস্মাৎ অগ্নিগিরি অগ্ন্যুদ্গার করিয়া ধ্বংস কার্য্য সমাধান করিয়া তাহার অনুচিত সাহসের প্রতিফল দেয়। এখানে মানুষ তাহার ভূয়োদর্শন কর্ত্তৃক প্রতারিত হয় মাত্র। তেমনি আমাদের ভূয়োদর্শন যে আমাদিগকে প্রতারিত করিতেছে না, কে বলিল? কে বলিল, জগদ্‌যন্ত্র গত শত বৎসর যাবৎ যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিতে থাকিবে? সূর্য্য এতকাল যে যে নিয়মে চলিয়াছে, কালও সেই নিয়মে চলিবে, তাহার নিশ্চয় কি? সকলে মরিয়াছে, বলিয়া আমাকেও মরিতে হইবে, কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সূর্য্য সম্ভবত, কাল

উঠিবে, সম্ভবতঃ আমাকেও একদিন মরিতে হইবে। অর্থাৎ ভুয়োদর্শনের উত্তরে নিশ্চয় নাই, সংশয় আছে। নিয়মের শিকল পর-মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে; আজ যাহা নিয়ম, কাল তাহা অনিয়মে পরিণত হইতে পারে।

উত্তরে বলিতে পার, ইহাতেও নিয়মের অভাব প্রতিপন্ন হইল না। ঘড়ির স্প্রীং ভাঙ্গিতে পারে, ঘড়ির চাকায় মরিচা ধরিয়া চাকা থামিতে পারে, যে নিয়মে ঘড়ির কাঁটা চলিতেছিল, তাহা আপাততঃ রহিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রম প্রমাণ হইল না। একটা সংকীর্ণ নিয়মের বন্ধন ছাড়িয়া আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের বন্ধন উপস্থিত হইল মাত্র। ব্যাবেজ সাহেবের কল্পিত ঘড়ি এক দুই তিন ক্রমে বাজিতে বাজিতে নয় হাজার নয় শত নিরানব্বই পর্য্যন্ত যথাক্রমে বাজিয়া যায়: শ্রোতা যখন দশ হাজার শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকে, তখন উহা সহসা পাঁচ হাজার তিন বাজিয়া সমুদয় গণনা ওলট-পালট করিয়া দেয়। তাই বলিয়া এই ঘড়িকে অনিয়ত বলা যায় না। জগদ্‌যন্ত্রকে এইরূপে ব্যাবেজ সাহেবের কল্পিত ঘটিকার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জগদ্‌যন্ত্র কোনখানে আপাততঃ বিকল বোধ হইলেও বস্তুতঃ নিয়মের অধীনতা এড়াইতে পারে না। আর একটা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন হয় মাত্র।

আমরাও বলিতেছি তাহাই। আমাদের ভুয়োদর্শন কেবল সঙ্কীর্ণ দেশব্যাপক সঙ্কীর্ণ কালব্যাপক নিয়মের বিষয়েই জ্ঞান জন্মায়। তদপেক্ষা ব্যাপকতর নিয়ম, যাহার ক্ষেত্রের পরিসর অধিক, তৎসম্বন্ধে ভুয়োদর্শন কিছুই বলিতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি সীমাবদ্ধ না হইল, তাহা হইলে আমরা সাহসের সহিত নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম, অমুক সময়ে অমুক ঘটনা ঘটিবে। কিন্তু তাহা যখন পারি না, তখন গণনামাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনিশ্চিত না হইয়া পারে না। তবেই দেখা গেল, প্রকৃতি যে চিরকালই আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানানুমত প্রচলিত পরিচিত নিয়মে চলিবে, এরূপ বলিবার আমাদের অধিকার নাই।

প্রকৃতির কিয়দংশ চিরকাল গণনার বাহিরে থাকিবে; আমাদের গণনা সময়ে ব্যর্থ হইবে। তাই বলিয়া কি বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত পদ্ধতি দূষিত? বলা বাহুল্য, প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতায় বিশ্বাস রাখিয়া বৈজ্ঞানিক তাঁহার সমুদয় ভবিষ্যৎ গণনা সম্পাদন করেন। এই সত্য যদি অমূলক হয়, তবে বিজ্ঞানের কোন গণনাতেই বিশ্বাস স্থাপন চলে না। বিজ্ঞানের অবলম্বিত পদ্ধতি অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে।

আমরা তত দূর বলি না। কালের আদি নাই, আকাশের সীমা নাই, জড়ের বিনাশ নাই, শক্তির সৃষ্টি নাই, এই কথাগুলাও যেমন এক হিসাবে সত্য; প্রাকৃত নিয়মের ব্যত্যয় হয় না, প্রকৃতির খেয়াল নাই, এটাও কতকটা সেইরূপ হিসাবে সত্য। পরন্তু, বৈজ্ঞানিকের অবলম্বিত বিচারপ্রণালী ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী মূলতঃ পৃথক্ নহে। শয়নে ভোজনে উপবেশনে আমরা প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা স্বতঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লই; না মানিলে আমাদের জীবনযাত্রা চলে না। যিনি মানেন, তিনি জিতেন, যিনি মানেন না, তিনি ঠকিয়া যান। অনাগতবিধাতা ও যদ্ভবিষ্যের গল্প উপকথা মাত্র নহে। জীবনসংগ্রামে অনাগতবিধাতার জয়,

ষণ্ডবিষ্যের অকালমরণ। মুখে যাহাই বলি, কার্য্যে আমরা প্রকৃতির চপলতায় বিশ্বাস করি না। নিশান্তে ক্ষুধার উদ্রেক নিশ্চিত জানিয়া আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বদিন হইতে করিয়া রাখি। হেমন্তের ফসল পাকিবে জানিয়া বর্ষারম্ভে চাষা ধান্য রোপণ করে। চিত্রগুপ্তের তলব অনিবার্য্য জানিয়া জীবনবীমায় টাকা দিয়া থাকি। প্রকৃতিকে চপল জানিলে কোন চেষ্টার দরকার হইত না। প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস না থাকিলে এত দিন মানবজাতিকে কঙ্কালমাত্র রাখিয়া ধরাধাম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইত।

প্রকৃতির শাসন কঠোর শাসন। নিয়মে বিশ্বাস কর—প্রকৃতির আদেশ। বিশ্বাস কর, নতুবা মঙ্গল নাই। নিয়ম পালন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। মানবজাতি পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে মোটের উপর নিয়ম পালন করিতেছে; তাই এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে।

প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা একটা সত্য কথা। এই হিসাবে সত্য। প্রাণভয়ে বা প্রসাদের আশায় জল উঁচু স্বীকার করিতে হয়। একরূপে প্রাণের দায়ে ইহাকেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবনরক্ষা যদি কর্ত্তব্য হয়, ইহাও তবে সত্য বলিয়া মানিতে হইবে।

জগতে যতগুলা সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একটা সত্য সকলের উপর সত্য। আর সকলই তার নীচে। আমি আছি, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর দ্বিতীয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই। জীবনযাত্রার আরম্ভ এই সত্যে—বিশ্বাস। যদি কোন সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। বস্তুতই ইহা পরমার্থিক সত্য। এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে আরও কতগুলি সত্যে বিশ্বাস করিতে হয়। যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না, বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেই আমরা সত্য বলি। কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। মানুষের যাবতীয় বিজ্ঞান এই ব্যবহারিক সত্য লইয়াই কারবার করে। জগৎযন্ত্রের গতির পর্য্যালোচনা করিয়া এই সকল সত্যের আবিষ্কার করিতে হয়। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সকল সঙ্কীর্ণ প্রাকৃতিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূয়োদর্শন যত বাড়ে, এই সকল সত্যের মূর্ত্তিও তেমন পরিবর্ত্তিত হয়। চিরকাল এক মূর্ত্তি থাকে না। এই সকল সঙ্কীর্ণ আলৌকিক সত্যের মধ্যে আবার সবচেয়ে ব্যাপক সত্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতা।

স্পেনসরের স্বীকৃত সত্যের তাৎপর্য্য অপেক্ষা এই তাৎপর্য্য একটু ব্যাপকতর। তবে উভয়ে কোন বিরোধ নাই। জগদ্‌যন্ত্রে ব্যবস্থা নাই, নিয়ম নাই, এরূপ কল্পনায় আনা আমাদের অসাধ্য। মনে করিতে গেলে মনের গ্রন্থি ও জীবনের গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়।

মানবজীবনের সহিত সুতরাং সত্যের সম্বন্ধ। মানবকে বাঁচিতে হয়, সেই জন্যই এটা সত্য, অসত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পাঠক যদি মনে করেন, সত্যের গৌরব লঘূকৃত হইল, তাহা হইলে উপায় নাই।

জগতের অস্তিত্ব

তর্কশাস্ত্রে লাঠির যুক্তি নামে একটা অমোঘ বিচার প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। খ্রীষ্টান যাজকেরা এককালে গ্যালিলিয়োর মত ব্যক্তির উপর ইহা প্রয়োগ করিতেন এবং ইতিহাসে লেখে যে, এই পরাক্রান্ত যুক্তিবলে প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিকের জীবন্ত দেহের চিতাগ্নির আলোকে ইউরোপের তামস যুগের আঁধার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

শুধু মানুষের অপবাদ দেওয়া যায় না, প্রকৃতি-মাতা স্বয়ং তাঁহার যত্নপালিত ক্ষীণকায় মানব-সন্তানগুলির প্রতি এই কঠোর যুক্তির প্রয়োগে কুণ্ঠিত হন না। তাঁহার কঠোর শাসনে আমাদিগকে এমন অনেক কথা মানিয়া লইতে হয়, যাহা অন্যরূপ বিচার প্রণালীর সম্মুখে টিকে কি না সন্দেহ। সত্য বলিয়া স্বীকার কর, নতুবা জীবন যাত্রা চলিবে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয়। ডারইনের সময় হইতে জীবিকার মুখ্য সাধন উদরতর্পণের মাহাত্ম্য সহস্রগুণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। জীবজগতের সমুদয় অভিব্যক্তি স্থূলতঃ এই একমাত্র ব্যবসায়কে আশ্রয় করিয়া ঘটিয়া আসিয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যাখ্যাতেও সেই উদরপূরণের ও জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগিতার দিকে বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হয়। যাহা না মানিলে জীবন-যাত্রা চলে না, তাহাই সত্য; এইরূপে সত্যের তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে আজি-কালি কেহ কেহ সাহসী হইতেছেন। আজিকালি মাত্র; কেন না, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ দুঃসাহস অবলম্বন করিলে খ্রীষ্টান-যাজক-শাসিত নব জেরুসালেমে নির্দ্দেশকারীর জীবনযাত্রা বর্দ্ধিত না হইয়া সংক্ষিপ্ত হইবার অত্যন্ত সম্ভাবনা ছিল।

যাহা হউক, সত্যের এইরূপ সংজ্ঞা মানিয়া লইলে একটা কঠিন সমস্যার একরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে। সমস্যাটা আর কিছু নহে, জগতের অস্তিত্ব। সাধারণ মানবগণ অন্ন-পানাদির আহরণে এত নিবিষ্টভাবে ব্যাপৃত আছে যে, জগতের অস্তিত্ববিষয়ে তাহাদের মনোমধ্যে কস্মিন্‌কালে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পায় না। কিন্তু কতকগুলি অতিবুদ্ধি লোকে জগতের অস্তিত্বটা একেবারে লোপ করিতে বসেন। প্রচলিত তর্কশাস্ত্রের পন্থা এতই বিভিন্নমুখ যে, সেই পথ ধরিয়া একটা স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার। এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সত্য, অন্য সম্প্রদায়ের মতে ইহা একেবারে কাল্পনিক। প্রচলিত বিচারপ্রণালী উভয়বিধ সিদ্ধান্তে নিরীহ মনুষ্যকে টানিয়া লইয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যবিধান বড় ভরসাস্থল নহে। বোধ করি, সেই জন্যই নিরাশমনে লাঠির যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়।

যদি জগৎ থাকে, তবে উহার স্বরূপ কি, এ প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, এ কথাটারও আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হয় নাই; জগতের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া আত্মা জড় শক্তি দেশ কাল প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের

এমনই একটা স্তূপ আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে যে, মানুষকে পথহারা বা আত্মহারা হইতে হয়। কেহ বলেন জগৎ এক, কেহ বলেন দুই, কেহ বা বলেন জগৎ বহু। কেহ বলেন জগৎ অনাদি, নিত্য; কেহ বলেন সাদি, সৃষ্ট। কাহারও মতে জগতের অস্তিত্ব আমার বর্ত্তমান কালের সংব্যাপী। আমি যত দিন, জগৎও তত দিন। আবার অন্যের মতে অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই দুইটা কথার কথা। অতীত বর্ত্তমানকে নিয়মিত করে; বর্ত্তমান ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া চলে; অতএব তিনই যুগপৎ বর্ত্তমান। গাড়ী চাপিয়া রাজপথে চলিলে উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাগুলি যেমন একটার পর একটা, একটার পর একটা চোখের সামনে পড়ে, তেমনই জীবনপথের যাত্রী জগতের ঘটনা-পরম্পরা একের পর এক, একের পর এক, এইরূপে দেখে মাত্র; অট্টালিকার সারি যেমন যুগপৎ বিদ্যমান, জাগতিক ঘটনাসমূহও তেমনই একই কালে বর্ত্তমান। কেবল জীবনযাত্রার পথে পর পর চোখে পড়ায় কোনটা অতীত, কোনটা বর্ত্তমান, কোনটা ভবিতব্য বলিয়া মনে হয়। কেহ বলেন, জগতের স্রোত একটানে নিরবচ্ছেদে বহিয়া আসিতেছে। আবার কাহারও মতে সেই স্রোত একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক একটানা প্রবাহ নহে; জোনাকি পোকার আলোকের মত, মনুষ্যহৃদয়ের স্পন্দনের মত, সেই স্রোত, এই আছে এই নাই, এই আছে এই নাই, এই-রূপ করিয়া ক্ষণিক অস্তিত্ব ও ক্ষণিক নাস্তিত্বের পরম্পরামতে বহিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপের ছবি যেমন দ্রুতগতি পর পর বদলাইয়া যায়, দুইখানা ছবির মাঝের ব্যবধানটুকু বুঝা যায় না; তেমনই জগতের দৃশ্যপট এত দ্রুতগতিতে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে যে, দৃষ্টি-ভ্রান্ত মানুষ মাঝের নাস্তিত্বের ব্যবধানটুকু টের পাইতেছে না। যাহা হউক এই সকল পরস্পরবিরোধী মতের মূলে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং অস্তিত্বের বিচারে ইহাদিগকে টানিয়া আনার দরকার নাই।

জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দুইটা অংশ পাওয়া যায়। প্রথম আমি ও দ্বিতীয় আমা-ছাড়া, অর্থাৎ আমার বাহিরে আর যাহা কিছু আছে, তাহা। 'আমি' শব্দের অর্থ এ স্থলে ঠিক সেই হস্ত-পদযুক্ত শরীরী জীব নহে যাহার উপভোগের নিমিত্ত এই বিশাল দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান। 'আমি' শব্দের অর্থ এখানে সেই, যে অনুভব করে চিন্তা করে, ইচ্ছা করে। অনুভূতি চিন্তা কামনা, ইহা যদি চৈতন্যের লক্ষণ বলা যায়, তবে আমি অর্থে আমার মধ্যে যে চেতন। 'আমা-ছাড়া'র অর্থ সেই চেতন আমাকে বাদ দিলে জগতের অবশিষ্ট সমগ্রটা, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার অনুভূতির বিষয়, আমার চিন্তার উদ্বোধক, আমার ইচ্ছার প্রয়োগক্ষেত্র। এই অর্থে বাহিরের জড় জগৎ ব্যতীত আমার ভৌতিক শরীর পর্য্যন্ত আমার বাহিরে। জগতের অস্তিত্ব বলিলে আমার অস্তিত্ব ও আমার বহিঃস্থ এই জগতের অস্তিত্ব, এই দুই বুঝিতে হইবে।

প্রথম আমার অস্তিত্ব। এই বিষয়টাতে দুই-মত-হইবার বড় উপায় নাই। কেন না, আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমার অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য। ইহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অপর যাবতীয়

সিদ্ধান্তের প্রমাণ এই স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভর করে। পাঠকের দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই; নতুবা এইখানেই লেখনীকে বিরাম দিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ্য হইতাম।

তার পর বাহিরের, অর্থাৎ আমা-ছাড়া জগতের কথা। এইখানেই যত গণ্ডগোল। আপাততঃ বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলাম। বহির্জগতের খানিকটা আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, ইন্দ্রিয়গোচর, অপর খানিকটা অনুমানগোচর। তোমার ভৌতিক শরীর আমার প্রত্যক্ষ বিষয়, তোমার অন্তঃশরীর বা মানসশরীর আমার অনুমানগোচর। প্রত্যক্ষ ভাগের সহিতই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংস্পর্শ। সেই সংস্পর্শ হইতে তোমার অনুমানগোচর ভাগটার ও সমগ্র তুমিটার অস্তিত্ব আমি টানিয়া লই। কিন্তু সংস্পর্শ বলিলে ভুল হয়। উভয়ের মাঝে এত ব্যবধান যে, স্পর্শ বলিলে অভিধানের প্রতি বিশেষ অবিচার হয়। আমি তোমাকে কখন ছুঁই না; তোমার সাধ্য নহে যে, তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পার। কতকগুলা সংকেত লইয়া আমি কারবার করি। সংকেতগুলা রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়। সংকেতগুলা কোনরূপে তোমার নিকট হইতে আসিয়া আমার নিকট পৌঁছে। কিন্তু সেই সংকেতের সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য নাই। টেলিগ্রাফের কেরাণী কাঁটার আক্ষেপ দেখিয়া স্থির করেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট বসিয়াছে। কেতাবের শাদা কাগজে কালির আঁচড় দেখিয়া আমরা নিউটনের চিন্তাপরম্পরা বুঝিয়া লই। কিন্তু কাঁটার আন্দোলনের সহিত পার্লেমেণ্টের, অথবা ছাপা হরপের সহিত নিউটনের চিন্তাপ্রণালীর যে সাদৃশ্য, তোমার সহিত তোমার রূপ-রস-গন্ধাদির সাদৃশ্য তার চেয়েও অল্প। তোমার শরীর হইতে চারি দিকে আকাশে ধাক্কা লাগে। সেই ধাক্কা আসিয়া চক্ষুর পটে লাগে। স্নায়ুযোগে সেই ধাক্কা মস্তিষ্কে নীত হইয়া মস্তিষ্কের স্থান-বিশেষে বিশেষ এক রকম আন্দোলন উপস্থিত করে। সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে তোমার রূপবিষয়ে আমার অনুভূতি জন্মে। আকাশের ধাক্কা মস্তিষ্কে পৌঁছান পর্য্যন্ত এক রকম বুঝা যায়। কিন্তু মস্তিষ্কের আন্দোলনের সঙ্গে রূপানুভূতির সম্বন্ধ বুঝা যায় না। সাদৃশ্য ত কিছুই নাই; সম্বন্ধ একটা আছে, সাহচর্য্য ও পারম্পর্য্য লইয়া। এই সম্বন্ধ লইয়া সংকেত। যখনই সেইরূপ আন্দোলন, তখনই সেইরূপ অনুভূতি। তাই যখনই সেই অনুভূতি জন্মে, তখনই তার কারণস্বরূপ তোমার অস্তিত্ব ধরিয়া লই। অনুভূতিটা আমার অংশ, আমার মানস শরীরের এক কণিকা, উহাই আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। এই হিসাবে উহা সত্য। তোমার অস্তিত্ব আমার অনুমান, আমার বুদ্ধিশক্তির একটা কারিগরি, একটা সৃষ্টি, একটা কল্পনা। এই কল্পনাটাতে আমার দৈনিক কাজকর্ম্ম চলিয়া যায়; তার উপর ভর করিয়া আমার জীবনের দৈনিক আয়-ব্যয়ের বাজেট তৈয়ার করি; সাবধান হইয়া চলিলে জীবনযাত্রা বেশ এক রকম চলে, কিন্তু মাঝে মাঝে ঠেকিতে হয়, প্রতারিত হইতে হয়। তখন ফাজিল অঙ্ক আসিয়া পড়ে। চিরজীবনটা সঙ্কেতের উপর ভর করিয়া চালাইয়া থাকি। সঙ্কেত লইয়া কারবার করিতে হইলে মাঝে মাঝে ঠকিতে হয়। টেলিগ্রাফের কেরাণী ইহা বেশ বুঝেন। কাঁটা নড়িল, সঙ্কেত পাওয়া গেল; কেরাণী মহাশয় সঙ্কেত পাঠ করিয়া একটা সংবাদ

খাড়া করিলেন ; কিন্তু তার মূলে সত্য নাই। পরে প্রকাশ হইল যে, ঐরূপ সংবাদ কেহ পাঠায় নাই। বিশ্বাসঘাতী কাঁটা আপনা হইতে নড়িয়াছে। সেইরূপ রূপানুভূতি হইতে আমরা রূপবানের অস্তিত্ব কল্পনা করি। কিন্তু এমনও ঘটিয়া থাকে যে রূপানুভূতি ঘটিল, কিন্তু রূপবান্ নাই। মস্তিষ্কের ভিতরে আন্দোলন আপনা হইতেই সময়ে সময়ে ঘটে ; রূপানুভূতি জন্মে, কিন্তু মস্তিষ্কের বাহিরে কোন রূপবান্ নাই। এইরূপে ভূতের গল্পের সৃষ্টি হয়। সাপ দেখিতেছি মনে হইলেই নিশ্চয় একটা সাপ বাহিরে আছে, তাহা সকল সময়ে বলা যায় না। বাহিরে যাহা আছে, তাহা হয়ত রজ্জু ; অথবা তাহা কিছুই নহে। স্বপ্নে আমার এইরূপ যথাগত সঙ্কেত ও অনুভূতি লইয়া প্রকাণ্ড একটা ক্রীড়াময় জগৎ নির্ম্মাণ করি। অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে জ্ঞানবিভ্রাট, যত ইলিউশন্ হালুসিনেশন্ আছে, সকলেরই এই ব্যাখ্যা। হিপনটিক ব্যক্তিকে বশ করিয়া যাহা দেখিতে বলা যায়, বিনা ওজরে সে তাহাই দেখে। বিশ্বামিত্র বহু আয়াসে নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র আফিমের মাহাত্ম্য জানিতেন না, তাই তাঁহার এত তপস্যা ; কিঞ্চিৎ মর্ফিয়া সাহায্যে তিনি বিনায়াসে বৃহত্তর জগৎ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন।

রূপানুভূতি সম্বন্ধে যাহা, অন্যান্য অনুভূতির সম্বন্ধেও তাহাই। সর্ব্বত্রই সঙ্কেত লইয়া কারবার। অনুভূতিগুলা আমাদের, সেগুলা প্রত্যক্ষ পদার্থ ; তাহাদের অস্তিত্বে না হয় সংশয় করিলাম না। কিন্তু তাহাদের কারণস্বরূপে অনুমিত বুদ্ধিসৃষ্ট বাহ্য জগৎ আমাদের কল্পিত অর্থাৎ রচিত। সেই কল্পনায় ভর করিয়া চলিলে জীবনযাত্রা বেশ চলে দেখা যায়, কিন্তু সময়ে সময়ে ঠকিতে হয়। কেন চলে, সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ মায়া-জগৎ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে মানবচৈতন্যকে যথেচ্ছ বিহারী দেখিয়া প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সে কথা না তোলাই ভাল। স্থূল কথা, এই যে বাহ্য জগৎ—যাহাকে মোটা কথায় জড় জগৎ বলা যায়—তাহা যদি থাকে, তাহাকে আমি স্পর্শ করিতে অক্ষম। স্পর্শ করিতে যখন অক্ষম, তখন জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, বাহ্য জগৎ আছে। বাহ্য জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহার অন্তর্গত আমার জড় দেহে অবস্থিত মস্তিষ্ক নামক বস্তুর কল্পনা করি, এবং কল্পিত বাহ্য জগতের কল্পিত আঘাতে কল্পিত মস্তিষ্কে আন্দোলন কল্পনা করিয়া সেই আন্দোলনকে অনুভূতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। বাহ্য জগৎকে আমি স্পর্শ করিতে পারি না ; আমার কল্পিত মস্তিষ্ক মাত্র কল্পিত স্নায়ুসূত্রযোগে কল্পিত বাহ্য জগৎকে স্পর্শ করে। অথচ বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করি ; ব্যাখ্যার আবশ্যকতা, তাই সঙ্কেত থিওরি দিয়া একটা ব্যাখ্যা গড়িয়া লই। আমার মস্তিষ্ক আমার অংশ নহে ; সেটা ভৌতিক বিষয়, আমার বাহির ; উহা বহিঃস্থ আমা-ছাড়া জগতের অন্তর্ভুক্ত। মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনুভূতি জন্মে, তাহার ব্যাখ্যা নাই। শর্করায় পরমাণু-সমাবেশের ব্যতিক্রমে মাদকতা-ধর্ম্ম জন্মে ; সেইরূপ জীবদেহে পরমাণু-সমাবেশের ব্যতিক্রমে চৈতন্য-ধর্ম্ম জন্মে ; এইরূপ যে একটা ব্যাখ্যা আছে, তাহা অশ্রদ্ধেয়। জড় পদার্থ ও চিৎপদার্থ বিজাতীয়। একের সহিত অন্যের তুলনা হয় না। বাহ্য জগৎ একটা বিশাল স্বপ্ন, এবং মানুষ মাত্রেই এক একটি সনাতন আফিমখোর,

এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। কথাটা শুনিতে ভাল লাগে না; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহার সারবত্তা ভাল বুঝা যায় না। আমি যদি ঝোঁক দিয়া বলি—জগৎ স্বপ্নমাত্র, তাহা হইলে আমার কথা কেহ উল্‌টাইতে পারে না। স্বপ্ন কতকগুলি প্রত্যয়ের সমবায় ও পরম্পরামাত্র; জগৎও তেমনই কতকগুলি প্রত্যয়ের সমবায় ও পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উভয়ে প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য দেখি না। স্বপ্নাবস্থায় আমি কতকগুলা ঘটনা দেখি; জাগিয়াও আমি কতকগুলা ঘটনা দেখি। তবে স্বপ্নটা অলীক, আর জগৎব্যাপারটা সত্য কিসে হইল? বলিতে পার যে, স্বপ্নে দৃষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে সঙ্গতি নাই ও সামঞ্জস্য নাই, আর প্রত্যক্ষ জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। প্রত্যক্ষ জগতে সমস্ত ঘটনাগুলি অবিরোধে একটা কাহিনী বা প্লটের স্বরূপে একটা উদ্দেশ্যের দিকে চলিতেছে, আর স্বপ্নে সমুদয় ঘটনাই পরস্পর অসঙ্গত। কিন্তু স্বপ্নে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে, তাহা আমরা সুপ্ত অবস্থায় কিছুতেই বুঝিতে পারি না; তখন একটা বিচিত্র সুসঙ্গত অভিনয়, বিচিত্র প্লটই দেখিতে পাই। জীবন যদি স্বপ্নাবস্থা হয়, তবে জীবন থাকিতে এই স্বপ্নে সামঞ্জস্যের অভাব ধরিব কিরূপে? বলিতে পার, একটা মাত্র প্রত্যয় আমাদের ভ্রম জন্মাইতে পারে; কিন্তু যখন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের পাঁচটা প্রত্যয় স্বতন্ত্র ভাবে পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে, চোখের ভ্রম স্পর্শে, স্পর্শের ভ্রম শব্দে নিরাকৃত হইতেছে, পরস্পরের মধ্যে অবিসংবাদী অবিরোধ বিদ্যমান, তখন জগৎকে স্বপ্ন কিরূপে বলিব? উত্তর, স্বপ্নাবস্থাতেও একটা অনুভূতি মাত্র এক সময়ে থাকে না; দৃষ্টি শ্রুতি স্পর্শ সমুদায় একত্র কাজ করিয়া পরস্পরের অবিরোধে এক সুখ-দুঃখ-ময় হাসি-কান্না-ময় কৌতুকময় জগতের সৃষ্টি করে। আবার জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ যদি ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংখ্যার উপর নির্ভর করে, ইহাই বল, তাহা হইলে সে প্রমাণের ভিত্তি নিতান্ত শিথিল হয়। ভাগ্যে মানুষের পাঁচ-রকম অনুভূতি আছে, তাই কথাটা তুলিতেছ। আমার রূপানুভূতি আছে, তাই ইন্দু আমার নিকট অমৃতধার ঢালিতেছে; শব্দানুভূতি আছে, তাই বিহগকুল সুরবসার ঢালিতেছে; গন্ধানুভূতি আছে, তাই কুসুমচয় সুরভিভার ঢালিতেছে। যে ব্যক্তির কোন অনুভূতি নাই, যে ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়হীন, তার কাছে সবই মহাশূন্য; তার কাছে যুক্তি তর্ক কোথায় লাগিবে? আবার আর এক কথা বলিতে পার, আমিই না হয় ভ্রান্ত, সকলেই কি ভ্রান্ত? তুমি, তিনি, সে, সকলেই কি একই ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া একই স্বপ্নের দর্শনে নিরত? কিন্তু হায়, তুমিই বা কে, আর তিনিই বা কে? তুমি ও তিনি ত আমারই কল্পিত। তোমরা ত বাহ্য জগতেরই অংশ, সুতরাং আমারই সৃষ্ট পদার্থ। আমি জগৎ দেখিতেছি সত্য, কিন্তু তুমি জগৎ দেখিতেছ, তাহার প্রমাণ কি? তুমি ত আমার কল্পিত, আমারই হাতগড়া সাক্ষী; তোমার সাক্ষ্যে স্বতন্ত্রতা নাই।

দাঁড়াইল এই,—আমি চিন্তা করি, আমি অনুভব করি, আমি ইচ্ছা করি, অতএব আমি আছি। জগৎটাকে অনুভব করি বলিয়া যে জগৎ আছে, তাহার প্রমাণাভাব। এটা আমার আফিমখুরির পরিচয় মাত্র। তোমাকে ও তাঁহাকে ও আমার ভৌতিক কলেবরটাকে লইয়া সমগ্র বাহ্য জগৎ। কিন্তু এই জগৎ আমার কল্পনা, আমার চিন্তা,

আমার অনুভূতি, বাসনা ও কামনা ও তৃপ্তি প্রভৃতির সমষ্টি। এক কথায় সবটাই আমার ভিতর: আমিই সব। ফলে যুক্তিশাস্ত্র এই ঘোর স্বার্থময় সিদ্ধান্তে আনয়ন করে; আমিই সব, তুমি আবার কে? ইহার ফল হয় বৈরাগ্য। জগৎ মিথ্যা মায়া.— নিজের কাজ দেখ। এই স্বার্থপর বৈরাগ্যজনক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অন্য যুক্তি নাই; একমাত্র যুক্তি লাঠি। প্রকৃতি স্বয়ং লগুড়হস্তে দণ্ডায়মানা। আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, বাকীটা প্রথম পুরুষ। প্রকৃতি বলিতেছেন, ভো উত্তম পুরুষ, তুমি তোমার সহবর্ত্তী মধ্যম পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার কর; নতুবা তোমার কল্যাণ নাই। আমি উত্তম পুরুষের অস্তিত্বে সন্দিহান নহি এবং উত্তম পুরুষের কল্যাণ বিশেষরূপে বুঝি। উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার পরম পুরুষার্থ। উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনার্থ আমি মধ্যমপুরুষরূপী তোমার অস্তিত্ব মানিয়া লই। তোমার ভৌতিক শরীরের অস্তিত্ব আমি কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু তোমার মানস শরীরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও আমার জীবনযাত্রা চলে না। আমি যেমন চৈতন্যশালী একটা-না একটা কিছু, তুমিও তেমনি সর্ব্বতোভাবে আমারই মত সুখী দুঃখী ঈর্ষী ঘৃণী অসন্তুষ্ট চৈতন্যশালী কিছু-না-কিছু, ইহা আমি অকপটে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করি। নতুবা প্রতি পদে আমাকে লাঞ্ছিত হইতে হয়; নহিলে জীবনযাত্রা এক পদ অগ্রসর হয় না; উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধন ঘটে না: এবং উত্তম পুরুষের কল্যাণসাধনই আমার পরম পুরুষার্থ। প্রমাণের অভাব; যুক্তি নাই; কিন্তু প্রকৃতিপ্রযুক্ত লগুড়ের ভয় আছে। সুতরাং আমি আছি, তুমিও আছ। তুমি বিনা কি ভাই আমার চলে? তুমি আছ, অতএব রাম হরি কৃষ্ণ সকলেই আছেন। কেন না, সময়বিশেষে সকলেই মধ্যমপুরুষস্থানীয় হইয়া দাঁড়ান। আবার তোমাদের দূরস্থ জ্ঞাতি ওরাং, হনুমান, জাম্ববান্ পর্য্যন্ত সকলেই আছেন। কেন না, শাখাবলম্বী হনুমান্ হইতে কাফ্রি যত উচ্চে, কাফ্রি হইতে তোমার উচ্চতা তার চেয়ে অল্প, সকল সময়ে এ কথা বলিতে সাহস হয় না। বলিলে তুমি রাগ করিবে। একবার পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই; ক্রমেই অধোধঃ নামিতে হয়। মীন মকর হইতে আরম্ভ করিয়া আসিডিয়ান, আম্ফিয়ক্সস ও শেষে দূরস্থ জীবাণু আমীবা পর্য্যন্ত সকলেই তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব; সুতরাং সকলেই তোমার মত মধ্যম পুরুষস্থলীয় হইবার অধিকারী, সুতরাং সকলেই সন্তি। তোমাকে চেতন স্বীকার করিলে সকলকেই চেতন মানিতে হইবে। জীবশ্রেণীর পরম্পরায় পরস্পরের এমনই সম্বন্ধ, কাহাকে ছাড়িয়া কাহার চৈতন্য স্বীকার করিব? তোমার যদি চৈতন্য থাকে, তবে নিকট জ্ঞাতি হনুমানের আছে, দূর জ্ঞাতি মৎস্য কুম্ভীরের আছে, দূরতর কৃমি কীটের ও দূরতম কীটাণুরও আছে, প্রোটোপ্লাজমেরও আছে। চৈতন্যের সীমানা নির্দ্দেশ অসম্ভব। এই সীমার উর্দ্ধে সমুদয় জীব চৈতন্যবিশিষ্ট, ইহার নীচে চৈতন্য নাই, কে সাহস করিয়া বলিবে? অবশ্য তোমার চৈতন্য এবং কীটাণুর চৈতন্যে পার্থক্য আছে: কিন্তু সে প্রকৃতিগত পার্থক্য নহে, মৌলিক পার্থক্য নহে, কেবল অভিব্যক্তির মাত্রাগত পার্থক্য। যেমন কীটাণুর দেহে ও তোমার দেহে অভিব্যক্তির মাত্রাগত তারতম্য, উভয়েরই চৈতন্যে সেইরূপ মাত্রাগত ব্যবধান মাত্র; উভয়েই

একজাতীয়।

প্রোটোপ্লাজমে নামিয়াও থামা চলে না। প্রোটোপ্লাজমরূপ মশলায় নিম্নতম জীবেরও দেহ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই নিম্নতম জীবের ও জড়ের মধ্যে যে একটা ব্যবধান অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটা ভৌতিক ব্যবধান মাত্র। আজ বিজ্ঞান তাহা লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, কিন্তু দুই দিন পরে এই ব্যবধান লঙ্ঘিত হইবে, তাহার সংশয় অল্প। এ কালের বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে চাহেন যে, জীবন ক্রিয়া—অবশ্য চৈতন্যভাগ বাদ দিয়া শুদ্ধ ভৌতিক জীবনক্রিয়া—ভৌতিক ক্রিয়ারই অবান্তর ভেদ মাত্র; সুতরাং উহা পদার্থবিদ্যার ও জড়বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার বিষয়; কালে ইহা ব্যাখ্যাত হইবেক। অম্লজান ও উদজানের সমাবেশে জল ও জলের সমুদয় ধর্ম্ম; সেইরূপ অঙ্গার অম্লজান উদজানাদির সমাবেশে প্রোটোপ্লাজম্ ও তাহার সমুদয় ধর্ম্ম। পার্থক্য কেবল জটিলতায়। জটিলতার শৃঙ্খল মুক্ত হইবে। সুতরাং কীটাণুতে ও প্রোটোপ্লাজমে যদি চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার কর, অঙ্গার ও উদজানের পরামাণুতেও স্বীকার করিতে হইবে। চৈতন্য নামটা দিতে রাজি না হও, ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা চৈতন্যের সজাতীয়, সপ্রকৃতিক। চৈতন্য না বলিয়া চিৎ বল, চিদ্ধর্ম্ম বল, চৈতন্যকণা বল, চিদ্বীজ বল, ক্ষতি নাই। যাহা আছে, তাহা অনুভূতি না হইতে পারে, বুদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু যাহার সমাবেশে, যাহার অভিব্যক্তিতে অনুভূতি ও বুদ্ধি, যাহার অঙ্কুর হইতে অনভূতির ও বুদ্ধির বিকাশ, তাহাই।

জড় কিরূপে চৈতন্যকে স্পর্শ করিবে বুঝা যায় না; মস্তিষ্কের আন্দোলনে কিরূপে অনভূতি জন্মিবে বুঝা যায় না; কিন্তু চৈতন্য বা তৎপ্রকৃতিক পদার্থ কিরূপে চৈতন্যকে স্পর্শ করিবে, তাহা কতক বুঝা যায়। বাহ্য জগৎ চৈতন্যময়; আমিও চৈতন্যময়। তাই বাহিরে ও অন্তরে প্রতিক্রিয়া, ঘাতপ্রতিঘাত। চৈতন্যের অস্তিত্ব বাহিরে ও ভিতরে, আমার পূর্ব্বে ও আমার পরে, চৈতন্যের অস্তিত্ব—এই অর্থে গৃহীত ও স্বীকৃত হইতে পারে। চৈতন্যের আবার দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি কিরূপ, ইহা লইয়া একটু তর্ক উঠিতে পারে; সে কথা এখানে তুলিয়া কাজ নাই।

দর্শনশাস্ত্র বহুকাল হইতে একটা সদ্বস্তুর বা সত্য পদার্থের অন্বেষণে ব্যাপৃত আছে। যেন একটা সদ্বস্তুর সাক্ষাৎ না পাইলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না। এই সদ্বস্তুর ইংরেজী প্রতিশব্দ নৌমেনন—Noumenon বা Thing-in-itself অর্থাৎ খাঁটি জিনিষ। প্রাচী ও প্রতীচী উভয়ত্রই এই সৎ পদার্থের বা খাঁটি জিনিসের অন্বেষণ ও দর্শন লাভই দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য অধ্যবসায়। জড় জগৎ যে এই সদ্বস্তু নহে, তাহা প্রায় জ্ঞানিমাত্রেই সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই দৃশ্যমান মায়াপটের অন্তরালে জড় জগতের একটা অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ—একটা সৎ-পদার্থ যে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে, ইহা অস্বীকার করিতে অনেকেরই জীবনগ্রন্থি যেন ছিঁড়িয়া যায়। একটা কিছু আছে, উহা অনির্দ্দেশ্য—স্পেনসারের ভাষায় অজ্ঞেয়—Unknowable;—সাংখ্যদর্শনের ভাষায় উহার নাম অব্যক্ত প্রকৃতি। এই 'অব্যক্ত' অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞেয়ন প্রকৃতি, চেতপুরুষের—যাঁহার সাংখ্যদর্শনসম্মত নাম জ্ঞাতা বা "জ্ঞ", তাঁহার

—সম্মুখে আসিয়া প্রতীয়মান, অনুভূয়মান 'ব্যক্ত' প্রকৃতির বা প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তি গ্রহণ করে; কেন করে, তাহা কেহ জানে না, করে এই মাত্র,—করে বলিয়াই এই 'সৃষ্টি' ব্যাপার, করে আমি, তুমি, তিনি,—মৎস্য কুম্ভীর ও প্রোটোপ্লাজম,—গিরি-নদী-সমাকীর্ণা বসুন্ধরা ও তারকাখচিত নভোদেশ—বাহ্য জগতের এই পট।

এইরূপ দার্শনিক মতকে আমরা দ্বৈতবাদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। কেন না, এই মতে চেতন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র সদ্বস্তুর—অব্যক্ত অজ্ঞেয় 'প্রকৃতি'র অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সদ্বস্তু দুই—উভয়ই অনির্দ্দেশ্য ও অজ্ঞেয়—একের নাম পুরুষ বা আত্মা বা জ্ঞ, অপরের নাম প্রকৃতি বা জ্ঞেয়।

কিন্তু এই দ্বৈতবাদ পণ্ডিতসমাজে একবাক্যে গৃহীত হয় নাই। চেতন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির অস্তিত্ব, বাহ্য জড় জগতের মূলে কোন স্বাধীন সদ্বস্তুর অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না। কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই একটা মাত্র অনির্দ্দেশ্য সদ্বস্তুরই রূপভেদ বলিয়া দ্বৈতবাদকে বিশিষ্ট করিয়া অদ্বয়বাদের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। একটাই জিনিষ, তাহার এ-পিঠ ও ও-পিঠ। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন ক ও খ। উভয়েই অবিজ্ঞাত ও অলক্ষণ, তবে ক বিনা খ থাকে না; খ বিনা ক থাকে না। এক দিক হইতে দেখিলে ক, অন্য দিকে দেখিলে খ; একই বক্র রেখার এক পিঠ কুব্জ, অন্য পিঠ ন্যুব্জ। কিন্তু এইরূপ সামঞ্জস্যবিধানে সকলে সম্মত নহেন। প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, এই যুক্তির সারভাগ বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থূলতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ দ্বিতীয়ের নাম সহিতে চায় না; দ্বৈতস্পর্শে উহা মলিন হয়। এক এব অদ্বিতীয়, সদ্বস্তু একমাত্র, উহা চৈতন্যরূপী, জগৎ-সমষ্টি চৈতন্যময়; অধ্যাপক ক্লিফোর্ডের ভাষায় উহা mind-stuff; বাঙ্গালায় অনুবাদে বলা যাইতে পারে চিৎপদার্থ। তোমার চৈতন্যের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই জড় মাত্রেই চিৎপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ও জগৎ চিন্ময় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তোমার চৈতন্যের স্বাধীন অস্তিত্বও সহজে স্বীকার্য্য নহে। ক্লিফোর্ড স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যে করেন না। সাংখ্যবাদী করেন, বৈদান্তিক বোধ করি করেন না। সদ্বস্তু একমাত্র ও উহা চিন্ময়, কিন্তু সেই চৈতন্য অখণ্ড পদার্থ; উহার অংশ নাই, ভাগ নাই। কতক আমাতে, কতক তোমাতে, কতক মৎস্য কুম্ভীরে, ইহা স্বীকার্য নহে। আমিই চিন্ময় একমাত্র সদ্বস্তু, আর সমস্তই আমার কল্পনা। আমার চৈতন্যের প্রমাণ অনাবশ্যক, মদ্ব্যতিরিক্ত চৈতন্যের প্রমাণ নাই। এই চৈতন্যরূপী 'অহম্', প্রাকৃত ভাষায় 'আমি', সংস্কৃত ভাষায় 'আত্মা', বা 'ব্রহ্ম', ইহাই এক এব অদ্বিতীয় সদ্বস্তু। ইহাই বোধ করি বেদান্তের তাৎপর্য্য।

এই এক এব সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্য পদার্থ—তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ—mind-stuff—তথাস্তু। ইহা আনন্দস্বরূপ—তাই কি? কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিবেন;—বলিবেন জানি না, উহা অজ্ঞেয় অনির্দ্দেশ্য। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলিবেন, উহা সৎ নহে, অসৎও নহে, সৎও বটে, অসৎও বটে, তাহাও নহে, সৎও নয়, অসৎও নয়, তাহাও নহে। উহার

পারিভাষিক নাম শূন্য। হিউম ও হক্সলি হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তুর জন্য এত মাথাব্যাথা কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি? চিদ্বস্তু, সন্দেহ নাই? কিন্তু চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই! সদ্বস্তুর মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

সৌন্দর্য্য-বোধ মানব-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় মনুষ্যবিশেষই সৌন্দর্য্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেন না, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি-কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়াংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ ছুটিতে থাকে, এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তি-বশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।

সৌন্দর্য্যপিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করি; এবং যাহার সৌন্দর্য্যপিপাসা একেবারে নাই, তাহার মনুষ্যত্বের প্রকোষ্ঠে পৌঁছিতে এখনও বিলম্ব আছে, অক্লেশে এরূপও নির্দ্দেশ করিতে পারি। নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতীতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দ্রকরাহত হইয়া মরিতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরূপ অবলীলাক্রমে বিসর্জ্জন দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার করধৃত লীলাকমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধুকরস্থলবর্ত্তী হইতে কেহ যে বাসনা করেন না, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বারুণী পুষ্করিণীতীরে তরুশাখার অন্তরালে কোকিল ডাকিয়া বৃদ্ধ গৃহস্থ কৃষ্ণকান্তের সংসারে যে নৈতিক বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, সেরূপ নৈতিক বিপ্লবও যে মনুষ্য-সংসারে অসাধারণ ঘটনা, তাহা সহজে বিশ্বাস করিব না। অতএব সৌন্দর্য্যের সহিত মনুষ্যত্বের সম্বন্ধ; অতএব সৌন্দর্য্য-পিপাসা মনুষ্যত্বের অঙ্গ।

মানুষ সৌন্দর্য্য চায় ও সৌন্দর্য্য পায়, অর্থাৎ প্রকৃতির খানিকটা অংশ মানুষের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অর্থাৎ প্রকৃতির বাকী অংশ অসুন্দর বা কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হয়। খানিকটা কুৎসিত, কেন না, বাকীটা সুন্দর। খানিকটা সুন্দর কেন না, বাকীটা কুৎসিত; অর্থাৎ কুৎসিতের সহিত সাহচর্য্যে, তাহার

সহিত তুলনায়, তাহা সুন্দর। কতকটা কুৎসিত না হইলে বাকীটা সুন্দর হইত না, অথবা সমস্তই সুন্দর হইলে সৌন্দর্য্য শব্দ নিরর্থক হইত। অতএব সুন্দরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে কুৎসিতের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। কোন্‌টা সুন্দর, আর কোন্‌টাই বা কুৎসিত, এটাই বা সুন্দর কেন, আর ওটাই বা কুৎসিত কেন, এই প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। মানুষের মনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির এমন সম্বন্ধ কেন, যে মন খানিকটাকে সুন্দর বলিয়া বাছিয়া লয়, সেইটাকে আপনার করিতে চায়, সেইটার দিকে ধাবিত ও আকৃষ্ট হয়, অবশিষ্টটাকে কুৎসিত বলিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে দূরে রহে, অথবা তাহার সংসর্গ ছাড়িতে চায়; এই গভীরতর প্রশ্নও ইহার সঙ্গে উপস্থিত হয়। ইহাতে মানুষের লাভ কি? মানুষ এমন করে কেন? মনুষ্যের এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে ও কি উদ্দেশ্যে? কিসেই বা ইহার পরিণতি? বস্তুতই কি জগতের দুইটা ভাগ? একটা ভাগ সুন্দর, আর একটা ভাগ কুৎসিত? শুধু মানুষের পক্ষে নহে, মানুষ ভিন্ন অপর জীবের পক্ষেও সেইরূপ? শুধু মানুষ আর অপর জীব কেন, মানুষ ও ইতর জীবের সম্পর্ক ছাড়িয়া যদি প্রকৃতির কোনরূপ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা থাকে, তবে সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পক্ষেও সেইরূপ? উপস্থিত প্রবন্ধে এই প্রশ্ন কয়টির যথাসাধ্য আলোচনা করা যাইবে।

স্থূল-সূক্ষ্ম- হিসাবে সমুদায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে দুইটা ভাগ করিতে পারা যায়। এইরূপ শ্রেণীবিভাগের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য শব্দটার অর্থ একটু বুঝা উচিত। উপরে যে সংজ্ঞা দিয়াছি, মোটের উপর তাহাতেই কাজ চলিতে পারে। মনুষ্যের মন যেটাকে টানিয়া রাখিতে চায়, যাহাতে সুখের অনুভব করে, সুখ বল, তৃপ্তি বল, আরাম বল, আনন্দ বল, এই রকম একটা অনুভব যাহার সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাহাই সুন্দর। আর মন যাহা হইতে দূরে থাকিতে চায়, দুঃখ ঘৃণা ক্লেশ বা তাদৃশ কোনরূপ অনুভব যাহার পরিণাম, তাহাই কুৎসিত। সুতরাং সুন্দরের সহিত সুখের ও কুৎসিতের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ। আবার সুখপ্রাপ্তির ও দুঃখপরিহারের অধ্যবসায় ও ধারাবাহিক চেষ্টাকেই যদি জীবন বল, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যপিপাসা জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

এই সৌন্দর্য্যের খানিকটা স্থূল, খানিকটা সূক্ষ্ম। মধুর রস, মধুর গন্ধ, মধুর শব্দ, মধুর স্পর্শ ও মধুর দর্শনে সঙ্গে সঙ্গে যে তৃপ্তি জন্মে, মনুষ্য মাত্রেই তাহা প্রায় সমভাবে সমপরিমাণে উপভোগ করিতে সমর্থ. এই সকল মধুর তৃপ্তিকে স্থূলের মধ্যে ফেলা যায়। সুখাদ্য ভোজনে প্রায় সকলেরই সমান তৃপ্তি জন্মে: ইহাতে বড় মতভেদ দেখা যায় না। মনুষ্যেতর জীবও ন্যূনাধিক পরিমাণে এই তৃপ্তির ভাগী; ইহা জীবন মাত্রেরই, অন্ততঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবন মাত্রেরই নিত্য ভোগ্য। ইহা নহিলে জীবনযাত্রা চলে না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার উদ্ভব বেশ বুঝা যায়। দেহরক্ষার জন্য জড় জগৎ হইতে কতকগুলা মালমশলা বাছিয়া গ্রহণ করিতে হয়: কতকগুলাকে বাছিয়া ত্যাগ করিতে হয়; কতকগুলা প্রাকৃত শক্তি দেহের জীবনের স্থিতির পুষ্টির ও অভিব্যক্তির অনুকূল, কতকগুলা প্রতিকূল। এই জন্য কতকগুলা আমরা স্পৃহার সহিত গ্রহণ করি, কতকগুলা দূরে পরিহার করি; নতুবা জীবন

চলিত না।

অতএব মিষ্ট রস, কোমল শয্যা, স্নিগ্ধ সমীরণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণকালেই যাহাদের দ্বারা তৃপ্তি বা আরাম উৎপন্ন হয়, নিত্য জীবনযাত্রার নিমিত্ত যাহারা উপযোগী, তাহাদিগকে এই স্থূল শ্রেণীতে ফেলা চলে। জীবনের জন্য ইহাদের দরকার, কাজেই ইহাদের ভাল লাগে; এই জন্য মানুষের প্রবৃত্তির সহিত ইহাদের এই সম্বন্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উৎপন্ন, তাহাও বুঝা যায়। লঙ্কা অথবা আর্সেনিক যদি রসনাপ্রিয় হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা একটা বিকট ব্যাপার ঘটিয়া উঠিত, সন্দেহ নাই।

ইহা ছাড়া আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে, তাহাকে সূক্ষ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে। মানুষ ভিন্ন ইতর জীবের এই সৌন্দর্য্যভোগের শক্তি আছে কিনা, সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এই সৌন্দর্য্যের উপভোগ করিতে পারে বলিয়া মানুষ উন্নত জীব। মানুষের মধ্যেও সকলে সমভাবে বা সমান মাত্রায় ইহার উপভোগে অধিকারী নহে। দৈনন্দিন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ইহার অধিক উপযোগিতা আছে, তাহা বলা চলে না। এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগের প্রবৃত্তি বা শক্তি কবি নামক মনুষ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সাংসারিক বা বৈষয়িক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি নামক মনুষ্যের যেরূপ অপবাদ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইহাকে জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল বলিয়াই বরং বোধ হয়। ইংরেজীতে যাহাকে আর্ট বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে ললিতকলা বলা যাইতে পারে, এই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও প্রকাশই তাহার অবলম্বন ও বিষয়। মানব-মনের যে যে ভাগের সহিত ইহার কারবার, তাহার ইংরেজী নাম ঈস্থেটিক বৃত্তি। জীবিকার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়াই এই বৃত্তিটা কিরূপে ও কি উদ্দেশ্যে জন্মিল, ভাল বুঝা যায় না। এই সৌন্দর্য্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত।

প্রথমে এই প্রশ্ন আইসে, এই সৌন্দর্য্য কিসের ধর্ম্ম? ইহা কি বস্তুবিশেষেরই প্রকৃতি-নিহিত ধর্ম্ম, অথবা মনুষ্যের মনেরই একটা সৃষ্টি কল্পনা বা কারিগরি? অর্থাৎ, যাহাকে আমরা সুন্দর বলি, তাহার প্রকৃতিগত কোন বিশিষ্টতা নাই, আমরা তাহাতে সৌন্দর্য্য আরোপ করি মাত্র? বস্তুতঃ এমন দেখা যায়, শ্যাম যাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, রাম তাহাতে সৌন্দর্য্যের কণিকামাত্র দেখেন না। আমার নিকট যাহা সুন্দর, তোমার কাছে হয়ত তাহা কুৎসিত। বপ্রক্রীড়ারত মদস্রাবী হস্তীর শুণ্ডাস্ফালন দর্শনে অথবা গিরিগুহার অভ্যন্তরে মারুতপূর্ণ-রন্ধ্র কীচকধ্বনি শ্রবণে কালিদাস যে আনন্দ অনুভব করিতেন, সকলেই তাহার উপভোগে সমর্থ হইবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। আবার সৌন্দর্য্য বিষয়ে মনুষ্যের রুচিগত তারতম্য ফেলিবার নহে। উজ্জয়িনীর রাজপথে তামাসা উপস্থিত হইলে কালিদাসের নয়ন তামাসা ফেলিয়া পার্শ্বস্থ সৌধবাতায়নের প্রতি ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইত; স্নানান্তে আর্দ্রবসনা যুবতীর সন্দষ্টবস্ত্র অবয়বের প্রতি তাঁহার লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত; এবং তাঁহার মানস লোচন জলদময়ী তিরস্করিণীর আবরণ ভিন্ন করিয়া গুহাস্থিতা অংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতা কিম্পুরুষাঙ্গনার নগ্ন দেহের দিকে বিবর্ত্তিত হইত। আবার বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মানসিক উপপ্লবে উদ্‌ভ্রান্ত জরাক্রান্ত অসহায় রাজা লীয়রকে আঁধারে

প্রান্তরমধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর জড় প্রকৃতির অত্যাচারে উৎপীড়িত দেখিয়া জগৎরূপী পেষণযন্ত্রের আবর্ত্তনপ্রণালীর উদ্দেশ্যের ঠাহর না পাইয়া স্তম্ভিত হইবার ক্ষমতা যে সকলের জন্মিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

সুতরাং সুন্দরের যাহা সৌন্দর্য্য, তাহা যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, তাহা সকল সময়ে বলা চলে না। যিনি সৌন্দর্য্য ভোগ করিবেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতার উপরে সৌন্দর্য্যের মাত্রা নির্ভর করে। অমুক পদার্থটাকে সুন্দর বলিবার আমার যে পরিমাণ দাওয়া আছে, তোমারও কুৎসিত বলিবার সেই পরিমাণ দাওয়া আছে। তুমি যদি কুৎসিত দেখ, কাহারও সাধ্য নহে যে, প্রতিপন্ন করিতে পারেন, উহা সুন্দর। যে কবির কাব্য আমার ভাল লাগে না, তোমার ভাল লাগে, তুমি লাঠি মারিলেও আমার তাহা ভাল লাগিবে না। আমার নিকট উহা যে অর্থে সুন্দর, তোমার নিকট ঠিক সেই অর্থেই উহা কুৎসিত। এ বিষয়ে তোমাকে বাধ্য করিবার কোন আইন নাই। তথাপি দেখা যায়, কতকগুলি পদার্থ এমন আছে, যাহারা সুস্থপ্রকৃতির মানুষের অধিকাংশের নিকটেই সুন্দর বলিয়া গৃহীত হয়। যেমন পাখী, প্রজাপতি, ফুল। প্রশ্ন এখন এই,—কি গুণে ইহারা সুন্দর ; ইহাদের সৌন্দর্য্যে আমাদের লাভ কি ?

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস খুলিলেই বিশ রকম সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পঞ্চাশ পাতা বিবরণ পাওয়া যায় ; কিন্তু তার মধ্যে একটাও তৃপ্তিকর নহে। আজকাল আমাদের একটা রোগ জন্মিয়াছে, কোন একটা কিছুর উৎপত্তির ও অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা দরকার হইলেই তৎক্ষণাৎ ডারুইনের কাছে ছুটিয়া যাই। কিন্তু ডারুইনও এখানে ভরসা দেন না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের মূল সূত্র একটা মাত্র কথা। যাহা জীবিকার উপযোগী, যাহাতে কোন না কোন রূপে জীবনের সাহায্য করে, তাহাই প্রকৃতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু উপরে দেখিয়াছি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের সহিত জীবনযাত্রার সম্বন্ধ বিশেষ কিছু নাই। কেন না, সংসারযাত্রায় কাব্যরসপিপাসু বড় দুর্ভাগ্য জীব। মলয়ানিলে অনুরাগ প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় জীবনবর্দ্ধনের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু কোকিলকূজনে ও ভ্রমরগুঞ্জনে মুগ্ধ না হইতে পারিলে কি বা শীতে, কি বসন্তে, কোন কালেই কোন ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না।

ডারুইন বলেন, ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগরেণু বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশরক্ষা ও জাতিরক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের রঙে ও রূপে প্রজাপতি আকৃষ্ট হয় ; তাই যে ফুলের যত রূপ, তাহার বংশরক্ষা পক্ষে ততই সুবিধা। কাজেই সুন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আবার নিরীহ প্রজাপতির শত্রু-সংখ্যা অনেক ; এই সকল শত্রুর সৌন্দর্য্যবৃত্তি এমনই অপরিস্ফুট যে, এতটা মূর্ত্তিমান্ সৌন্দর্য্যকে একেবারে উদরসাৎ করিবার জন্য ইহারা অত্যন্ত লালায়িত ; এবং এই সকল শত্রুদের সহিত সম্মুখ-সমরে দাঁড়ানও দুর্ব্বল প্রজাপতির পতঙ্গ-জীবনের পক্ষে বিশেষ আশাপ্রদ নহে। তাই প্রজাপতি ফুলের গায়ে গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজের

রূপ লুকাইয়া, শত্রুকে ফাঁকি দিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে। কাজেই ফুল এক দিকে যেমন বিচিত্রবর্ণ সুন্দর, প্রজাপতির কোমল দেহও তেমনই অন্যদিকে বিচিত্রবর্ণ ও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবে ফুলের রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, প্রজাপতির রূপের সৃষ্টিকর্ত্তা ফুল। উভয়ে উভয়ের রূপরাশি ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

উভয়ে উভয়ের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু আমরা যেমন ফুলের রূপে মুগ্ধ হই, প্রজাপতিও যে তেমনই রূপমুগ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হয়, এতটা স্বীকার করিতে পারি না। ফড়িং জাতির সৌন্দর্য্যবুদ্ধির এতটা তীক্ষ্ণতা স্বীকার বড়ই কঠিন। ফড়িং জাতি একঘেয়ে ফিকে রঙের চেয়ে রঙের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, তা সে রঙ সার্ জন লবকের কাচেই থাক, আর কেরোসিন দীপের শিখাতেই থাক, এই পর্য্যন্ত বুঝা যায়। অপিচ রঙদার পুষ্পবিশেষের নিকট গেলে মধুসঞ্চয়টাও ঘটিয়া থাকে, এই পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতার জন্য প্রজাপতিকে বাহাদুরি দিতে পারি। ডারুইন-মতে পুষ্প-দেহে আর প্রজাপতি-দেহে বর্ণবৈচিত্র্যবিকাশের ব্যাখ্যার জন্য ইহার অধিকও আবশ্যক নহে। কিন্তু এইরূপ বর্ণবৈচিত্র্যের সমাবেশ মানুষের চোখে কুৎসিত না লাগিয়া সুন্দর লাগে কেন, মানুষের ইহাতে লাভ কি, এ কথার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

আর একটা কথা আছে—যৌন-নির্ব্বাচন। ডারুইন এই মতেরও প্রবর্ত্তক। সিংহের কেশর, পাখীর কাকলি, ময়ূরের পুচ্ছ, এ সমস্তই সুন্দর; এবং ডারুইনের মতে এ সমস্তই যৌন-নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত। স্ত্রীজাতি সুন্দর পুরুষ বাছিয়া লয়; কাজেই সুন্দর পুরুষেরই বংশরক্ষা ঘটে; ফলে বংশপরম্পরায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়। পারাবত যখন তাহার বিস্ফারিত নীল কণ্ঠ আনম্র উন্নম্র করিয়া, চারু পুচ্ছ নর্ত্তিত করিয়া, কাহাধ্বনিতের অনুকরণ করিয়া, পারাবতীর নিকট নাচিতে থাকে, তখন সে জানে না যে, সে প্রকৃতির নিয়োগে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিযুক্ত হইয়াছে। যৌন-নির্ব্বাচন মানিয়া লইলে জীবদেহে সৌন্দর্য্যের উদ্ভব অনেক স্থলে বুঝা যায়। কিন্তু যৌন-নির্ব্বাচন সকলে মানিতে চাহেন না; ওয়ালাস সাহেবই যৌন-নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই এ সমুদয়ের উদ্ভব বুঝাইতে চাহেন। কাজেই ডারুইনের মত এখনও দ্বিধাহীনচিত্তে গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। গ্রহণ করিলেও মূল কথার ব্যাখ্যা হইল না। ময়ূর পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরীর নিকট বাহবা লইতে পারে; কিন্তু মানুষের তাহাতে কি আসে যায়? মানুষের চোখে ময়ূরপুচ্ছ সুন্দর লাগে কেন? ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল বর্ণসমাবেশে এমন কি মাহাত্ম্য আছে যে, মানুষের তদ্দর্শনে এত তৃপ্তি জন্মে?

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এইরূপে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। অনুভূতির বৈচিত্র্যপরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎপ্রবাহ। সমস্ত অনুভূতিগুলি এক রকমের হইলে তাহাদের পরম্পরায় চৈতন্য ফুটিত কি না সন্দেহ। অনুভূতির মধ্যে পরস্পর যত পার্থক্য, বিচিত্রতা বা বিশিষ্টতা, চৈতন্যও তত বিকশিত ও পরিস্ফুট। সুতরাং মানুষের চৈতন্য যে অস্তিত্বযুক্ত, তাহার মূল কারণই এই যে, মানুষের

অনুভূতিগুলা এক রকম নহে। পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নূতন নূতন শব্দ, নূতন নূতন স্পর্শ, নূতন নূতন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে; তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত এক টানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে অনুভব-বৈচিত্র্যের এরূপ সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে এই বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক্ বিকশিত; সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য। যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্ত্তন-শীল, সেইখানেই চৈতন্য স্ফূর্ত্তিমান্। আবার অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্ত্তন জীবনের পক্ষে শুভ নহে; ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন ঘটিলেই কল্যাণ; নতুবা জীবনের শৃঙ্খল অনেক সময় ছিঁড়িয়া যায়। আপনার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনী হইতে হঠাৎ সরাইলে জীব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। পরিবর্ত্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের গ্রন্থি আল্‌গা হইয়া পড়ে। কাজেই আকস্মিক বা অতিমাত্র কিছুই ভাল লাগে না। কাজেই সৌন্দর্য্যের এক হেতু অনুভূতির প্রবাহে আকস্মিকতার ও অতিশয্যের অভাব। আবার যাহার সহিত জীবনের স্থিতির ও পুষ্টির কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, যাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের ভীতির ভাব কোনরূপে কমাইয়া দেয়, তাহারই প্রতি মন স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়; তাহাই দেখিতে ভাল লাগে; যেমন সুগঠিত বলিষ্ঠ নরদেহ; যেমন স্বাস্থ্যশোভাসম্পন্ন যুবতীর আরক্ত গণ্ডদেশ; যেমন দৃঢ়মূল ছায়া-বিস্তারী মহীরুহ, যেমন দৃঢ়ভিত্তি সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা।

সৌন্দর্য্যের আর একটি হেতু সহানুভূতি। শুধু আমার চোখে যাহা ভাল লাগে, তাহা সুন্দর, আবার যাহা আমার চোখে, তোমার চোখে, অপরের চোখেও ভাল লাগে, তাহা আরও সুন্দর। মানুষের কতকগুলা বৃত্তি আত্মপুষ্টির অভিমুখ ও আত্মপুষ্টির উদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। কতকগুলা সমাজপুষ্টির অভিমুখ ও তদুদ্দেশ্যে অভিব্যক্ত। এই সামাজিক পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলি উন্নত মনুষ্যপ্রকৃতির প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে এই বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া দেয়, উত্তেজিত করে, ইহাদের প্রবলতা ও তীক্ষ্ণতা সাধন করে, সেগুলি অতি সুন্দর। দয়া মমতা স্নেহ প্রণয় প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিগুলি যতই ফুটিয়া উঠে, ততই সমাজের কল্যাণ। সেই জন্য যে সকল পদার্থ দয়া মমতা প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক, তাহারা অতি সুন্দর। গান গাইয়া সুখ হইতে পারে; পরকে শোনাইয়া বুঝি আরও সুখ। কবিতা কবির হৃদয় হইতে উথলিয়া জনসঙ্ঘের মুখে ছুটিয়া চলে।

আর বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। যাহাতে চৈতন্যের প্রবাহকে স্থিরবেগে মন্দগতিতে চালিত রাখে, তাহা সুন্দর; যাহাতে জীবনের ভরসা দেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে আত্মাকে ম্রিয়মাণ হইতে নিষেধ করে, তাহা সুন্দর; আর যাহাতে অনেকের মনে সমান প্রীতি জন্মাইয়া মনে মনে জড়াইয়া দেয়, পরার্থপ্রবণ বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত ও উত্তেজিত রাখিয়া সমাজ জীবনকে অগ্রসর করে, তাহা আরও সুন্দর। এই হিসাবে জীবনরক্ষার সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ; শুধু আমার জীবনের রক্ষা নহে, তোমার জীবনের এবং সমগ্র সমাজ-জীবনের রক্ষার সহিত ইহার সম্বন্ধ। ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন উভয়ের

বর্দ্ধনেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের হাত আছে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধির জনক ও বিকাশক বলিতে আপত্তি ঘটে না।

এইরূপ ব্যাখ্যার পথে কয়েক পা অগ্রসর হওয়া যায় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ ঘটে না। যখনই মনে করা যায়, সৌন্দর্য্য জীবনরক্ষক বা জীবনবর্দ্ধক, সে জীবন ব্যক্তির জীবনই হউক আর সমাজের জীবনই হউক, তখনই নিতান্ত ইউটিলিটির বা ক্ষতি-লাভ গণনার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং সৌন্দর্য্যের সুন্দরতা দূর হয়। সৌন্দর্য্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহার উপভোগে কেবল তৃপ্তি মাত্র, সুখ মাত্র; ফলাফল চিন্তা, ইউটিলিটি চিন্তা, ক্ষতি লাভ চিন্তা, ভবিষ্যৎ চিন্তা, জীবন মরণ চিন্তা যাহাকে কলুষিত করে না; যাহা বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ নির্ম্মল উদ্দেশ্যহীন আনন্দের উৎপাদক বই আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে অনুরূপ প্রাকৃতিক কারণে কিরূপে এই অনাবশ্যক আনন্দভোগ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইল, তাহা সমস্যায় থাকিয়া যায়। সদুত্তর মিলে না।

আমার বিবেচনায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আর একটু চাপিয়া ধরিলে আর একটু অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। প্রকৃতি এক ভাবে আমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে দণ্ডায়মানা,—অকরুণা, নিষ্ঠুরা, দয়ালেশ-বিবর্জ্জিতা; আবার প্রকৃতি অন্য ভাবে আমাকে সেই খড়্গাঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুলা। কেন এমন, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ইহা সত্য, ইহা মানিতে হয়, না মানিলে চলিবে না। ইহাতেই আমার নিজত্বের অভিব্যক্তি। ইহার ফলেই আমি সেই খড়্গাঘাত হইতে দূরে থাকিতে ক্রমশঃ শিখিতেছি, প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ক্রমেই আমার জ্ঞান-বিকাশ বুদ্ধিবিকাশ ধর্ম্মবিকাশ ঘটিতেছে। আমার অনুভূতি ক্রমেই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইতেছে। অনুভূতি, অর্থাৎ দুঃখের অনুভূতি। দুঃখের অনুভূতি অর্থাৎ প্রকৃতিহস্তে খড়্গাঘাতের আশঙ্কা। এই অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ নহে, খড়্গাঘাতের আশঙ্কা যাহার মোটেই নাই, সে জীবন-সমরে আত্মরক্ষার সমর্থ নহে, তাহার জীবনের ভরসা নাই। শঙ্কার হেতু যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নিঃশঙ্ক ভাব মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহার এই আশঙ্কা প্রবল, এই অনুভূতি প্রবল, তাহারই মোটের উপর জীবনের ভরসা অধিক। সেই ব্যক্তি সংগ্রামে কিছু দিন বাঁচিতে পারিবে। সম্মুখ-যুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে বলা যায় না; ভয়াকুল মৃগের ন্যায়, শঙ্কামাত্রবল শশকের ন্যায় শত্রু হইতে পলাইয়া লুকাইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে মাত্র। অতএব জীবনে, দুঃখানুভূতির বিকাশ; অতএব জীবন দুঃখময়। জীবপর্য্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত দুঃখী; জীবেরই দুঃখ আছে, কাঠ-পাথরের দুঃখ নাই। জীবের মধ্যে আবার মানুষের মত দুঃখী কেহ নাই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে একটিকে নিষাদ-শরাহত দেখিয়া যাহার বদন হইতে প্রথম শ্লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছিল, মনুষ্যমধ্যে তিনিই রামায়ণ গাথার রচনায় সমর্থ হইয়াছিলেন। সমাজের ইতিহাস, সভ্যতার কাহিনী ইহার সাক্ষী।

প্রাকৃতিক শক্তির অত্যাচার কেবল ব্যক্তি-জীবনের উপরে বিদ্যমান, তাহা নহে, সমাজ-জীবনের উপরেও সমভাবে বিদ্যমান। আবার সমাজরক্ষা না হইলে

ব্যক্তি-জীবন রক্ষা হয় না, সুতরাং পরের দুঃখেও সমবেদনা মূলতঃ ব্যক্তি-জীবন রক্ষার অনুকূল।

জীবন দুঃখময়; কেন না, দুঃখময়তাতেই জীবনের উন্নতি ও আশা। আবার জীবন দুঃখময়; সেই জন্যে জীবনে সুখের আবশ্যকতা। নইলে দুঃখের ভারে জীবন টিকিত না; নইলে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। প্রকৃতির এ কি রকম খেয়াল বুঝা যায় না; কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল এইরূপ। মন্দ করিয়া প্রকৃতি ভাল করে; ভাল করিবার জন্য প্রকৃতির মন্দ ব্যবহার; মানুষের প্রতি দয়াবশতঃ প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর। প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য কি বলা যায় না; বন্ধুশোকার্ত্ত টেনিসন্ দেখিতে পান নাই, আমরাও পাই না, কেন না, যখনই দেখি ভাল, তখনই পরক্ষণেই দেখি মন্দ। সুতরা উহা বিধাতার খেয়াল বা লীলা বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হইবে।

জীবন দুঃখময়, তাই মানুষে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় ও সুখ পায়। সুখ না পাইলে ধরাধামে মানুষ টিকিত না। সুখের মাত্রা অধিক, কি দুঃখের মাত্রা অধিক, সে কথা তুলিব না। তাহার ঠিক উত্তর নাই। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, খুঁজিলে সুখ মিলে। অন্ততঃ মানুষ সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এইটা তাহার জীবনের একটা প্রধান কাজ; এবং অগত্যা সে সুখের সৃষ্টি করে। যে যত উন্নত, তাহার তত দুঃখ; তাহার তত সুখের দরকার; না হইলে তাহার জীবন চলে না; মোটের উপর সে তত সুখ খুঁজিয়া পায়। দুঃখের অনুভূতি যাহার তীক্ষ্ণ, তাহার নাম কবি; কাজেই মোটের উপর কবির সুখের অনুভূতিও প্রবল। সুখের জন্য যে কতকগুলা সামগ্রী জগতের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা নহে। অমুক অমুক পদার্থই সুখ দিবে, সুন্দর দেখাইবে, এমন কোন বিধান নাই। মানুষ সম্মুখে যাহা পায়, তাহা হইতে সুখ টানিয়া আনিতে চেষ্টা করে। দ্রব্যাদ্রব্য বিচার করে না; যেখানে-সেখানে, যখন-তখন সুখের আবিষ্কার করে। কতকগুলা পদার্থ আছে বটে, যাহাতে সাধারণ মানুষ মাত্রেই কিছু-না-কিছু সুখ পায়, কিছু-না-কিছু সৌন্দর্য্য দেখে; উপরে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছি। এই পদার্থগুলা কোন-না-কোনরূপে জীবনরক্ষার পক্ষে অনুকূল ও আশাপ্রদ। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। তাহাদের সুখের বড়ই দরকার; তাই যাহা-তাহা যে-সে পদার্থ হইতে তাহারা সুখ আকর্ষণ করে। তাহা জীবনের উপযোগী, কি জীবনের অন্তরায়, তাহা বিচার করিবার অবকাশ পায় না। বিনা বিচারে তাহাকে মনের মত গড়িয়া লয়; তাহাতে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। জীবনের পথে চলিতে চলিতে দু-চোখে যাহা দেখে, তাহাই রঙিন চশমা পরিয়া রঙিন করিয়া দেখিয়া লয়; কেন না, সৌন্দর্য্যই তাহার পক্ষে আবশ্যক; বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যই তাহার অবলম্বন; বিশুদ্ধ সুখই তাহার লক্ষ্য। যাহা বুঝিতে পারে, তাহাতে আনন্দ পায়; যাহা বুঝে না, তাহাতেও আনন্দ পায়। অনেক সময় যাহা বুঝা যায়, তার চেয়ে যাহা বুঝা যায় না, তাহাতে আনন্দ অধিক হয়। স্থূল হিসাবে এটা সমস্যা। বিজ্ঞানবিৎ জগদ্যন্ত্রের জটিলতা উদ্‌ঘাটন করিয়া যতই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করেন, আবিষ্কৃত নিয়ম-প্রণালীকে যতই মনুষ্য-জীবনের সহায় করিয়া তুলেন, এক কথায় জগতের রহস্যকে যতই বুঝিতে চেষ্টা করেন বা বুঝেন,

ততই তিনি আনন্দ পান, সৌন্দর্য্য অনুভব করেন। আবার সেই দুর্ভেদ্য রহস্যের যে ভাগটা কোন মতে আয়ত্ত হয় না, কোন মতে নিয়মের বশে আসে না, সে ভাগটা আরও সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা সাধারণ মানুষে, যেটা বুঝি, তাহাতে বিশেষ আরাম পাই; আবার যেটা বুঝি না, তাহাতে সময়ক্রমে আরও আরাম পাই। যাহা আপাততঃ নিয়মের বাহির, ইংরেজীতে যাহাকে মিরাকল বলে, তাহার প্রতি মানব-মনের প্রবল আকর্ষণ বোধ করি এই জন্য। অনির্দ্দেশ্য অতিপ্রাকৃত শক্তি সেই জন্য সৌন্দর্য্যে মহীয়সী অনেকের মতে বৈজ্ঞানিকগণ জগতে রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সৌন্দর্য্যের বিনাশে নিযুক্ত আছেন।

রাম-চরিত্রে সীতানির্ব্বাসন অনেকের চোখে ভাল লাগে না, বিশেষতঃ আমাদের মত ইংরেজীওয়ালাদের কাছে। রাম-চরিত্রের এইটুকু ভাল বুঝা যায় না; এবং বোধ হয়, এই জন্যই ইহা সুন্দর। সমাজশক্তির প্রতিঘাতে মহৎ ব্যক্তির জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা বিপ্লব উপস্থিত করে, যাহাতে তাঁহার জীবনের গতি কক্ষাভ্রষ্ট হইয়া যায়। সামাজিক জীবনের এই একটা দুর্ভেদ্য, অতএব সুন্দর রহস্য। বাসন্তীদেবী রামকে সম্মুখে পাইয়া নিরপরাধা সীতার নির্ব্বাসনের অপরাধে বাক্যবাণে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিযাছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইযাছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার রাম-চরিত্রের এইটুকু বুঝিতে না পারিয়া অথচ রাম-চরিত্রের লোকোত্তর গৌরবে অভিভূত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, বজ্র হইতে কঠোর, কুসুম হইতে কোমল, লোকোত্তর চরিত্র কে বুঝিতে পারে?

যাই হউক, সৌন্দর্য্য ও তদনুভবজাত আনন্দ না হইলে মানুষের জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়; তাহাতেই মানুষের এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিয়াছে, এই অনুমান বোধ করি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে।

সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের আলোচনায় এই কয়েকটি কথা পাওয়া গেল—

১। ইতর জীবের মধ্যে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি থাকিতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবুদ্ধির সহিত তাহার তুলনা হয় না। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যেভোগের শক্তি মনুষ্যত্বের একটা প্রধান লক্ষণ মনে করা যাইতে পারে।

২। মনুষ্যমধ্যে আবার সকলের এই শক্তি সমান নহে। এই শক্তির তারতম্যে মনুষ্যত্বের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

৩। প্রকৃতির বহুরূপিতার সহিত জীবের চেতনার গূঢ় সম্পর্ক আছে; প্রকৃতি বহুরূপী না হইলে জীবের চেতনা ফুটিত না। উন্নতচেতন জীব মনুষ্য বিচিত্র ও বহুরূপী প্রকৃতিকে আদর করে। একঘেয়ে জিনিস সুন্দর হয় না।

৪। যাহাতে মানুষের কিছু-না-কিছু লাভ আছে, তাহা মানুষ ক্রমশ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সৌন্দর্য্যবোধে কোনরূপ লাভ আছে দেখাইতে পারিলে সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তি বুঝা যাইবে। কতকগুলি পদার্থ কোন-না-কোনরূপে স্বাস্থ্যের ও জীবনের অনুকূল। আর কতকগুলি পদার্থ জীবন-সংগ্রামে আশঙ্কা দূর করিয়া আশা আনে; নৈরাশ্য দূর করিয়া প্রফুল্লতা আনে। আরও কতকগুলি পদার্থ ব্যক্তিগত জীবনের মুখ্যভাবে আনুকূল্য না করিলেও

সামাজিক জীবনে বা জাতীয় জীবনে আনুকূল্য করিয়া থাকে; পরের প্রতি সমবেদনা জাগাইয়া পরার্থবৃত্তির উদ্দীপনা করে। এই সকল পদার্থ মানুষে পাইতে চায় এবং পাইলে আনন্দিত হয়; অতএব ইহারা সুন্দর।

৫। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের স্থিতি বা পুষ্টি বিষয়ে কোনরূপ আনুকূল্য করে না অথচ মনুষ্যের নিকট অতি সুন্দর, এমন পদার্থেরও অভাব নাই। এমন কি, যাহা অকারণে সুন্দর, তাহার মত সুন্দর অন্য কোন জিনিস নহে। যাহাতে কোন লাভ নাই, সেই সৌন্দর্য্যের বুদ্ধি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য।

৬। এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তির সহিত মনুষ্যের দুঃখবৃত্তি ক্রমশঃ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতেছে। ইহা সত্য কথা। মানুষের উন্নতির ইহা একটা লক্ষণ। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের জন্য আশঙ্কা এবং জাতীয় জীবনে আত্মীয় লোকের জন্য আশঙ্কা হয়ত মনুষ্যের এই দুঃখ-প্রবণতার মূলে বিদ্যমান। এই দুঃখবৃত্তি জীবনের রক্ষা বিষয়ে অনুকূল। যেখানে-সেখানে এই আশঙ্কা না থাকিলে মনুষ্য জীবনরক্ষায় উদাসীন হইত, এবং এই আশঙ্কা হইতেই দুঃখবৃত্তির উৎপত্তি।

৭। কিন্তু কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি ঘটিলে মানব-জীবন দুর্ব্বহ হইত। উন্নত মানব ধরাধামে টিকিত না। মনুষ্য যেমন যেখানে-সেখানে দুঃখ পায়, সেইরূপ যেখানে-সেখানে আনন্দ কুড়াইবার ক্ষমতা না পাইলে মানুষ কিছুতেই বাঁচিতে পারিত না। কোথা হইতে দুঃখ আসিবে, তাহা যেমন সর্ব্বত্র স্থির করা চলে না, সেইরূপ কোথা হইতে কখন আনন্দ পাওয়া যাইবে, তাহাও সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করা চলে না। যেখানে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহা সেই জন্যই অতি সুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের দুঃখবৃত্তি প্রবল, সৌন্দর্য্য কুড়াইয়া পাইবার ক্ষমতা তাহাদেরই তত প্রবল। দুঃখের মত সুন্দর সামগ্রী বোধ করি দ্বিতীয় নাই। কাব্যে এই জন্য করুণ রসের স্থান সর্ব্বোপরি।

৮। সৌন্দর্য্যবুদ্ধি মানুষের মনে, অপিচ সৌন্দর্য্যও মানুষের মনঃকল্পিত। কোন দ্রব্য স্বভাবতঃ সুন্দর নহে, মানুষ তাহাকে স্বার্থের জন্য সুন্দর করিয়া লয়। মানুষই সৌন্দর্য্য রচনা করে। সৌন্দর্য্য-রচনাতেই মানুষের আনন্দ এবং এই আনন্দটুকুই তাহার লাভ। দুঃখ-বহুল সংসারে বিচরণকালে আনন্দ রচনা না করিলে তাহার চলে না। কাজেই সে বাধ্য হইয়া আনন্দরচনাশক্তি অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবুদ্ধি ক্রমশঃ উপার্জ্জন করিয়াছে। যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন, ইহা স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে।

সৃষ্টি

আফ্রিকা-নিবাসী কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত আছে। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি-ঘটনাটা সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল

চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভাগী হইল মানুষে; আধি-ব্যাধি জরামরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।

চাঁদের ও ব্যাঙের স্থলে আর দুইটা প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞজনানুমোদিত আর একরকম সৃষ্টিতত্ত্বের বড় বৈষম্য দেখা যায় না। বিবাদ ঘটিয়াছিল ঈশ্বরে আর শয়তানে; ফলভাগী হইয়াছে দুর্ভাগা মানুষ।

শয়তানের আকার-প্রকার সম্বন্ধে কোনরূপ মতভেদ আছে কি না, বিশেষ জানি না। শুনা যায়, বিখ্যাত ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিৎ কুবীয়ের সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুবীর সহজে ভয় পাইবার ব্যক্তি ছিলেন না। বৈজ্ঞানিকোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে তিনি শয়তানকে বলিলেন, বাপু হে, শিঙে ও খুরেই ধরা পড়িয়াছ; মাংস হজম করিবার শক্তি রাখ না, আমাকে হজম করিবে কিরূপে? কিঞ্চিৎ ঘাস দিতেছি, রোমন্থন কর।

প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বগুলি ছাঁটিয়া কাটিয়া কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়। এক সময় ছিল, যখন কিছুই ছিল না; এই বৈচিত্র্য-মণ্ডিত অপূর্ব্ব জগৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন ছিল। ছিল বোধ করি, কেবল দেশ আর কাল—শূন্য দেশ আর শূন্য কাল; আর ছিলেন সৃষ্টি-কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা নির্গুণ, কি গুণময়, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক করিতে পার; কিন্তু অন্ততঃ একটা উপাধি তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; নতুবা সৃষ্টির কল্পনা হয় না; সেটা সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা। স্রষ্টা ইচ্ছা করিলেন, জগৎ উৎপন্ন হউক, আর জগতের সৃষ্টি হইল; নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব হইল; কিছুই ছিল না, সবই হইল; দেশের ও কালের শূন্যতা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার নাম সৃষ্টি; স্রষ্টার ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহার পূর্ব্বে কি ছিল, কি হইত, জিজ্ঞাসা করিও না; উত্তর মিলিবে না। ইহার পরে কি ঘটিয়াছে বা কি ঘটিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার; উত্তরপ্রাপ্তি দুরাশা নহে। এই সৃষ্টিব্যাপার একমাত্র অসাধারণ ঘটনা; জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। একবার মাত্র কোন একটা সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত আমরা জানি; আর কখনও ঘটিয়াছিল কি না, আর কখনও ঘটিবে কি না, তাহা জানি না।

তিনি ইচ্ছা করিলেন—সৃষ্টি হউক, আর সৃষ্টি হইল; এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিরস্ত থাকিলে চলে কি? না;—আর একটু বলা আবশ্যক। তিনি ইচ্ছ করিলেন—সৃষ্টি হউক; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেন—সৃষ্ট জগৎ এইরূপে এই ভাবে এই পথে চলুক; তাই জগৎযন্ত্র সেইরূপে সেই ভাবে সেই পথে চলিতে লাগিল। যিনি জগতের স্রষ্টা, তিনিই জগতের বিধাতা।

সৃষ্টিতত্ত্বরূপ মহাবৃক্ষের আগাছা পরগাছা শাখাপল্লব ছাঁটিয়া কাটিয়া কেবল কাণ্ডটুকু বা মূলটুকু রাখিলে, উল্লিখিত কথা কয়টির অধিক কিছু থাকে না। জগৎ আছে—স্রষ্টার ইচ্ছা; জগৎ চলিতেছে—বিধাতার বিধানে; এই কথা কয়টির উপর বড় বিবাদ-বিসংবাদ নাই; ইহা একরকম সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু আরও অনেক কথা আছে, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে।

কেহ বলেন, জগৎ বৃহৎ প্রকাণ্ড অসীম; অথচ কেমন সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ। সুতরাং সৃষ্টি-

কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান্। সুদূর অতীত সুদূর ভবিষ্যতের সহিত কেমন বাঁধা, সুতরাং বিধাতা সর্ব্বজ্ঞ।

কেহ বলেন, জগৎ কেমন সুন্দর ; সুতরাং স্রষ্টাও সৌন্দর্য্যময়। কেহ বলেন, জগৎ বড় সুখের ; ঈশ্বর করুণাময়।

আবার কেহ বলেন, জগতে পুণ্যের জয় ; অতএব ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা। ইত্যাদি।

এইরূপে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলেন ও তুমুল কোলাহল করেন। কত হাজার বৎসর ধরিয়া কোলাহল চলিতেছে, কবে নিবৃত্ত হইবে, বলা যায় না।

কেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ আসিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করে, ঈশ্বর সৌন্দর্য্যময়, তবে জগতে কুৎসিতের অস্তিত্ব কেন? ঈশ্বর করুণাময়, তবে জগতে দুঃখ কেন? ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা, তবে দুর্ব্বলের পীড়ন কেন?

উত্তর,—ও সব শয়তানের কারসাজি। শয়তান ঈশ্বরের বিরোধী ; আহ্রিমান অহুর-মজ্‌দের বিরোধী।

তবে কি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন?

উত্তর—কেন, শয়তান ত বন্ধ আছে।

তার চেয়ে শয়তানের নিপাত হইলেই ত ভাল হইত।

উত্তর,—ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এ কেমন ইচ্ছা, বলা যায় না। শয়তানটা বিধাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছে ; তথাপি শক্তি সত্ত্বেও তাহার নিপাত করিব না, মন্দ ইচ্ছা নয়।

আর এক রকম উত্তর আছে। তোমার সামান্য বুদ্ধিতে যাহা দুঃখ, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে তাহা করুণা। তোমার বিকৃত দৃষ্টিতে যাহা কুৎসিত, বিধাতার নির্ম্মল দৃষ্টিতে তাহা সুন্দর।

নষ্টবুদ্ধির প্রশ্ন,—আমার চক্ষুটা এমন বিকৃত করিল কে?

কূটবুদ্ধি লোকে বলে, কুৎসিত অস্বীকার করিলে সুন্দর থাকিবে না ; দুঃখের অস্তিত্ব না মানিলে সুখের অস্তিত্ব থাকে না। যদি সুখ আছে মানিতে চাও, দুঃখও মানিতে হইবে। বিধাতা যদি করুণাময় হন, তবে তিনি দুঃখেরও সৃষ্টিকর্ত্তা।

বৈজ্ঞানিক বলিবেন, প্রকৃতিতে করুণা নাই। যে একটু সুখ বিদ্যমান, দুঃখ হইতে তাহার উৎপত্তি, দুঃখেই বুঝি সমাপ্তি। ধর্ম্মের জয় মিথ্যা কথা ; প্রকৃতির নিয়ম তাহা নহে। স্থূলদৃষ্টিতে বোধ হয়, শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মেরই জয় ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অধর্ম্মের সমান গতি ; উভয়েরই বিনাশ। এ কথার উত্তর নাই। কেহ বলেন, চুপ কর, বিধাতার উদ্দেশ্য—behind the veil—মানব-দৃষ্টির অন্তরালে। কেহ বলেন, তুমি নির্ব্বোধ। কেহ বলেন, দেখ দেখি, এ লোকটার কুম্ভীপাকের ভয় নাই। অপরে বলেন, এস, ইহাকে পোড়াইয়া মারি।

সুবোধ লোকে আসিয়া মীমাংসার চেষ্টা করে। এস ভাই, গণ্ডগোলে দরকার নাই। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, সকলেই মানিয়া থাকি ; ঈশ্বর ইচ্ছাময় ; তাঁহারই ইচ্ছায় সৃষ্টি কখন না কখন হইয়াছে। নতুবা এই এত বড় প্রকাণ্ড পদার্থ জগৎটা আসিল কোথা

হইতে? তবে কোন্ সময়ে, কিরূপে, কেন ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বলিবার উপায় নাই। সে সব অজ্ঞেয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাময়ত্বটুকু বজায় রাখিয়া ঈশ্বরকে নিরুপাধিক বল, ক্ষতি নাই; অজ্ঞেয় বল, আরও ভাল। জগৎ একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র, এই যন্ত্রের উদ্ভাবনে এক জন যন্ত্রীর ইচ্ছা আবশ্যক; তাই ঈশ্বর স্বীকার কর্ত্তব্য। এই যন্ত্রচালনেও এক জন যন্ত্রীর শক্তি আবশ্যক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই সেই শক্তি। তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছারই বিকাশ মাত্র। যন্ত্রটি সুগঠিত, নিয়মিত; বেশ সুস্থ ভাবে চলিতেছে; ইহা যন্ত্রীর মাহাত্ম্য। তবে মাঝে মাঝে মরিচা পড়িলে মেরামতের দরকার হয় কি না, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কেহ বলেন, মেরামত দরকার হয়; সেই মেরামতের নাম মিরাকল্।

এই কথাগুলি শুনিতে বেশ; মীমাংসক মধ্যস্থের উপযুক্ত বটে। কিন্তু দুই একটা এমন উদ্ধতস্বভাব লোক দেখা যায়, তাহারা মধ্যস্থের কথায় তৃপ্ত হয় না। তাহারা বলে—যন্ত্র আছে, অতএব যন্ত্রী আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর স্বীকার্য্য, এরূপ যুক্তি চলিবে না। ঘটের জন্য কুম্ভকার আবশ্যক; সুতরাং বিশ্বজগতের জন্য বিশ্বকর্ম্মার প্রয়োজন, এ যুক্তিটা কিন্তু ঠিক নহে। প্রথম, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করে, বুদ্ধি যোগাইয়া তাহার আকার দেয় মাত্র: ঘটের উৎপাদন করে না। ঘটের উৎপাদন যে মাটি, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ তৈয়ারি মালমশলার উপর বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ঈশ্বর জগৎ গড়িয়াছেন, এই পর্য্যন্ত এ যুক্তিতে আইসে; সেই ব্রহ্মাণ্ড গড়িবার মশলা কোথা হইতে আসিল, এ কথার উত্তর পাওয়া যায় না। কিছু না হইতে কিছুর উৎপত্তি, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে—মানুষের কল্পনার অতীত। সুতরাং সিদ্ধান্ত কিছুই হয় না; তবে বিশ্বাস কর, সে কথা স্বতন্ত্র; যুক্তির কথা তুলিও না।

জগতের মশলা কোথা হইতে আসিল, ইহার উত্তর মিলিল না। তবে মশলা দেওয়া থাকিলে জগদ্‌যন্ত্র নির্ম্মিত হইল কিরূপে, ইহা যুক্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা বিজ্ঞানের বিষয়, বিজ্ঞানেরই বিচার্য্য; বিজ্ঞান কষ্টে-সৃষ্টে যথাসম্ভব উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলে, যাহাকে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলিতেছ, তাহারই দ্বারা জগতের নির্ম্মাণ-প্রণালী ও ক্রিয়াপ্রণালী সঙ্গতভাবে বুঝিবার চেষ্টা হইতেছে; কতক কতক বুঝা যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে, এ কথার উত্তর মিলে না; তবে কিরূপে হইতেছে, তাহার উত্তর বিজ্ঞানের নিকট মিলিতে পারে। যে ভাবের ব্যাখ্যায় মন তৃপ্তি লাভ করে, সেই ভাবের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের নিকট মিলিতেছে। অন্য কোনরূপ বুঝিবার ক্ষমতা মনুষ্যের নাই; সে প্রয়াসও বিজ্ঞান করে না।

বিজ্ঞানের মতে ঈশ্বর এবং পরমাণু, এই দুই মশলাতে জগৎ নির্ম্মিত। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সমুদায় জানিলে কিরূপে জগৎ গঠিত হইয়াছে, কিরূপে চলিতেছে ও কিরূপে চলিবে, বৈজ্ঞানিক তাহা বলিবার ভরসা করেন। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিতে পার। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকারগণের অন্যতম অগ্রণী মহামতি ক্লার্ক মাক্সওয়েল একদা বলিয়াছিলেন, পরমাণুগুলি যেন ছাঁচে ঢালা; অচেতন

প্রাকৃতিক নিয়ম এখানে পরাহত ; এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। মনুষ্যের বুদ্ধি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পথে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যেখানেই কিয়ৎক্ষণের জন্য পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেইখানেই হাল ছাড়িয়া নিরাশভাবে বলিয়াছে, এইখানে একজন শিল্পীর আবশ্যকতা। পরমাণুর গঠনে শিল্পীর আবশ্যকতা কি না, যাঁহারা মানবচিন্তার বিজয়বৈজয়ন্তী বহন করিয়া অগ্রণী মাক্সওয়েলের পদানুসরণ করিতেছেন, তাঁহারাই বোধ করি তাহার উত্তর দিবেন।

আর এক দল আছেন, তাঁহারা বলেন, জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন, জগৎ ছাড়া ঈশ্বরের কল্পনার দরকার নাই। জগৎ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, ঈশ্বরেরই মূর্ত্তি বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। অবশ্য এই মতানুসারে সৃষ্টি শব্দের সার্থকতা নাই ; সৃষ্টিব্যাপার বা ঘটনা বলিয়া কিছু কখন সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ বুঝায় না। বহু দেশে এই মত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বহু দর্শনশাস্ত্রে এই মত মজ্জাগত। এই দলকে ইংরেজীতে স্থূলতঃ Pantheists বলে ; ইহাদিগকে নিরুত্তর করা বড়ই কঠিন, তবে গালি দেওয়া চলে।

মানবজাতি বহু দিন হইতে যে দৃঢ়ভিত্তি সংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বিশ্বাস, জগৎ নামে একটা অসীম বিচিত্র প্রকাণ্ড পদার্থ অনন্ত দেশ ব্যাপিয়া এবং বোধ করি, অনাদি কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছে। মনুষ্য সেই জগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ ; সে তাহার খানিকটা মাত্র দেখিতে পায় ও কিছুক্ষণ মাত্র ধরিয়া দেখে। জ্ঞানের বিকাশ ও উন্নতির সহিত সেই অসীম জগতের পরিচিত অংশের পরিধিটুকু ক্রমে প্রসার লাভ করে বটে ; কিন্তু অসীমের তুলনায় জ্ঞানগত অংশের পরিমাণ সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বতোভাবে নগণ্য। সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি সঙ্কীর্ণ অংশে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে ; কিন্তু এই পরিধির বাহিরে আরও সর্ব্বতোভাবে বিশালতর যে অংশ রহিয়াছে, তাহার কিয়দংশের সহিত ক্রমশঃ আমাদের চেনা-শুনা ঘটিতে পারে ; কিন্তু সমগ্রটা কখনই জ্ঞানের সীমানার ভিতর আসিবে না। এই প্রকাণ্ড পদার্থটা একটা প্রকাণ্ড জটিল যন্ত্রবিশেষ ; তবে যতই আমরা ইহার সহিত পরিচিত হই, ততই ইহার জটিলতা মুক্ত হয় ; ততই আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি সুসঙ্গত নিয়মের শৃঙ্খলায় সমুদায় চাকাগুলি পরস্পরকে আবদ্ধ রাখিয়াছে ; এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিলেই জগদ্‌যন্ত্রের জটিলতা ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রের এই মাত্র সম্পাদ্য।

একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে এই মতটা অনেকখানি বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আমা ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব যুক্তির দ্বারা ঠিক প্রতিপন্ন হয় না। আমি আছি, এটা যেমন প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য, আর কিছু আছে, তাহা ঠিক তেমন সত্য নহে, এবং তাহার প্রমাণ খুঁজিয়া মিলে না।

সাংখ্যদর্শন জ্ঞাতা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞেয় প্রকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; এবং পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পর সম্পর্কে ব্যক্ত জগতের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতির অস্তিত্ব একটা hypothesis বা কল্পনা মাত্র ; এই কল্পনা ব্যতীতও যদি জগতের অভিব্যক্তি অন্যরূপে বুঝা যায়, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে সকলে

সম্মত না হইতেও পারেন। সেকালে বৈদান্তিক ইহা স্বীকার করিতেন না; একালে বার্কলির পরবর্ত্তী বহু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ইহা স্বীকার করেন না। আমি জগতের অংশ তত দূর সত্য নহে, জগৎ আমার অংশ, এ কথাটা যত দূর। জগৎ না থাকিলে আমি থাকিতাম না, বোধ করি, ইহা নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আমি না থাকিলে জগৎ থাকিত না, এটা বোধ হয় কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি। আমাকে ছাড়িয়া ব্যক্ত জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। উহা আমারই কল্পনা বা কারিগরি। জ্ঞান-বিস্তারের সহিত জগতের একটু, আর একটু, আর একটুর সহিত ক্রমশঃ আমার পরিচয় হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে; আমারই চেতনার বিকাশের সহিত আমার জগৎ ক্রমে সৃষ্টি বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, বরং ঠিক।

কতকগুলি চিৎপদার্থ বা চৈতন্যকণার সমবায়ে আমার চেতনা। চৈতন্যের এমন একটি বিশেষ শক্তি আছে যে, সে আপনার সমগ্রটাকে অর্থাৎ সমুদায় ব্যষ্টীভূত চৈতন্য-কণার প্রবাহটাকে সমষ্টিরূপে একভাবে দেখিতে পায়; সমস্ত চেতনাপ্রবাহকে একের চেতনা বলিয়া চিনিয়া লয়; ইহা হইতেই আমি-জ্ঞানের উৎপত্তি। দ্বিতীয়তঃ, ইহা সেই চিৎপ্রবাহের অন্তর্গত চৈতন্যকণাগুলিকে এক এক করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া, বাছিয়া গোছাইয়া সাজাইয়া দেখিতে চায়; আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করে: এই বিশ্লেষণ-চেষ্টায় চেতনার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ। চেতনার তিনটা অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে—সুষুপ্তাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা। মনে করা যাইতে পারে যে, সুষুপ্তাবস্থায় চৈতন্যের এই আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি জন্মে নাই; চৈতন্য হয়ত আছে, কিন্তু আপনার নিকট অপরিচিত; এখনও নিজের কি আছে, কি নাই, তাহা জানে না। স্বপ্নাবস্থায় চৈতন্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে; আপনার কতক কতক আপনার বলিয়া জানিয়াছে; কিন্তু এখনও সাজাইয়া গোছাইয়া লইতে পারে নাই; কাহার সহিত কি সম্বন্ধ, ঠিক করিতে পারে নাই; এবং বোধ করি, আপনার অস্তিত্বের প্রবাহ সম্বন্ধে এখনও আপনি সন্দিহান। জাগ্রদবস্থায় চৈতন্য বিকশিত, স্ফুট, স্ফূর্ত্তিমান্; আপনাকে জানে, আপনার সকলকে চিনে; কোন্ অনুভূতিটা কোন্ স্মৃতিকে উদ্বোধিত করিতেছে, কোন্ স্মৃতি কোন্ আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতেছে এবং সে নিজে সেই অনুভূতিটা, স্মৃতিটা, আকাঙ্ক্ষাটাকে লইয়া কি করিবে, কোথায় রাখিবে, ইত্যাদি লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। স্থূল ভাবে বুঝাইতে হইলে কৃমি-কীটের চেতনাকে বোধ করি সুষুপ্ত, মশা-মাছির চেতনাকে স্বপ্নাবস্থ ও উচ্চতর জীবের চেতনাকে জাগ্রত বলিতে পারা যায়। জোঁকের কাছে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে কি না সন্দেহ, মাছির জগৎ অসম্বদ্ধ, অনিয়মিত, ব্যবস্থাহীন; আর পশু-পাখীর জগৎ অনেকাংশে সুবদ্ধ, সুগ্রথিত, সুসংযত, সুব্যবস্থ। বেদান্ত শাস্ত্রে এই শব্দ কয়টি যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ঠিক সে অর্থে নাই বা লইলাম।

এইরূপে চেতনার আত্মবিশ্লেষণ-শক্তি। সে আপনাকে বিশ্লিষ্ট, বিভিন্ন, ছিন্ন করিয়া দুই ভাগে রাখে, এক ভাগের নাম দেয় আত্মা, অহং বা আমি; আর এক ভাগের নাম দেয় প্রকৃতি অথবা বাহ্য জগৎ। এবং এই দুয়ের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধ-

নির্ণয় লইয়া আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখিয়া কৌতুক করে। যে চিৎপদার্থগুলির সমষ্টিকে আপনা হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখিয়া ব্যক্ত প্রকৃতি বা বাহ্য জগৎ নাম দেয়, তাহাদিগকে আবার দুই রকমে সাজাইয়া দেখে।

এক রকমে গোছানর নাম দেশব্যাপ্তি, আর এক রকমে গোছানর নাম কালব্যাপ্তি। কতকগুলা একসঙ্গে দেখে; কতকগুলা পর পর দেখে। অথবা একরকমে দেখার নাম দেশে দেখা—যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া দেখা; আর এক রকমে দেখার নাম পর পর দেখা, কালে দেখা, যথাকালে বিন্যস্ত করিয়া দেখা। তৃতীয় কোন রকমে দেখে না; কেন দেখে না, তাহার উত্তর নাই। সুতরাং দেশ ও কাল এই চেতনার আত্ম-নিরীক্ষণের রীতি মাত্র। যে অর্থে আমার বাহিরে অন্য জগৎ নাই, সেই অর্থে আমার বাহিরে দেশও নাই, আমার বাহিরে কালও নাই। আমিই আমার অনুভূতিগুলিকে আমারই আবিষ্কৃত উপায়ে দেশে স্থাপিত করি ও কালে বিন্যস্ত করি; সব অনুভূতি-গুলিকে নহে, কতকগুলিকে মাত্র; কেন না, আমার চেতনা এখনও পূর্ণ বিকাশ লাভ করে নাই, পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই। সাজান ও গোছানর দিকেই আমার প্রয়াস, এবং সেই প্রয়াসেই চেতনার বিকাশ। এই প্রয়াসে শক্তিসঞ্চয়ের ও শ্রমসংক্ষেপের প্রবল চেষ্টা। সকল অনুভূতি আমি চিনি না; যাহাদিগকে চিনি, তাহাদের মধ্যেও আবার কতকগুলিকে সাজাইবার সময় বাছিয়া লই। সাজাইবার সময় কতকগুলিকে ডাকিয়া লই, কতকগুলিকে অনাদরে পরিত্যাগ করি। আবার মনের মতন করিয়া সাজাই। পরস্পর সুসম্বদ্ধ সুনিয়ত একটি শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ রাখিয়া সাজাই। যখন যাহাকে দরকার হয়, তখনই যেন তাহাকে ডাকিয়া পাই; যেন ভেরীর আওয়াজের সঙ্কেত শুনিবা মাত্র সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থলে সুসম্বদ্ধ সুবিন্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া যায়; যেন ব্যূহরচনার পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ না হয়। যেন ব্যূহরচনা হইতে হইতেই যুদ্ধে হঠিতে না হয়। কে কাহার সহিত যুদ্ধে হঠিবে? আমাকে আমার প্রক্ষিপ্ত বাহ্য জগতের সহিত কাল্পনিক যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিয়া আমি কৌতুক দেখিতেছি; সেই কল্পিত যুদ্ধে কল্পিত বাহ্য জগতের কাছে আমাকে যেন হঠিতে না হয়। বাহ্য জগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সুবিহিত ব্যবস্থা রাখিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চেতনার কারিগরি এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে বা বহির্জগতে নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেন না, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা। নিয়মের প্রতিষ্ঠাতে আমার চৈতন্যের শ্রমসংক্ষেপ, চেতনার বিকাশ ও পূর্ণতার দিকে গতি; আমার কল্পিত জীবনসংগ্রামে জয়লাভের ভরসা। তাই আমি আমার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। তাই আমার জগতের নিয়মবশে পৃথিবী ঘুরে, বাতাস বহে, আলো জ্বলে। তাই আমার জগৎ ছন্দোবদ্ধ সুললিত কবিতা, পঠনে প্রাঞ্জল, শ্রবণে মধুবর্ষী।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; সেই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতেই আমার আনন্দ ও শান্তি; নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে, তাহাকে দৈব বলি, অতিপ্রাকৃত বলি, মিরাকল বলি। তাহার জন্য ভূতপ্রেতপিশাচের-

দেবতা উপদেবতার কল্পনা করি। তাহার জন্য আমা-ছাড়া জগৎ-ছাড়া সৃষ্টিছাড়া একজন সৃষ্টিকর্ত্তার ও বিধাতার কল্পনা করি।

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের অধীনতায় আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্ব্বত্র যে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা নহে, তবে ইহার সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ। ইহারই নাম বিজ্ঞানচর্চ্চা,—যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাশ। আমার জগতে আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; ক্ষুধা পাইলে আমি খাই, ঘুম পাইলে ঘুমাই ও আমার জগতে অহোরাত্র পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। ঐ ব্যক্তি, যাহাকে পাগল বলা যায়, উহার জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ও ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে খায় না এবং উহার নিকট বোধ করি, দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন ঘটে না। উহারও একটা জগৎ আছে; কিন্তু সেটা আমার জগতের মত সুনিয়ত সুব্যবস্থ নহে; সে জগৎটা এলোমেলো অসংযত অযথান্যস্ত।

প্রকৃতি যেমন আমারই অন্তরে, প্রকৃতির দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি তেমনই আমারই অন্তরে, এবং প্রকৃতিতে নিয়মের শৃঙ্খলা তেমনই আমারই সৃষ্টি। জগৎ অনন্ত, এ কথা অর্থহীন; কাল অনাদি, এ কথা অর্থহীন; দেশ অসীম, এ কথাও অর্থহীন। আমার জগৎ সান্ত: যেটুকু আমি যখন দেখিতেছি, সেইটুকুই তখন অস্তিত্ববান; তাহা ছাড়িয়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই। আমার কালও সাদি ও সান্ত, যেটুকুর সহিত আমার পরিচয়, সেইটুকুই অস্তিত্ববান্। অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার: উহা কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমার আত্মবিকাশের সহিত আমার জগতের পরিধি বাড়িতেছে, দেশের সীমারেখা ও কালের সীমারেখা দূর হইতে আরও দূরে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহার আত্মা সুস্থ বলিষ্ঠ ও সামর্থ্যবান্। যাহার নিকট নিয়মের প্রতিষ্ঠা নাই সে বাতুল বা পাগল।

আমার নিজের এই অভিব্যক্তির নাম জগতের সৃষ্টি। মানবের জ্ঞান আর দ্বিতীয় সৃষ্টির বিষয় অবগত নহে।

অতি প্রাকৃত

প্রথম প্রস্তাব

দুই চারি জন খ্যাতনামা ব্যক্তি অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন, দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের মনে একটা বিষম খট্‌কা উপস্থিত হয়। অমুক অমুক ঘটনা এত দূর অবিশ্বাস্য যে, মনকে নিতান্ত বলপূর্ব্বক না টানিলে মন সেদিকে ধায় না; তথাপি আমাদের অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যখন সেই সেই ঘটনায় নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিতেছেন, তখন কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতে হয়।

মনুষ্যচরিত্র রহস্যময়। অতিমাত্র সংযতচিত্ত মনস্বী ব্যক্তিরও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কোন

স্তরে, কোন পর্দ্দার অন্তরালে, এমন একটা গোলযোগজনক কিছু থাকিতে পারে, যাহাতে তাঁহার বাহ্য আচরণ ও কর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য অকস্মাৎ নষ্ট করিয়া দেয়। এতটুকু নির্ভয়ে বলিতে পারা যায়। কাজেই কোন কোন বড় লোক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, ইহাতে বিস্মিত হওয়া অনুচিত। তবে মানবজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস এতটা প্রচলিত যে, ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিরর্থক না হইতে পারে। এই বিশ্বাস মনুষ্যজাতির ঠিক প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ কি না, এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। মনের কথা সাহসের সহিত ও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, যেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের দিকে মনের একটা ঝোঁক আছে, যেন ঐ বিশ্বাসে মন একটু আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। ভূত মানি বলিতে সকলের 'নৈতিক' সাহসে কুলায় না; তবে মনের পর্দ্দার স্তরের নীচের স্তর খুঁজিয়া দেখিলে, সেখানে যেন ভূতের অস্তিত্বের প্রতি একটা আগ্রহ দেখা যায়। সময়ে অসময়ে, বিজনে আঁধারে এই আগ্রহ মৌখিক অবিশ্বাস ও যুক্তির আচ্ছাদন ছিন্ন করিয়া হৃৎকম্প প্রভৃতি দৈহিক ইঙ্গিতে আপনাকে প্রকট করিয়া ফেলে। মুখ যখন বলে, ভূত মানিব কেন, মন যেন ভিতরে থাকিয়া ইশারায় হাস্য করে। অনেকের মানসিক অবস্থা এইরূপ; যুক্তিতে ও স্বভাবে গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়া মনের ভিতর এ রকম একটা উড়ু-উড়ু ভাব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যে, যদি কোন প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক আসিয়া হঠাৎ প্রতিপন্ন করিয়া দেন যে, ভূত আছে ও তাহার রঙ্ কাল ও পা বাঁকা, তাহা হইলে মন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। যাহা হউক, এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, যেন অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলেও এই সংস্কারই বদ্ধমূল হয়। আদিকালে মনুষ্যমাত্রই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিত; এবং এক্ষণেও যাহারা জ্ঞানজীবনের শৈশবভাব ত্যাগ করে নাই, তাহারাও নিরুদ্বেগে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেবল যে তাহারাই করে, এরূপ বলিলে বড়ই অবিচার করা হয়। কেন না, যাঁহারা জ্ঞানজীবনে যৌবনগ্রস্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাসের হাত হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের উপর অদ্যাপি বড় বড় ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, জ্ঞানের উন্নতি বিস্তারের সহিত অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটা কমিয়া আসে। আজকাল অনেক লোক এমন আছে, যাহারা এই বিশ্বাস অঙ্গীকার করিতে লজ্জিত হয়; দুই-এক জন বা প্রকৃতপক্ষেই বিশ্বাস করে না। সুতরাং মোটের উপর দাঁড়ায় এই যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; অবিশ্বাস মানুষের উপার্জ্জিত।

একটু চাপিয়া ধরিলে এই সিদ্ধান্তটা কত দূর টিকে, বলা যায় না। একটু যেন যুক্তিতে গোলযোগ আছে। কিন্তু গোলযোগ ঠিক তাৎপর্য্যগত বা ভাবগত নহে, অনেকটা শব্দগত বা আভিধানিক। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত, এই শব্দ দুইটার অর্থ লইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। প্রাকৃত শব্দের অর্থ যাহা প্রকৃতিনির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ যাহা প্রকৃতির নিয়মিত বিধানের বাহিরে। এখন আদিম মনুষ্যের অবস্থা দেখা যাউক। মনুষ্যের জ্ঞান যখন ইতরজীবের ন্যায়

সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল, তখন সে প্রাকৃতিক নিয়মের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল কি না সন্দেহ। ইতর জীবে ক্ষুধাতৃপ্তির ও দিনরাত্রির পর্য্যায় অনুভব করে; কিন্তু সেই পর্য্যায় যে একটা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত, এত দূর বোধ তাহাদের জন্মিয়াছে কি না বলা যায় না। কাল রাত্রি প্রভাত হইবে এবং তখন ক্ষুধা উপস্থিত হইবে, অতএব তাহার বন্দোবস্ত আজি এখনই স্থির করিলে ভাল হয়, ইতর জীবের এতটুকু বিচারশক্তি আছে, স্বীকার করা যায় না। তবে কোন কোন জন্তু যে ছয় মাস পূর্ব্বে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখে, সে স্বাভাবিক সংস্কারবশে, স্বভাবের অঙ্কুশ-তাড়নায়। আদিম মানবের অবশ্য এইটুকু অথবা ইহার উপরেও অনেকটুকু উঠিবার সামর্থ্য ছিল। দিনরাত্রি, ক্ষুধাতৃপ্তি, শ্রমারাম এবং এইরূপ আরও কয়েকটা ব্যাপারের পর্য্যায় ও সেই পর্য্যায়ের নিয়মানুবর্ত্তিতা আদিম মানবের বুদ্ধিগত ছিল, ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে কোনরূপ সঙ্গতি বা পর্য্যায়, সহচর্য্য-সম্বন্ধ অথবা পারম্পর্য্য-সম্বন্ধ তাহারা দেখিতে পাইত, এরূপ জোর করিয়া বলা যায় না। মোটের উপর অধিকাংশ জাগতিক ব্যাপার তাহাদের নিকট ঘটিত এই মাত্র; তাহাদের অনুভূতির ভিতর আসিত এই মাত্র: যখন ঘটিত, তখন তাহারা অনুভব করিত এই মাত্র। এই সকল জাগতিক ব্যাপার যে ঘটিবে বা ঘটিবে না, অথবা কবে কোথায় কিরূপে ঘটিবে, এ সকল প্রশ্ন তাহাদের মনের মধ্যে কখন উপস্থিত হইত না। অর্থাৎ দুই একটা ঘটনা বাদ দিয়া সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা তাহাদের অনুভূতির বিষয় ছিল মাত্র: তাহাদের বুদ্ধিপ্রয়োগের বিষয় ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই প্রাকৃত ছিল; অতিপ্রাকৃতের অস্তিত্ব তাহাদের নিকট ছিল না। আমরা এখন অতিবুদ্ধিবলে অতিবলীয়ান হইয়া দর্পসহকারে বলিয়া থাকি, এ ঘটনা অসম্ভব। তাহাদের এরূপ দর্পপ্রকাশের কোনরূপ অবকাশ ছিল না। তাহাদের নিকট সকলই সম্ভব, সকলই বিশ্বাস্য ছিল। অসম্ভাব্য, অতএব অবিশ্বাস্য, এরূপ তাহাদে নিকট কিছুই ছিল না।

অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃত জানিয়াও, প্রকৃতির নিয়মের সহিত অসঙ্গত বুঝিয়াও, তাহাতে বিশ্বাস এক কথা; আর প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত এই ভেদবোধের অনুদয় হেতু সর্ব্বত্রই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ব্যক্তি-বিশেষের আদেশে সূর্য্য আকাশমার্গে স্থির ছিল, ব্যক্তিবিশেষ মৃত্যুর পর ভক্ত জনকে দেখা দিয়াছিলেন, ইত্যাদি ঘটনায় আমরা অতিপ্রাকৃত বুঝিয়াও কোন স্থানে মনের সহিত ঝগড়া করিয়া, কোন স্থানে অপরের সহিত ঝগড়া বাধাইবার উদ্দেশ্যে, বিশ্বাস করি। কিন্তু সেকালের মানুষের নিকট ঝড়বৃষ্টি ভূমিকম্প চন্দ্রগ্রহণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ঘটনার মত ঐ সকলও নৈসর্গিক ও সম্পূর্ণ সম্ভবপর বলিয়া গৃহীত হইত। এইরূপে দেখিলে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে যে স্বাভাবিক, তাহা বলা যায় না। অলৌকিক অসাধারণ অদ্ভুত ঘটনায় মানুষে যে বিশ্বাস করে, অতিপ্রাকৃতে স্বাভাবিক বিশ্বাস তাহার কারণ নহে। তাহা যে প্রাকৃত নহে, নিয়মসঙ্গত নহে, এই বোধের অনুৎপত্তিই তাহার প্রকৃত কারণ। অতিপ্রাকৃতিকে মানুষ প্রাকৃত জানিয়াই বিশ্বাস করিতে চায়।

আদিম মানব সকল ঘটনাই সম্ভাব্য বলিয়া জানিত। আমরা সেই আদিম

মানুষেরই বংশধর ; জগৎ সম্পর্কে কতকটা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া কয়েকটা ধাপ উপরে উঠিয়াছি সত্য ; কিন্তু প্রাচীন সংস্কার এখনও আমাদের অস্থিমজ্জা হইতে লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং একটা অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনা শুনিলেই তাহাকে উড়াইয়া দিতে হইবে, এরূপ বাক্যের সমর্থনে আমাদের অনেকেই অসম্মত।

আর একটা কথা। জ্ঞানের উন্নতিতে অনেক নূতন নূতন জাগতিক ব্যাপার আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মানুষ সে সকলের অস্তিত্ব কল্পনায় আনিতেও সাহস করে নাই। এত নূতন নূতন ব্যাপার যখন দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিতেছে, তখন জগতে আরও কত কাণ্ড আছে, কে বলিতে পারে? এখন যাহাকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইতে চাহিতেছ, কে বলিতে পারে, দশ বৎসর পরে তাহাই প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইবে না? এই ত কিছু দিন আগে মেস্‌মার সাহেবকে লোকে বুজরুক মাত্র বলিয়া জানিত। কিন্তু আজ হিপ্‌নটিজম্ বা বশীকরণ বিদ্যাকে অমূলক বলিতে কে সাহস করে?

বিজ্ঞানের উন্নতিই অলৌকিকে বিশ্বাসীর দলের মত অনেকটা পোষণ করিতেছে। এই ঘটনাটা প্রকৃতির নিয়ম-বহির্ভূত, এ কথা সাহস করিয়া বলা বড়ই দুঃসাহসিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং অসাধারণ ঘটনা মাত্র অবিশ্বাস্য, এ কথা বলিও না। জগতে কি আছে, কি ঘটিতে পারে, এখন তুমি তাহার কি জান?

যাঁহারা এইরূপ যুক্তির অবতারণা করেন, তাঁহারা অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন না। ঘটনা মাত্রকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া উড়াইয়া দিতে নিষেধ করেন মাত্র।

ইহা সত্য যে, অনভিজ্ঞতার জোরে আমরা অনেক সত্য ঘটনাকে অলীক বলিয়া উড়াইতে চাই। কিন্তু সে কার্য্যটা প্রশংসার্হ নহে।

যাহাই হউক, অতিপ্রাকৃত অর্থাৎ বস্তুতই প্রকৃতির সহিত সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত ঘটনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা উঠিল না। যাহাকে আমরা অজ্ঞতাবশে প্রকৃতির নিয়মছাড়া বলিতে যাই, তাহা বস্তুতঃ নিয়মসঙ্গত হইতে পারে ও অসম্ভাব্য ও অবিশ্বাস্য না হইতে পারে; এই পর্য্যন্তই বলা হইল।

অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্ভবে কি না, তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতির নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী ঘটনায় বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। তবে ইদানীং আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মে অভিজ্ঞতার অপেক্ষা অজ্ঞতার পরিমাণ অনেক অধিক। সুতরাং একটা নূতন কথা শুনিলেই সেটা অতিপ্রাকৃত বলিয়া উঠা অদূরদর্শিতার পরিচয়। আবার নূতন কথা শুনিলেই যে বিশ্বাস করিতে হইবে, এমনও নহে। তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান কর্ত্তব্য। হইতে পারে, ঘটনার সাক্ষিগণ মিথ্যাবাদী, অথবা অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতারিত; হইতে পারে, তাহাদের ইন্দ্রিয় কোনরূপে প্রতারিত হইয়াছে, অথবা তাহাদের বোধশক্তি তখন সুস্থ দশায় ছিল না। এইরূপে অনুসন্ধান করিয়াও যদি দেখা যায়, ব্যাপারটা অমূলক নহে, তখন আমাদের প্রাকৃতিক নিয়মের অনভিজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে। ঘটনাটাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী বা অতিপ্রাকৃত বলিবার প্রয়োজন হইবে

না।

লোকালয়ের বাহিরে ও দূরে বৃহৎ জলাশয়ে নানা জাতি ছোট বড় মাছ, কাছিম কাঁকড়া ও শামুক-গুগলির সহিত পুরুষপরম্পরাক্রমে ঘরকন্না করে। উহার মধ্যে কোন জাতি মাছ যদি মানুষের মত বুদ্ধিজীবী হয়, তাহা হইলে সে আপনার জলময় জগতের সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই নিয়মের অভিজ্ঞতাবলে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে জানে না যে, সে যে-জগতের অধিবাসী, তাহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ও তাহার বাহিরে একটা বৃহত্তর জগৎ আছে, যেখানে জলময় জগতের নিয়ম খাটে না, এবং যেখানে কাছিম-কাঁকড়া ও শামুক-গুগলির অপেক্ষা সহস্রগুণে শক্তিশালী নানা জন্তু বাস করে, যেখানকার প্রাকৃতিক ঘটনার সহিত জলাশয়ের ভিতরের ঘটনার মিল খুব অল্প। একদিন যদি সেই বাহিরের কিম্ভূত কিমাকার জগৎ হইতে ধীবর-নামধারী বৃহৎ জন্তু সহসা সেই দীঘিতে জাল ফেলে, তখন এই ঘটনা জলাশয়ের অধিবাসীদের পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব অসাধারণ ঘটনা বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। তাহারা তখন এই ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত উৎপাত বলিয়া গণ্য করিতে পারে। অন্ততঃ পুরুষপরম্পরার অভিজ্ঞতাবলে তাহারা আপনাদের জগতের সম্বন্ধে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, এই ঘটনাটি সেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী হইবে না। আবার সেই জাল-নামক কিম্ভূতকিমাকার দ্রব্য যদি দুই একটা রুই কাতলাকে সহসা ধরিয়া লইয়া অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে এই অতিপ্রাকৃত উৎপাতে মৎস্যসমাজ একেবারে বিস্মিত শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? একটা কাতলা মাছ এই-রূপে দীঘির তটে নীত হওয়ার পর যদি কোন ক্রমে আবার দীঘির জলে লাফাইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে মুহূর্ত্তের জন্য যে নূতন জগতের পরিচয় পাইয়া আসিয়াছে, সেই জগতের তত্ত্ববার্ত্তা তাহার মুখে শুনিয়া তাহার জ্ঞাতিবন্ধু নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইবে কি?

আমরা মাছের চেয়ে বৃহত্তর জগতে বাস করি; কিন্তু আমাদের জগতের বাহিরে আরও একটা কিম্ভূতকিমাকার জগৎ যে থাকিতে পারে না, তাহা সাহস করিয়া কে বলিবে? সেই জগৎ হইতে কোন নূতন অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি আসিয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ জগতে হঠাৎ আপতিত হইলে তাহাতে আমরা বিস্মিত ও চকিত হইতে পারি, তাহাকে অতি-প্রাকৃত মনে করিয়া শঙ্কিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা অমূলক বা অলীক বলিয়া উড়াইলে চলিবে কেন? এবং আমাদের মধ্যে যদি কেহ কোন সূত্রে কোনরূপে সেই বৃহত্তর জগতের সন্ধান পাইয়া তাহার বার্ত্তা লইয়া আসেন, তাহাতেই বা বিস্ময়ের কারণ কি হইবে? ঐরূপ ঘটনাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইলে চলিবে না, তবে উহাকে অতিপ্রাকৃত আখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন দেখি না। কেন না, প্রকৃতি যদি বিশ্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে বিশ্বব্যাপী জগতের যেখানে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সকলই প্রাকৃত; অতিপ্রাকৃত ঘটনা হইতেই পারে না। আজ আমার সহিত তাহার পরিচয় নাই বা পরিচয় অল্প, কিন্তু এক কালে আমার জ্ঞানবুদ্ধির সহকারে উহার সম্যক্ পরিচয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক কালে হয়ত আমি উহার পরিচয় পাইব এবং আজ যে ঘটনাকে পরিচিত জগৎ-প্রণালীতে স্থান দিতে পারিতেছি না, তখন তাহাকে সেই প্রণালীর মধ্যে স্থান দেওয়া

অসাধ্য হইবে না।

কিন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে পরস্পর একটা সম্পর্ক, একটা সুনিয়ত সম্বন্ধ থাকিতেই হইবে, এমন কি কথা আছে? কোন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব নূতন ঘটনা ঘটিলেই এখন তাহাকে জগৎপ্রণালীতে স্থান দিতে পারিতেছি না, কিন্তু এককালে স্থান দিতে পারিব, এরূপ মনে করিবার হেতু কি? জগৎপ্রণালী সুব্যবস্থিত সুশৃঙ্খল সুনিয়ত হইবেই হইবে, এরূপ মনে করিবার হেতু কি আছে?

এই স্থলে একটু সূক্ষ্মদর্শনের আবশ্যকতা আছে। পরিতাপের বিষয়, বড় বড় পণ্ডিতেরাও দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই সূক্ষ্মদর্শনটুকু প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া যান। প্রকৃতি, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি শব্দগুলি লৌকিক প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিয়া অনর্থক গোলযোগে প্রবৃত্ত হয়েন। বহিঃপ্রকৃতি অথবা বাহিরের জগৎ সর্ব্বতোভাবে মানব-মনেরই সৃষ্ট, এ কথাটা আমরা যখন-তখন ভুলিয়া যাই। জগৎ আমাদের বহিঃস্থ, স্বাধীন, স্বতঃসৃষ্ট, স্বতন্ত্র অস্তিত্বযুক্ত একটা-না-একটা কিছু, এই ধারণাটাই আমাদের মনে সর্ব্বদা যেন জাগিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার জগৎ আমারই সৃষ্ট: তোমার জগৎ তোমারই সৃষ্ট। আমার জগৎ আমারই একটা মনগড়া পদার্থ, যাহা আমার সুবিধার জন্য আমি আমার বাহিরে কোন রকমে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছি। সেইরূপ তোমার জগৎ তোমারই প্রক্ষিপ্ত মনগড়া পদার্থ। আমার জগৎটা সর্ব্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে, যেহেতু আমি সর্ব্বাংশে তোমার অনুরূপ নহি। আমার জগতে যে সকল নিয়মের অস্তিত্ব আমি বোধ করি, সে আমারই কায়দা। তাহাতে আমারই সুবিধা। জগৎকে নিয়মানুযায়ী দেখিলে আমার জীবনযাত্রার যথেষ্ট সুবিধা ঘটে। অনিয়ত দেখিলে জীবনযাত্রা ভার হইয়া উঠে। সেই জন্য আমার জগৎকে আমি নিয়মানুযায়ী ও নিয়মের অধীন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি। আমার জগতে আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমার জগতের সহিত আমার নিত্য আদান-প্রদান, নিত্য কারবার চলিতেছে। সেই আদান-প্রদান ও কারবারের সুবিধার জন্য আমি নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। জগতের উপর আমার কতকটা প্রভুত্ব আছে। সেই প্রভুত্বের পরিমাণের উপর আমার জীবনের উৎকর্ষ নির্ভর করে। অথবা যে পরিমাণে আমি আমার জগতের উপর প্রভুত্ব চালাইতে পারি, সেই পরিমাণে আমার জীবন উন্নত, অভিব্যক্ত, সার্থক। এই প্রভুত্ব চালনার জন্য জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। বাহ্য প্রকৃতি যেমন আমারই সৃষ্টি, প্রাকৃতিক নিয়মও তেমনই আমারই সৃষ্টি। যাহার জগৎ যে পরিমাণে নিয়মসঙ্গত হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে জীবন-সমরে বলীয়ান্। আমি নিয়মের স্থাপনা করিয়াছি এবং জগতের যে অংশ এখনও নিয়মাধীন হয় নাই, তাহাতেও নিয়মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রহিয়াছি। আমার সমগ্র শক্তি এই চেষ্টার অনুকূল। প্রথমে যখন আমার জগৎ-নামধারী কল্পনাটুকু আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সবই এলোমেলো বিশৃঙ্খল দেখি। ক্রমশঃ তাহাকে সুবিন্যস্ত ও সুবিহিত করিয়া যথাদেশে যথাকালে স্থাপিত করিয়া লই। আমার আত্মপ্রসারণের সহিত আমার জগতের পরিসর বৃদ্ধি পায়। আমি সেই জগতের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইয়া আশে পাশে হাত বাড়াইয়া যথাসাধ্য গোছাইয়া ও বিধানানুগত করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিয়া লই।

যত দূর সাধ্য, তত দূর করি। সবটাকে আয়ও করিতে পারি না। আশে-পাশে নিকটে যতটুকু আছে, তাহাকে বিধানবিন্যস্ত করি। জগতের কেন্দ্র হইতে দূরদেশে, যেখানে হাত বাড়াইতে সকল সময় পারি না, সেখানে এমন অনেক জিনিষ রহিয়া যায়, যাহা আমার নিয়মের ভিতর টানিয়া আনিতে পারি না। সেখানে আমার প্রভুত্ব বড় খাটে না। সেই অনিয়ত জিনিষগুলা আমার অধীন হয় না। আমার জীবনের কাজে তাহাদিগকে নিয়োগ করিতে পারি না। অনেক সময় তাহারাই অতর্কিত ভাবে আমার উপর প্রভুত্ব চালায়। আমি ভুলিয়া যাই যে, আমারই সৃষ্ট পদার্থ আমাকে আক্রমণ করিতেছে। ভুলিয়া যাই যে, আমার শক্তির অভাবে যাহাদিগকে আমার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীনতায় অদ্যাপি আনিতে পারি নাই, তাহারাই আমাকে জীবনযাত্রায় প্রতিরোধ করিতেছে, আমার জীবনের পথ কণ্টকিত করিতেছে। আমি নিজের ছায়া দেখিয়া বালকের মত ভয় পাইতেছি। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া উপাখ্যানের কুকুরের মত প্রতারিত হইতেছি। আপন প্রতিবিম্বের বিভীষিকা দেখিয়া উপাখ্যানোক্ত সিংহের মত নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতেছি। এই সকল জাগতিক ঘটনাকেই আমরা ভয় করি; ইহাদের দর্শনে আমাদের আতঙ্ক জন্মে; ইহাদের স্পর্শে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কেন না, ইহারা এখনও নিয়মের বশে আইসে নাই, এখনও জীবনের অনুকূল হয় নাই; এখনও ইহারা জীবনের প্রতি-কূলতা করিতে ছাড়ে না। ইহাদিগকে দেখিযা সময়ে সময়ে শিহরিয়া উঠি এবং বলি—এটা মিরাক্‌ল, ওটা অতিপ্রাকৃত। বস্তুতঃ ইহা অতিপ্রাকৃত এই অর্থে যে, এখনও ইহা প্রকৃতিব নিয়মের অন্তর্গত হয় নাই। অতিপ্রাকৃত রহিবে কি না, তাহা আমার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার শক্তি থাকে, কালে অতিপ্রাকৃতকে প্রাকৃত করিয়া লইব, শক্তি না থাকে, অতিপ্রাকৃতই রহিবে।

আমার জগৎ সর্ব্বাংশে তোমার জগতের অনুরূপ নহে। আমার জগৎ যত বড়, তোমার ঠিক তত বড় নহে। হয়ত আমার জগতের দেশগত পরিসর অধিক; হয়ত আমার জগতের কালগত বিস্তৃতি অধিক। সে আমার আত্মোৎকর্ষের পরিচয়। আমার জগতের ভিতর যা-যা আছে, তোমার জগতের ভিতর যে ঠিক তাই-তাই আছে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার প্রমাণ; রঙ্‌কাণা লোক তাহার প্রমাণ; তাহাদের জগৎ সর্ব্বাংশে আমার জগতের মত নহে। আমার জগতে আমার প্রত্যক্ষ বিষয় যাহা-যাহা আছে, তোমার জগতে তোমার প্রত্যক্ষ বিষয় সে সমস্ত নাই। আবার তোমার জগতে যাহা আছে, আমার জগতে তাহা নাই। তুমি যাহা দেখিতে পাইতেছ, আমি তাহা দেখিতে পাই না। তাই বলিয়া তোমাকে মিথ্যাবাদী অথবা প্রতারিত অথবা বিকৃতেন্দ্রিয় অথবা বিকৃতবুদ্ধি বলা আমার সাজে না। আমার পক্ষে আমার জগৎ যেমন সত্য, তোমার পক্ষে তোমার জগৎ তেমনি সত্য। জাগ্রতের পক্ষে তদানীং অনুভূত জগৎ যেমন সত্য, সুপ্তের পক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ তেমনই সত্য। আমার নিকট আমার সুনিয়ত সুব্যবস্থ জীবনানুকূল জগৎ যেমন সত্য; পাগলের পক্ষে তাহার অনিয়ত অব্যবস্থ জীবনের প্রতিকূল জগৎ তেমনই সত্য। তবে পাগলকে অবজ্ঞা করি কেন? তাহার কারণ, আমি জীবন-সমরে সমর্থ, আর সে অসমর্থ।

এখনও যে মনুষ্যজাতি অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখে, সে বিভীষিকা অলীক নহে। যে দেখে, সে মিথ্যাবাদী না হইতে পারে, কিন্তু সে অশক্ত। যে যে-পরিমাণে দেখে, সে সেই পরিমাণে অশক্ত। মনুষ্যজাতির শক্তিসঞ্চয়ের সহিত অতিপ্রাকৃতের সংখ্যা ও পরিমাণ কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে মানবাত্মার পরিসর কখন শেষ সীমা প্রাপ্ত হইবে, মানব কোন্ সময়ে সৃষ্টি শক্তি হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। যে পর্যান্ত সেই শেষ দিন না আইসে, সে পর্য্যন্ত প্রাকৃতের সহিত অতিপ্রাকৃত এই অর্থে মিসিয়া মিশিয়া বর্ত্তমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

অতিপ্রাকৃত

দ্বিতীয় প্রস্তাব

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিব কি না, একালের একটা প্রধান সমস্যা। সেকালের লোকে নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিত। একালের এত লোকে বিশ্বাস করে যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও অবিশ্বাসটাই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অস্বাভাবিক হইলেও একালের বৈজ্ঞানিকেরা অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাস করেন। আর যাঁহারা আপনাদের অবৈজ্ঞানিকতা স্বীকারে কুণ্ঠিত, তাঁহারাও একালের বিজ্ঞানের খাতিরে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিতে লজ্জিত হন। কিন্তু যখন শোনা যায়, দুই-এক জন বড় বড় বৈজ্ঞানিক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, তখন বড় খট্‌কা দাঁড়ায়। থিয়সফিষ্টদের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলেই তাঁহারা উল্লাসের সহিত ওয়ালাশ ক্রুক্‌স ও লজের নাম করিয়া ফেলেন। তখন তাঁহাদের দশনপ্রভায় আঁধার ঘর আলো হইয়া পড়ে। আমাদের মত অপণ্ডিত লোকে যাঁহারা উক্ত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য-মহিমায় মুগ্ধ আছেন তাঁহারা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন।

অগত্যা তখন বলা যায়, বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজ্যশাসন নাই। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিতে আমরা বাধ্য নহি। তিনি যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, তখন তাঁহার কথা শুনিব। নাম শুনিয়া ভয় পাওয়া বৈজ্ঞানিকের রীতি নহে।

বলা বাহুল্য, এইরূপ উত্তর দেওয়া যায় বটে, কিন্তু মনের ভিতর গোল থাকিয়া যায়। কথাটা যদি নিতান্তই অমূলক হইবে, তবে ওয়ালাশ মানেন কেন? আর কেহ নহে,—যে-সে নহে,—ওয়ালাশ কেন মানেন?

বড় কঠিন সমস্যা। হিউম নাকি বলিয়া গিয়াছেন, অতিপ্রাকৃত,—যাহার ইংরাজি নাম মিরাক্‌ল,—তাহা ঘটিতেই পারে না। টিণ্ডাল না কি বলিয়াছেন, জগতে মিরাক্‌লের স্থান নাই। এখন কোন্ পথে যাই?

থিয়সফিষ্ট বন্ধুগণকে খুশী করিতে পারিব না জানি, তথাপি একবার বিচার-সমুদ্রে অবগাহন করা যাক।

ইংরাজী মিরাক্‌ল শব্দের অর্থ কি ঠিক জানি না; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ জানি। প্রাকৃত অর্থে যাহা প্রকৃতির অন্তর্গত, যাহা প্রকৃতিতে ঘটে; অতিপ্রাকৃত অর্থে প্রকৃ-

তিকে যাহা অতিক্রম করে, যাহা প্রকৃতির বাহিরে।

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই প্রকৃতির অন্তর্গত—তা সে যতই অদ্ভুত হউক না কেন। অদ্ভুত হইলেও তাহা যখন ঘটিতেছে, তখন তাহা প্রাকৃত; তাহা অতিপ্রাকৃত নহে। বাইবেলে গল্প আছে, জোশুয়ার আদেশে সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়াছিল। যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুর পর অনেককে দেখা দিয়াছিলেন। ঐ গল্প হয় সত্য, নয় মিথ্যা। হয় উহা ঘটিয়াছিল নয় ঘটে নাই। যদি ঘটিয়া থাকে—তবে উহা প্রাকৃত—অতিপ্রাকৃত নহে—অত্যদ্ভুত হইলেও অতিপ্রাকৃত নহে। যদি না ঘটিয়া থাকে ত কথাই নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন প্রাকৃত, তখন অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ। কাজেই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস করায় প্রয়োজন নাই।

এইরূপে ভাষাগত বা ব্যাকরণগত তর্ক তুলিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করা চলে। কিন্তু তাহাতে আসল কথার মীমাংসা হয় না। আসল কথা এই' জোশুয়ার আদেশে সূর্য্যের গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না? যীশু খ্রীষ্টের প্রেতমূর্ত্তি লোকে দেখিয়াছিল কি না?

কেহ কেহ বলিবেন, না, মানিব না। ঐসকল ব্যাপার অসম্ভব; উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ; যাহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা ঘটিতে পারে না। টিণ্ডাল হয়ত ঐরূপ বলিতেন।

ভাল; কিন্তু উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা জানিলে কিরূপে? প্রকৃতির নিয়ম কি? হয়ত বলিবে, ঐ ব্যাপার অতি অদ্ভুত, অতি নূতন; বাইবেলের গল্পে ছাড়া এরূপ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, শোনে নাই। উহা অতি অদ্ভুত, অতি অসাধারণ, অতি নূতন,—কাজেই উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।

এরূপ বলিতে পার না। এই কয়েক বৎসর মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্যা কত অদ্ভুত নূতন কাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছে। বায়ুমধ্যে আর্গন ক্রিপ্‌টন প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত নূতন পদার্থ বাহির হইল। কত কি রকম অদ্ভুত আলো বাহির হইল, তাহা কাঠ-পাথর মানে না, তাহার ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়;—এই সকল অত্যদ্ভুত, অতি নূতন, স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারে বিশ্বাস কর, কেন বাইবেলের গল্পে বিশ্বাস করিবে না? ইহার উত্তর নাই। নূতন বলিয়া, অদ্ভুত বলিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া অবিশ্বাস করিবার যো নাই। অজ্ঞাতপূর্ব্ব হইলেই বা অদ্ভুত হইলেই প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ হয় না।

তার চেয়েও সূক্ষ্ম তর্ক আছে। প্রকৃতির নিয়ম কি? প্রকৃতিতে যাহা ঘটে, তাহা লইয়াই ত প্রকৃতির নিয়ম। যাহা ঘটে, তাহা নিয়মবিরুদ্ধ হইতেই পারে না। আমি বলিতেছি, সূর্য্যের গতিরোধ যখন ঘটিয়াছিল, তখন উহা নিয়মসঙ্গত। তুমি যদি বল, উহা নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা হইলে যাহা বিচারের বিষয়, যাহা বিরোধস্থল, যাহাকে অসম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগেই অসম্ভব ধরিয়া লইতেছ। এ কিরূপ যুক্তি? তর্কশাস্ত্রে এরূপ যুক্তি টিকে না। তুমি হয়ত বলিবে, চিরকাল ধরিয়া মানুষে যখন সূর্য্যকে গতিশীল দেখিয়া আসিতেছে, তখন সূর্য্যের অবিরাম গমনই নিয়ম; এত সহস্র বৎসরের মধ্যে কেবল একবার মাত্র গতিরোধ নিয়মবিরুদ্ধ।

বিখ্যাত ব্যাবেজ সাহেব ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ আঁক-কষা যন্ত্রের

উদ্ভাবন করেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে সেই যন্ত্র আঁক করিয়া উত্তর বাহির করিয়া দিতে পারে। একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, দুই, তিন, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পর-পর সংখ্যা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। এগার হাজার সাত-শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। তুমি এগার হাজার সাত-শ তেইশের অপেক্ষায় বসিয়া আছ, এমন সময়ে অকস্মাৎ বাহির হইল তেত্রিশ হাজার পাঁচ। তার পর আবার পূর্ব্বের নিয়মমত যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যন্ত্রের পক্ষে মিরাকল বটে, তবে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ঐ সময়ে এই সংখ্যা বাহির না হইয়া ঐ সংখ্যাই বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির নির্ম্মাতা অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারেন। যে জানে না, সে যন্ত্র বিকল হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে পারে।

এইরূপ জগদ্‌যন্ত্র সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। সূর্য্য দিনের পর দিন যথানিয়মে উঠিতেছেন ও আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন অকস্মাৎ যদি থামিয়া যান, তাহা হইলে জগদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। যিনি যন্ত্রের নির্ম্মাতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্য চলিতে চলিতে সহসা এক-এক বার থামিবেন, যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরূপ আছে।

বস্তুতঃ ব্যাবেজ সাহেবের আপত্তির উত্তর নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, ঐটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যাভিচার নাই বা হইতে পারে না, এরূপ নির্দ্দেশ অন্যায়, অসঙ্গত, অসমীচীন ও অবৈজ্ঞানিক। এরূপ দুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমান্‌কে সাজে না।

মাধ্যাকর্ষণের সার্ব্বভৌমিকত্ব, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা প্রভৃতি কয়েকটি ঘোরতর প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বড়ই বাবদূকতা প্রদর্শন করিতেন। আজিকালি অনেকে সাবধান হইয়া কথা কহেন। যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার সীমা ছাড়াইয়া কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। যে কালটুকু ও যে দেশটুকু ব্যাপিয়া আমরা ঐ সকল নিয়মের অস্তিত্ব দেখি, উহারা ততটুকুর মধ্যেই ঠিক। তাহার অধিক আমরা বলিতে পারিব না। ঐ সকল নিয়মের ব্যাভিচার অকল্পনীয় নহে, অসম্ভবও নহে। হয়ত কিছু দিন পরে শুনিতে পাইব, অমুক নক্ষত্রমধ্যে জড়ের নূতন সৃষ্টি ঘটিতেছে, শক্তির ধ্বংস ঘটিতেছে; তাহাতে বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু যদি ঐরূপই ঘটে, তাহার অপলাপ করিতে পারিব না। প্রকৃতিতে যাহা ঘটিবে, তাহাকেই প্রাকৃত, প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চলিবে না। শক্তিকে অনশ্বর জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম ও কত বক্তৃতা করিয়াছি; উহাকে স্থলবিশেষে নশ্বর দেখিলে দুঃখিত হইব, কিন্তু দুঃখই সার হইবে। যাহা যেখানে নশ্বর, তাহা আমার খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে না। তাই যদি ব্যাবেজের কলের মত সূর্য্য লাখ বৎসর অন্তর একবার করিয়া কোন কারণে থামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। অসম্ভব বলিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে উড়াইতে পারিব না।

কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব সামুদ্রিক জীব যদি মাঝে মাঝে জাহাজের নিকট ভাসিয়া দেখা দেয়, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হয় কি? তবে মাঝে মাঝে যদি কোন নূতন

ধরণের জীব তাহার ঈথরীয় স্পর্শাতীত শরীর লইয়া আসিয়া দেখা দেয় বা ভয় দেখায় বা নাকি সুরে কথা কয়, তাহাতেই বা প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায়? কখনই না; প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, অতএব ইহা অসম্ভব,—এটা কোন কাজের কথাই নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম কি, তাহাই যখন পূরা সাহসে বলিতে পারি না, তখন ঐ উক্তি হঠোক্তি মাত্র। প্রকৃতির এক দেশের সহিত আমার পরিচয় লেনাদেনা কারবার রহিয়াছে; কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা আসিয়া হঠাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিবার কাহারও অধিকার নাই। তবে কি আজ হইতে ভূত মানিব? বাইবেলের যত অদ্ভুত গল্পে বিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তর হক্সলি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। জগতে একেবারে অসম্ভব কিছুই নাই; সূর্য্যের গতিরোধ হইতে ভূতের উৎপাত পর্য্যন্ত কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। তেমনই গুলিখোরের সভায় যত গল্পের সৃষ্টি হয়, তাহারও কোনটা হয়ত অসম্ভব নহে। তথাপি আমরা গুলিখোরের সকল গল্পে বিশ্বাস কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। ঘটনা সম্ভবপর হইলেই সত্য হয় না। সত্যতার প্রমাণ আবশ্যক হয়। বাইবেলের গল্পের যদি যথোচিত প্রমাণ থাকে, তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রমাণ কিন্তু যথোচিত হওয়া আবশ্যক। ঐ যথোচিত কথাটাতেই যত গোল। সর্ব্বসাধারণে যে প্রমাণে সন্তুষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও মতভেদ ঘটে। কতটুকু প্রমাণ হইলে সত্যতায় বিশ্বাস করা যাইবে, এ বিষয়ে তর্কশাস্ত্র নীরব। ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবার যো নাই। চোখে ভুল দেখে। কানে ভুল শোনে। বুদ্ধি বিকৃত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যচরিত্র দুর্ব্বোধ। কাহার মনে কি আছে, বলা অসাধ্য। ওয়ালাশের মত মুনির মতিভ্রম কি হইতে পারে না? সাক্ষীর কথায়—তিনি যতবড় সাক্ষীই হউন,—সাক্ষীর কথায় সর্ব্বদা নির্ভর করিলে একবার যদি ঠকিতে হয়, তাহাতে বিস্ময় কি?

মোটের উপর কথা এই, কতটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যক্তিভেদে আদর্শভেদ রহিয়াছে। সকলের আদর্শ সমান নহে; সমান হইবারও উপায় নাই। কাজেই যে কথায় তুমি অবলীলাক্রমে বিশ্বাস কর, আমি তাহাতে আদৌ আস্থা করি না। পরস্পর গালিগালাজ করিয়া শান্তিভঙ্গ করি মাত্র। ফল কিছু হয় না।

বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের একটা অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ আমরা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু তোমরা ধীরভাবে প্রমাণ গ্রহণ করিতেই অসম্মত; তোমরা গোড়াতেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতারক অথবা অন্ধ প্রতারিত বলিয়া ধ্রুব সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। আমাদের প্রমাণ না দেখিয়াই না জানিয়াই তোমরা রায় দিতেছ, এটা নিতান্ত অশাস্ত্রীয় বিচার।

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাফাই এই যে, আমরা বার বার প্রমাণ শুনিয়া ও সাক্ষ্য শুনিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আর ও মিছা অভিনয় ভাল লাগে না। আমাদের অনেক

কাজ আছে ; আর পুনঃ পুনঃ সময় নষ্ট করিয়া ঠকিতে আমরা প্রস্তুত নহি। সাফাই নিতান্ত ফেলিবার নহে। এত বার বৈজ্ঞানিকদিগকে ঠকিতে হইয়াছে যে, তাঁহারা পুনরায় ঠকিতে কুণ্ঠিত হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া উচিত হয় না। তবে তাঁহারা প্রতিপক্ষকে একেবারে না চটাইয়া এইরূপ জবাব দিলেই বোধ করি সঙ্গত হয়। বন্ধু, মনুষ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, জীবনও অচিরস্থায়ী ; এক জনেই যে জগতের সকল তথ্য বাহির করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। আমার কাজ আমি করিতেছি ; তোমার কাজ তুমি কর। আমরা উভয়েই প্রকৃতির আঁধার গুহামধ্যে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত আছি। যে যাহা আপন চেষ্টায় পারে, সে তাহা করুক। তুমি যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য হইতে পারে। তোমাকে আমি মিথ্যাবাদী বলিতেছি না ; তবে বলিতেছি, তোমার সংগৃহীত প্রমাণ জনসমাজে উপস্থিত কর ; আরও নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাক ; যদি তোমার আবিষ্কৃত সংবাদ সত্য হয়, এক দিন না এক দিন তাহা গৃহীত হইবেই। সত্যেরই জয় হইবে। তবে ভিক্ষা এই, নিতান্ত অধীর হইও না,—সত্যেরই জয় হয় বটে, কিন্তু যত শীঘ্র হওয়া উচিত, তাহা হয় না ;—কি করিবে, জগতের বন্দোবস্তটাই এইরূপ। আর ভিক্ষা,—আমি আমার নিজের কাজে নিতান্ত ব্যাপৃত থাকায় নিতান্ত অবকাশের অভাবে যদি তোমার নূতন আবিষ্কারে মনোযোগ দিবার অবকাশ না পাই, আমাকে গালি দিও না।

আসল কথাটা এই, জগতে সময়ে সময়ে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে, যাহা আমাদের পরিচিত জগৎ-প্রণালীর সঙ্গে সমঞ্জস হয় না ; উহার সহিত ঠিক খাপ খায় না। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ খাপছাড়া ঘটনার সাক্ষাৎকার লাভ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা দিন দিন যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন, তাহার অধিকাংশই বোধ করি খাপছাড়া। লেনার্ডের রন্টগেনের ও বেকেরেলের আবিষ্কৃত নূতন আলোক-রশ্মিগুলি এইরূপ খাপছাড়া ; আমাদের চিরপরিচিত আলোকরশ্মির সহিত উহাদের মিল নাই ; উহারা কিরূপ, আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। সেইরূপ আর্গন ক্রিপ্‌টনাদি বায়ুগুলিও কতকটা খাপছাড়া ; আমাদের চিরপরিচিত পদার্থ-সঙ্ঘের মধ্যে উহারা যে কোথায় স্থান পাইবে, তজ্জন্য রাসায়নিক পণ্ডিতেরা আকুল হইয়া আছেন। এইরূপ খাপছাড়া ব্যাপার নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতেছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকের এতটা বাহাদুরি ; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিতে পান, ইহাতেই তাঁহার এতটা দর্প। অথচ সেই বৈজ্ঞানিকেরাই অবৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত একটা নূতন তথ্যের সংবাদ পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহসা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের হেতু হয়। আপাততঃ ইহা একটা সমস্যা বলিয়া ঠেকে। কিন্তু একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা বুঝা যায়। খাপছাড়া নূতন তথ্য লইয়া বৈজ্ঞানিকের কারবার বটে ; কিন্তু যতক্ষণ তিনি খাপছাড়াকে খাপে পুরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমঞ্জসকে সমঞ্জস করিতে না পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নূতন সত্যকে পুরাতন পূর্ব্বপরিচিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া, তাহার সহিত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া, তাহার কোঠায় না

ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। চেষ্টার বলে ও বুদ্ধির বলে তিনি কালে সেই সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন; তখন তাহা আর অসমঞ্জস খাপছাড়া থাকে না। বিজ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসই তাহাই; যাহা এক কালে খাপছাড়া ছিল, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে। যাহা ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ দু-দিনের জন্য প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া বিভীষিকা দেখাইত, তাহা সৌরজগতের পরিচিত নিয়মবদ্ধ জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। এইরূপে অসম্বন্ধ অসমঞ্জস জগতে সামঞ্জস্যের ও সম্বন্ধের পুনঃ পুনঃ আবিষ্কারের সমর্থ হইয়া বৈজ্ঞানিকের সেই সামঞ্জস্যের প্রতি একটা মজ্জাগত প্রীতি জন্মিয়া গিয়াছে। তখন যদি সহসা কেহ একটা নূতন সংবাদ আনিয়া দেয়, যে সংবাদ তাঁহার পরিচিত জগৎপ্রণালীর সঙ্গে মিলে বা তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে, কখন তাঁহার মনে একটা ব্যাকুলতা আসে। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ উৎকট পরিশ্রমে যে সৌধখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে, সেই ভয়ে কতকটা ব্যাকুল হন; সেই সৌধের কোন পরিচিত প্রকোষ্ঠমধ্যে এই নূতন জিনিষটাকে স্থান দিতে না পারায় তাঁহার সামঞ্জস্যবুদ্ধিতে, তাঁহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। এই নূতন জিনিষটাকে কতকটা সংশয়ের চোখে, কতকটা ভয়ের চোখে তিনি দেখেন এবং যদি কোনরূপে উহার অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে যেন হাঁফ ছাড়িবার অবসর পান। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জাতিগত ভেদ আছে, তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক মানুষ ও সাধারণ মানুষ বস্তুই এক শ্রেণীর মানুষ; জগদযন্ত্র যদি একেবারে এলোমেলো শৃঙ্খলারহিত একটা গণ্ডগোল মাত্র হইত, তাহা হইলে সাধারণ মানুষেরও জীবনযাত্রা সুকর হইত না। জগদ্যন্ত্রে বেশ একটা শৃঙ্খলা দেখা যায়, সেই জন্যই মনুষ্যমাত্রের জীবনধারণ সম্ভব হইয়াছে। ভাত খাইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়; হঠাৎ যদি এই নিয়মটা বদলাইয়া যায়, এবং যত খাবে, তত ক্ষুধা বাড়িবে, এইরূপই যদি নূতন বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধি দুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতিপ্রাকৃতের প্রতি বা মিরাকলের প্রতি যাঁহার যত ভক্তি থাকুক, জগদ্যন্ত্রে যদি কোনরূপ শৃঙ্খলা একেবারেই না থাকিত, তাহা হইলে কাহাকেও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে হইত না। কাজেই কতকটা সামঞ্জস্য ও কতকটা শৃঙ্খলা মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই প্রীতিকর না হইলে চলে না। সামঞ্জস্যের প্রতি শৃঙ্খলার প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই কতকটা আন্তরিক অনুরাগ রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ পশুর উপরে; রহিয়াছে বলিয়াই সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষের উপরে। মনুষ্য মাত্রেই ন্যূনাধিক মাত্রায় বৈজ্ঞানিক।

ন্যূনাধিক মাত্রায়; কেন না, সামঞ্জস্যে প্রীতি সকলের পক্ষে সমান নহে; সকলের জগৎ ঠিক সমান মাত্রায় সমঞ্জস নহে। ব্যবহারিক হিসাব ছাড়িয়া একটু পরমার্থের হিসাবে দেখিলে বুঝিতে হয়, আমরা আপন আপন জগৎকে আপনার মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষ জগৎকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। বস্তুতই বলা চলে না। এই প্রত্যয়গুলি মানসিক পদার্থ; প্রত্যেক

ব্যক্তি উহাদিগকে নানা ভাবে সাজাইয়া আপন আপন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লয়; সকলের প্রত্যয় ঠিক সমান নহে; সেই জন্য সকলের জগৎ ঠিক একরকম নহে; প্রায় একরকম; কিন্তু ঠিক একরকম নহে।

দর্শনশাস্ত্র হইতে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটা শব্দ গ্রহণ করিলে বুঝাইবার কতকটা সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনার তিন অবস্থা; জাগরণের স্বপ্নের ও সুষুপ্তির অবস্থা। জাগরণের অবস্থায় জগৎ সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, সমঞ্জস; স্বপ্নাবস্থায় জগৎ শৃঙ্খলাশূন্য, অসমঞ্জস, এলোমেলা;—তবে যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা থাকে, ততক্ষণ উহা সুশৃঙ্খল বলিয়াই বোধ হয়। আর সুষুপ্তির অবস্থায় জগৎ প্রায় নাস্তিত্বে লীন হইয়া যায়। অবস্থা এই তিনটা; কিন্তু চেতনা যুগপৎ এই তিন অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। চেতনা পূর্ণ জাগ্রত বা পূর্ণ স্বপ্নাবস্থ বা পূর্ণ সুষুপ্ত কোন সময়ে থাকে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। জাগরণে স্বপ্নে ও সুষুপ্তিতে মিল'ইয়া মিশাইয়া চেতনার প্রকাশ। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার কিয়দংশ স্বপ্ন দেখে ও কিয়দংশ স্বপ্নহীন নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে। আজকাল subliminal self বা subliminal consciousness নামে একটা কথা শুনা যায়। প্রেততাত্ত্বিকেরা ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার করেন, এবং উহার দ্বারা নানাবিধ মানসিক বিকারাবস্থার ব্যাখ্যা করেন। ঐ শব্দের অর্থ এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। মানুষের চেতনার একটা মাত্র প্রকোষ্ঠ পূর্ণ চেতন বা পূর্ণ জাগ্রত; যাহা সেই প্রকোষ্ঠের অন্তর্ব্বর্ত্তী, তাহাই আমাদের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রত্যয়গুলি যাতায়াত করিতেছে, যতক্ষণ উহারা সব্‌লিমিনাল হইয়া সেই দ্বারের বাহিরে থাকে, ততক্ষণ উহারা প্রত্যয় হয় না; ততক্ষণ উহারা জ্ঞানের বিষয় হয় না সেই সব্‌লিমিনাল অবস্থাকে আমরা সুপ্ত অবস্থা বলিতে পারি, এবং যাহা প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়াছে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, যাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, মায়ার্স সাহেব যাহাকে supraliminal বলেন, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে পারি। সুপ্ত অবস্থার যে সকল প্রত্যয় জাগ্রত চেতনার প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া উকিঝুঁকি দেয়, কখন ক্ষণেকের মত দ্বারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার তখনই পলাইয়া যায়, তাহাদিগকে স্বপ্নাবস্থ মনে করিতে পারি। মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় বা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় ইংরাজীতে যাহাকে হিপ্‌নটিক অবস্থা বলে, সেই অবস্থায় এবং ওষধিমুগ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ নেশার অবস্থায়, এই আকস্মিক আগন্তুক অপরিচিত বা অল্পপরিচিত প্রত্যয়গুলি আসিয়া উকি মারে। তখন উহাদিগকে আমরা দেখি; কিন্তু জাগ্রদবস্থার পরিচিত পূর্ণপ্রকাশ প্রত্যয়গুলির সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। প্রেততাত্ত্বিকের ভাষায় আমাদের পূর্ণ জাগ্রদবস্থাতেও এই সব্‌লিমিনাল অর্থাৎ প্রকোষ্ঠের বহিঃস্থিত চেতনা কাজ করে ও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হই বা স্তম্ভিত হই এবং তাহাদের সহিত পূরা সাহসে কারবার চালাইতে সাহস করি না; তাহাদিগকে জীবনের কাজে লাগাইতে সাহস করি না। তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা ঠিক বুঝি না; কাজেই আশঙ্কার ও আতঙ্কের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করি বা প্রত্যাখান করিতে উদ্যত হই।

ব্যাখ্যার ভাষাটা যাহাই হউক, কিন্তু কথাটা বোধ হয় ঠিক। আমাদিগের চেতনায় সর্ব্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মিলিয়া যুগপৎ অবস্থান করিতেছে। তিনের তারতম্যা-

নুসারে চেতনার অবস্থাভেদ ঘটে। আমরা যাহাকে পূর্ণ জাগরণ বলি, তাহা পূর্ণ জাগরণ নহে—তাহাতে স্বপ্নের অভাব নাই এবং সে সময়ে চেতনার কিয়দংশ যে নিদ্রিত নাই· তাহাও বলা যায় না। যাহা জাগরণে দেখি, তাহা সুশৃঙ্খল যথাবিন্যস্ত; যাহা স্বপ্নে দেখি—তাহা শৃঙ্খলাহীন, বিপর্য্যস্ত, তাহা জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট পরিচিত প্রণালীর সহিত অসম্বদ্ধ। কিন্তু যাহা এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অসংযত, তাহাকে সংযমের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করাই চেতনার কাজ। অন্ততঃ তাহাতেই চেতনার অভিব্যক্তি। ইহা প্রেততাত্ত্বিকেরাও অস্বীকার করিবেন না। অস্বীকার করিলে তাঁহারা দেহমুক্ত প্রেতপুরুষের সহিত কার-বারের জন্য এত উৎসুক হইতেন না। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তার জন্য, চিঠি-চালা-চালির জন্য এত ব্যগ্র হইতেন না। তাহাদের ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেন না। এরূপ স্বপ্নকে জাগরণে লইয়া আসিবার জন্যই আমরা ব্যাকুল। স্বপ্নের জাগরণে পরিণতিতেই চেতনার স্ফূর্ত্তি ও সার্থকতা।

প্রশ্ন উঠে, কেন এমন হয়? জাগরণের অবস্থাতেই প্রত্যয়গুলি কেন এমন সংযত ও সুশৃঙ্খল, এবং স্বপ্নাবস্থাতেই বা কেন এমন অসংযত? ব্যাবহারিক হিসাবে ইহার উত্তর এই যে, জগৎপ্রণালীর অন্ততঃ খানিকটা সংযত নিয়মবদ্ধ সমঞ্জস না হইলে মানুষ ধরা-ধামে টিকিত না। নিম্নপর্য্যায়ের জীবে মানুষের মত জগৎকে সুনিয়ত দেখে না। মানুষ তাহা দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চ পর্য্যায়ের জীব, মানুষ জীবন-সংগ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, যত সুনিয়ত দেখে, সে তত জীবন-সংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষী; বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। স্বপ্ন জীবন-সংগ্রামে অনুকূল নহে: তাহার সাক্ষী পাগল। সে কেবলই স্বপ্ন দেখে—তাহার জগতে শৃঙ্খলা নাই—সে জীবন-সমরে অশক্ত। সেই জন্য বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবন-সংগ্রামে সুবিধার জন্য আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মবদ্ধ সংযত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; আপনার গঠিত জগতে, আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জাগ্রত; নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ। অনিয়মের প্রতি, বিশৃঙ্খলার প্রতি, বৈজ্ঞানিকের বিষদৃষ্টির মূল এইখানে। অতিপ্রাকৃত লইয়া কোলাহলের মূলও এইখানে।

আত্মার অবিনাশিতা

কতকগুলি কথা আছে, যাহা পুরাতন হইলেও চিরকাল নূতন থাকে। সেইরূপ একটি পুরাতন কথার অবতারণা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়ের গৌরব বিবেচনায় পাঠকের ধৈর্য্য-ভিক্ষায় অধিকার আছে।

মনুষ্যের আত্মা সেই পুরাতন বিষয় এবং এই পুরাতনের নূতনত্ব শীঘ্র অন্তর্হিত হইবে না।

আত্মা আছে কি না, আত্মা অবিনাশী কি না, ইহা লইয়া চির-চরিত পদ্ধতিক্রমে

যথেচ্ছ পরিমাণে বিতণ্ডা করা যাইতে পারে। আত্মার ধ্বংস সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বিতণ্ডার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মা অর্থে আমরা কি বুঝিব, সেটা পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রামের দোষ-গুণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, রাম অর্থে ভার্গব রাম, কি রঘুপতি রাম· রামা হাড়ি অথবা রামগিরি পর্ব্বত, সেটা উভয় পক্ষে স্থির করিয়া না লইলে বড়ই পণ্ডশ্রমবাহুল্য উপস্থিত হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মা শব্দে কি বুঝায়, স্থির করা কিছু দুষ্কর। কেননা, পাঁচ জনে পাঁচ রকম বুঝেন, এবং এক জনেও সর্ব্বদা সেই এক রকমই বুঝেন, তাহাও বলা যায় না। অনেকের মতে, বোধ করি সাধারণের মতে, আত্মা একরকম বায়বীয় পদার্থ, একরকম সূক্ষ্ম বায়ু অথবা ঈথর। প্রাচীন খ্রীষ্টান আচার্য্যেরা অনেক স্থলেই আত্মাকে এইরূপ সূক্ষ্ম জড় পদার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে যে সকল আত্মা নাকি সুরে কথা কহিয়া ভয় দেখাইত, একালে যে সকল আত্মা টেবিল উল্টাইয়া তামাসা করে, তাহারাও বোধ করি এই শ্রেণীর। এমনও শুনা যায়, সুষুপ্তিকালে আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় অপরের আত্মা আসিয়া দেখা দেয়, আঁধারে বা নির্জ্জনে পাইলে মৃতের আত্মা আসিয়া ভয় দেখায়। হাই তুলিলে আত্মা মুখকোটরের নির্গমপথ পাইয়া হাওয়া খাইতে যায়; কখন বা মাছির রূপ ধরিয়া মুখে প্রবেশ করে। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকগণের আত্মা দূর হইতে চিঠি পাঠায়। তাঁহাদের অনেকের সহিত বড় বড় আত্মার বা মহাত্মার পরিচয় ও সদ্ভাব আছে। এতাদৃশ আত্মার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। এইরূপ সাকার অথবা বাষ্পীয় অথবা ঈথার-নির্ম্মিত আত্মার নিকট আমরা উল্লেখ মাত্রে বিদায় লইতে পারি।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে একরূপ সূক্ষ্ম শরীরের উল্লেখ দেখা যায়। তাহা আত্মা নহে। দর্শনশাস্ত্রোক্ত আত্মাকে স্থূলশরীরী বা সূক্ষ্মশরীরী মনে করিবার কোনও কারণ নাই। "মনুষ্য যেমন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বসন গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে।" আত্মার অন্যান্য লক্ষণ ও বিবরণ ত্যাগ করিয়া এই উক্তিটিকে প্রাচীন ও অধুনাতন প্রচলিত বিশ্বাসের স্বরূপবর্ণনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই উক্তির ভিতরে কয়েকটি স্থূল কথা পাওয়া যায়। প্রথম, দেহ-ব্যতিরিক্ত ও দেহ-আশ্রয়ী আর একটা কিছু আছে, যাহা লইয়া জীবের পূর্ণতা; দ্বিতীয়, দেহের ধ্বংসে অথবা মরণরূপ বিকারে সেই পদার্থ দেহ হইতে পৃথক হয়। তৃতীয়, পরে সেই পদার্থ অন্য দেহ আশ্রয় করিতে পারে। এই দেহব্যতিরিক্ত ও দেহাশ্রয়ী পদার্থটি আত্মা; এবং এই আত্মার সম্বন্ধেই পূর্ব্বদেহের সহিত পরদেহের সম্বন্ধ। এক কথায়, আত্মা রহিয়া যায়; দেহ আত্মার পরিধেয় বসনের মত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

অস্তিত্ব, অবিনাশিত্ব ও দেহান্তরাশ্রয় (পুনর্জ্জন্মগ্রহণ), আত্মার এই তিনটি লক্ষণ এই উক্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা মনুষ্যদেহ ভিন্ন অন্য দেহও ধারণ করিতে পারে; সুতরাং মনুষ্যেতর জীবেও আত্মা বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

আত্মার নাশ নাই; তবে ইহা পুনরায় জন্মগ্রহণ অথবা দেহান্তরাশ্রয় হইতে কোনরূপ

নিষ্কৃতি লাভ করিতে কখন কখন সমর্থ হয়। তাহাকে নাশ বলা যায় না; তবে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ, এইরূপ কোন অভিধান দেওয়া যাইতে পারে। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিতগণমধ্যে মতভেদ আছে।

জীবনকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর আত্মা কখন স্বর্গ-নরক ভোগ করে ও কখন বা দেহান্তর গ্রহণ করে, আমাদের দেশে প্রচলিত বিশ্বাস এইরূপ।

খ্রীষ্টানাদিও আত্মার অস্তিত্ব ও অনশ্বরত্ব স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা আত্মার দেহান্তরাশ্রয় বা পুনর্জ্জন্মগ্রহণটা বোধ করি স্বীকার করিবেন না, এবং মনুষ্য ভিন্ন ইতর জীবকে আত্মার অধিকারী করিতে চাহিবেন না।

ইঁহাদের মতে আত্মা মৃত্যুর পর নিরাশ্রয় ভাবে কোনও না কোনও রূপে শেষ বিচারদিনের প্রতীক্ষায় রহে। বিচারশেষে কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে প্রেরিত হইয়া সুখদুঃখভাগী হইতে পারে। মোক্ষ বা নির্ব্বাণ শুনিলে ইঁহারা রাগিয়া উঠেন এবং তাহাকে ধ্বংসেরই রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

যাহাই হউক, হিন্দু ও অহিন্দু উভয়ের মধ্যে মোট কথা কয়েকটাতে মিল আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা কিছু আছে; সেটা দেহান্তেও রহে; এবং তাহার অন্য পরিচয় না জানিলেও এইটুকু তাহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, সুখদুঃখভোগটা তাহারই নিজস্ব অধিকার।

আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক। বিচারে যুক্তিমার্গই আমাদের আশ্রয়। সম্প্রদায়বিশেষের নিকট, বিশেষতঃ খ্রীষ্টানদের নিকট একটা শাস্ত্রবহির্ভূত যুক্তির পন্থা শুনিতে পাওয়া যায়, এ স্থলে তাহার এক বার উল্লেখ আবশ্যক।

ইঁহারা এইরূপে বলেন, দেহ ব্যতীত মানুষের আর কিছুই নাই, এ বড় ভীষণ কল্পনা। দেহ ফুরাইলে সব ফুরাইল মনে করিলে দুঃখের দুঃসহতা ও মরণের বিভীষিকা আরও দুঃসহ ও ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের পক্ষে সান্ত্বনা আর কিছুই থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি বলে, দেহ ছাড়া আত্মা নাই, সে মনুষ্যজাতির শত্রু। আবার আত্মা অস্বীকার করিলে পাপের নিষেধক ও পুণ্যের উদ্বোধক বিশেষ কিছু থাকে না। একরকমে দিন কয়টা কাটাইতে পারিলেই যেখানে ফাঁকি দেওয়া চলে, সেখানে পাপ-পুণ্য লইয়া হাঙ্গামা চলে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে পামর ও পাপিষ্ঠ ও সমাজদ্রোহী। মরিয়া গেলে সব ফুরাইবে, মানুষের মন কি তাহা চায়? তোমার অন্তরাত্মা কি বলে?

এইরূপ বিচারপ্রণালী যুক্তির অপলাপ মাত্র। মৃত্যুর পর সব ফুরাইবে, স্বীকার করিতে তোমার কষ্ট হইতে পারে; এবং সেরূপ স্বীকারে সমাজের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিন্তু এইরূপ যুক্তিদ্বারা সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা ঘোরতর দুঃসাহসের পরিচয়। সত্য কাহারও ইষ্টানিষ্টের অপেক্ষা রাখে না।

যাঁহারা আপন মত কোন না কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ যুক্তি অবলম্বন করিলেই পারেন। বলিলেই হইল, আমার মত অবলম্বন কর, নচেৎ লগুড়। এই শেষোক্ত আশুফলপ্রদ বিচারপ্রণালীও সে সময়ক্রমে ব্যবহৃত না হইয়াছে, এমন নহে। ইতিহাস সাক্ষী।

আমরা অনুরূপ বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিব, যাহা সুস্থ মানব-বুদ্ধি বিশুদ্ধ বিচার-প্রণালী বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

এই শাস্ত্রসম্মত প্রণালী মতে আমরা কতিপয় স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও কতিপয় সংজ্ঞা লইয়া বিচার আরম্ভ করি। স্বতঃসিদ্ধ সত্য অর্থে যে সকল সত্য সকলেই মানিয়া লয়েন, কাহারও মানিতে আপত্তি নাই। সেই সকল সত্য প্রমাণনিরপেক্ষ বা প্রমাণাতীত; তাহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেন না, সকলেই তাহার সত্যভাব নির্ব্বিবাদে স্বীকার করেন; প্রমাণাতীত, কেন না, তাহা আমরা সপ্রমাণ করিবার উপায় দেখি না, সেগুলি স্বীকার করিয়া না লইলে বিচারই অসাধ্য হয়। এই সকল স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকলেই স্বীকার করেন; অন্ততঃ সুস্থ মানুষ মাত্রেই মানিয়া লয়েন; না মানিলে জীবনযাত্রা অসাধ্য হয়; পদে পদে ঠেকিতে হয়। যে ব্যক্তি মানিতে চাহে না, তাহাকে আমরা অসুস্থ বলিয়া, মানসিক বিকারগ্রস্ত বলিয়া, পাগল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করি।

আর সংজ্ঞা অর্থে নাম। বিচারের আরম্ভে যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম স্থির করিয়া লইতে হয়। নতুবা আমার কথা অপরকে বুঝান চলে না। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের স্বীকারে সকলেই বাধ্য; আমার নিকট যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তোমার নিকটও তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সংজ্ঞাটা ইচ্ছামত প্রদত্ত। আমি যে জিনিষের যে সংজ্ঞা বা যে আখ্যা দিলাম, তুমি সে জিনিষের সে সংজ্ঞা বা আখ্যা দিতে পার বা না পার; এ বিষয়ে আমি তোমাকে বাধ্য করিতে পারি না। তবে কি না, প্রত্যেক ব্যক্তি একই জিনিষের জন্য যদি আপন ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে মানুষে মানুষে কথাবার্ত্তা ও ভাববিনিময় চলে না: বিচার ত চলেই না। সেই জন্য নাম লইয়া বিবাদ না করিয়া সকলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা মানিয়া লইলে সকলেরই সুবিধা হয়।

অনেক সময়ে সংজ্ঞায় ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যে একটু গোল উপস্থিত হয়। অনেক সময় আমরা যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা সংজ্ঞা মাত্র। একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। ইউক্লিডের জ্যামিতিশাস্ত্রে একটি স্বতঃসিদ্ধের উল্লেখ আছে; অংশের অপেক্ষা পূর্ণ বৃহৎ। আপাততঃ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বোধ হয়; অংশের অপেক্ষা পূর্ণ বড় হইবেই: কে ইহা অস্বীকার করিবে? যে অস্বীকার করিবে, সে পাগল। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে; ইহা সংজ্ঞা মাত্র। পূর্ণ অপেক্ষা যাহা ছোট, তাহাকেই আমরা অংশ এই নাম বা এই সংজ্ঞা দিয়া থাকি। অংশের অপেক্ষা যাহা বড়, তাহাকেই পূর্ণ আখ্যা দিয়া থাকি। এই নাম দেওয়া আমার ইচ্ছাধীন। ইহা একটা ভাষার খেয়াল মাত্র। যদি গাছকেই আমরা অংশ নাম দিতাম, আর ডালকে পূর্ণ আখ্যা দিতাম, তাহা হইলে পূর্ণ অংশের চেয়ে ছোট হইয়া যাইত। কিন্তু আমরা বড় গাছকেই পূর্ণ বলিয়া থাকি, ছোট ডালকেই তাহার অংশ বলি। কেন বলি? একটা কিছু ত বলিতেই হইবে; পূর্ব্বপিতামহেরা, যাঁহারা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন বা ভাষা প্রথম ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা

এরূপ নাম দিয়াছিলেন ; তাঁহাদের প্রদত্ত নাম, তাঁহাদের প্রদত্ত সংজ্ঞা, তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা আমরা সকলে নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, এই মাত্র। অতএব পূর্ণ অংশের চেয়ে বড়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে ; ইহা পূর্ণ ও অংশ এই দুইটি শব্দের সর্ব্বজনস্বীকৃত অর্থ হইতেই স্বীকার্য্য। হাত-পা শরীরের অংশ, এই বাক্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে ; ইহা শরীরের ইচ্ছাদত্ত সংজ্ঞা হইতে আসে। হাত-পা, নাক-মুখ প্রভৃতির যে সমষ্টি, তাহাকেই যখন আমরা শরীর আখ্যা দিয়াছি, তখন হাত-পা প্রভৃতি শরীরের অংশ ত হইবেই। শরীরের এই সংজ্ঞা আমরা সকলেই ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কাজেই ইহা সংজ্ঞা মাত্র ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ নিরপেক্ষ সত্য নহে।

কোন্‌টা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আর কোন্‌টা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সংজ্ঞা, ইহা স্থির করিয়া না লইলে দার্শনিক বিচারে পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা থাকে। সেই জন্য এখানে একটা ভূমিকার প্রয়োজন হইল।

সম্মুখে গাছ দেখিতেছি ; দেখিতেছি বলিয়াই এখানে গাছ রহিয়াছে, এ কথা পুরা সাহসের সহিত বলা যায় না। কেন না, মরীচিকা, প্রতিবিম্ব, স্বপ্ন মানসিক অস্বাস্থ্য বা বিকার, এই সকলে অনেক সময় গাছের ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে, অথচ সেখানে গাছ নাই। আমার সকল ইন্দ্রিয় যদি একযোগে সাক্ষ্য দেয় যে, এখানে গাছ আছে, তাহাতেও গাছের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অন্য পাঁচ জনে সাক্ষ্য দিলেও প্রতিপন্ন হয় কি না, বলা কঠিন। তবে আমি গাছ দেখিতেছি, একথা সকলসময়ে সকল অবস্থাতেই, বোধ করি সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে। আফিমের নেশায় আমি যখন বিড়ালকে হাতী মনে করি, তখন হাতীর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু আমার যে হাতী-বুদ্ধি জন্মিতেছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। স্বপ্নই হউক, আর বিকারই হউক, আমার যে ঐরূপ বোধ হইতেছে, ইহা একটা সত্য কথা ; ঐ বোধটুকু সত্য, উহাতে কাহারও আপত্তি সম্ভবে না। এই বোধ বা অনুভূতি বা জ্ঞানকে সকলেই সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে আপত্তি করিবেন না। ঐ হাতী আছে, বা ঐ গাছ আছে, ইহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু আমার ঐরূপ প্রতীতি হইতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

গাছ দেখিতেছি, ইহা ঠিক। কিন্তু ইহার ভিতরেও একটু গোল আছে। একটা কিছু বিশেষ রকম বোধ জন্মিতেছে এবং সেই বোধটির আমি নাম দিয়াছি 'গাছ দেখা' এই পর্য্যন্ত ঠিক। প্রত্যয় একটা জন্মিতেছে, এইটুকু স্বতঃসিদ্ধ ; গাছ দেখাটা তাহার অর্থাৎ সেই প্রত্যয়ের সংজ্ঞা। একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে এবং সেই প্রত্যয়ের কতিপয় বিশিষ্ট লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি, যদ্দারা এই প্রতীতিকে অন্য প্রতীতি হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইতে পারি ; এই পর্য্যন্ত আমার বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতীতিই যে জন্মিতেছে, তাহার প্রমাণ কি ? সেই জ্ঞানের অস্তিত্বেরই প্রমাণ কি ? ইহার উত্তরে বলিব যে, ইহার প্রমাণ নাই ; স্বীকার করিতে চাও, ত এই মূল স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আর পাঁচটা কথা তুলিয়া তোমার সহিত কথাবার্ত্তা বিচার-বিতর্ক করিতে প্রস্তুত আছি। আর ইহা যদি অস্বীকার কর, তবে

এইখানেই নিরস্ত হইতে হইবে। যুক্তি অবলম্বনে শেষ সীমায় একটা মূল সত্যে পৌঁছিতে হইবেই: আপনার প্রত্যয়ের অস্তিত্ব সেই মূল সত্য। ইহা অস্বীকার করিলে আর কিছু থাকিবে না। অথচ সকলেই ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন। কোথাও বা ঠকিতে হয়, অধিকাংশ স্থলে ঠকিতে হয় না, তাহাতে কিছু যায় আসে না।

তবেই স্বীকার্য্য, সম্প্রতি একটা বিশেষ-লক্ষণ-লক্ষিত জ্ঞান জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা দিতে গিয়া আমি বলি,—'গাছ দেখিতেছি'। সেইরূপ আরও বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা-বিশিষ্ট বিবিধ জ্ঞান জন্মিতেছে। যথা, ঐ হাতী দেখিতেছি, ঐ বাড়ী দেখিতেছি, এই তোমাকে দেখিতেছি, ঐ শব্দ শুনিতেছি, এই গরম বুঝিতেছি, এই চলিতেছি, খাইতেছি ইত্যাদি। অপিচ, হাসিতেছি, কাঁদিতেছি, ভয়, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষুধা, শীত অনুভব করিতেছি। এইরূপ কতকগুলা নানারূপ জ্ঞান, বোধ, প্রতীতি, অনুভূতি জন্মিতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য।

আরও কিছু স্বীকার্য্য রহিয়াছে। কতকগুলি জ্ঞান ও অনুভূতি জন্মিতেছে, কেবল তাহাই নহে। এই জ্ঞানগুলির মধ্যে পরস্পর একটা সম্বন্ধের প্রতীতিও জন্মিতেছে। অথবা এমন আর একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে, যাহার সংজ্ঞা সেই সমুদয়ের মধ্যে সম্বন্ধানুভব।

এই সম্বন্ধ আবার নানাবিধ। বিবিধ জ্ঞানসমূহের বা প্রত্যয়সমূহের মধ্যে যে নানাবিধ সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা সাদৃশ্য, দার্শনিক ভাষায় সমানতা বা সামান্য। আর একটা সম্বন্ধের সংজ্ঞা ভেদ বা দর্শনের ভাষায় বিশেষ। সাদৃশ্য ও ভেদ অনুসারে সমুদয় প্রত্যয়গুলিকে সাজাইয়া ও চিনিয়া লওয়া হয়, এ কথাও স্বীকার্য্য। এই সাদৃশ্যবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দেখা, কতকগুলির সংজ্ঞা শোনা, কতকগুলির সংজ্ঞা ঘ্রাণ, কতকগুলির স্পর্শ। আবার দেখার মধ্যেও ঐ অনুসারে লাল দেখা, নীল দেখা, ছোট দেখা, বড় দেখা, গোল দেখা, চৌকোণা দেখা ইত্যাদি আছে। এইরূপ অন্যান্য জ্ঞান ও প্রত্যয়ের পক্ষেও। এইখানে এই কুকুর দেখিতেছি; ঐখানে ঐ গরু দেখিতেছি, এই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে, তাহার সংজ্ঞা দর্শন। একটা ভেদ আছে, যাহার কারণে একটার নাম কুকুর দেখা, আর একটার নাম গরু দেখা; একটার নাম এইখানে দেখা, আর একটার নাম ঐখানে দেখা। ফলে, আমার পাঁচ রকম প্রত্যয় যেমন আছে, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য সম্বন্ধের ও ভেদ সম্বন্ধের নিরূপণরূপ আর একটা প্রত্যয়ও আছে।

না থাকিলে কি হইত? যদি সকল জ্ঞানই একাকার দেখিতাম, যদি তাহাদের মধ্যে ভেদ কিছুই না বুঝিতাম, তাহা হইলে কি হইত? দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শঘ্রাণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ সব একাকার হইয়া, নীল পীত, শ্বেত কৃষ্ণ, আলো আঁধার, সব এক হইয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার অস্তিত্ব দাঁড়াইত। মনে কর, সুখ নাই দুঃখ নাই, শীত নাই গ্রীষ্ম নাই, স্পর্শ নাই শ্রবণ নাই, কেবল আঁধার আর আঁধার আর আঁধার, অথবা আলো আর আলো আর আলো, অথবা নীল আর নীল আর নীল—কেবলই নীল, অথবা পীত আর পীত আর পীত—কেবলই পীত। এইরূপ একাকার অস্তিত্বে ও

নাস্তিত্বে পার্থক্য করা আমাদের বুদ্ধিতে আসিত না। অর্থাৎ সকল জ্ঞান ও সকল প্রত্যয় একাকার হইলে আমার জ্ঞানরাশি হয়ত থাকিত, আমিও হয়ত থাকিতাম। কিন্তু আমার বা আমার জ্ঞানের অস্তিত্ব নিরূপণের উপায় কিছু থাকিত না। যদি কিছু থাকিত, তাহা আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধির, সুতরাং বর্ত্তমান বিচারপ্রণালীর অতীত হইত। ফলে এইরূপ অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব, একই রকমের কথা।

আবার মনে কর, জ্ঞানে জ্ঞানে কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেক অনুভূতিই অপর অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে বিসদৃশ। এক বার যাহা অনুভব হইল, তাহাকে আর দ্বিতীয় বার পাওয়া গেল না। প্রতীতিমধ্যে পরস্পর কোন মিল নাই, সুতরাং কাহাকেও চিনিয়া লইবার উপায় নাই। কাহারও অস্তিত্বের কোনরূপ পরিচয় দিবার যো নাই। এরূপ স্থলে সংজ্ঞামাত্র অসম্ভব হইত; পরিচয় মাত্র অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। এরূপ ক্ষেত্রেও অস্তিত্বে ও নাস্তিত্বে ভেদ করিবার শক্তি আমাদের থাকিত না।

এইখানে একটু সাবধান হইতে হইবে। পথ এমনই পিচ্ছিল যে, পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। গাছ দেখিতেছি, ইহা বলিলে একটা বিশিষ্ট-লক্ষণযুক্ত বোধের অস্তিত্বই প্রমাণ করে; বোধের কারণস্বরূপ কোন পদার্থের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন করে না। আর এইটুক প্রমাণ করে যে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে এইরূপ একটা বোধ জন্মিয়াছিল, যাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ও মিলাইয়া এই বর্ত্তমান বোধটাকেও তৎসদৃশ বলিয়া স্থির করিতেছি ও সেই বোধকে বর্ত্তমান বোধকে সজাতীয়রূপে অনুভব করিয়া নির্দ্দিষ্ট-লক্ষণযুক্ত স্থির করিয়া 'গাছ দেখা' এই নাম দিতেছি। আর একটু দেখা যাউক। 'গাছ দেখিতেছি' বলিলে যেমন সেই প্রত্যয় ছাড়া প্রত্যয়ের বাহিরে গাছনামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বতঃ প্রতিপন্ন হইল না, সেইরূপ জ্ঞানে জ্ঞনে বা প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে যে সাদৃশ্য দেখিতেছি বা ভেদ বোধ করিতেছি, তাহাতে আমার সেই সাদৃশ্য বুদ্ধিসংজ্ঞক বুদ্ধির ও ভেদবুদ্ধিসংজ্ঞক বুদ্ধিরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইল। বস্তুতঃই যে আমার বুদ্ধির বাহিরে প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে মিল আছে ও অনুভূতিতে অনুভূতিতে ভেদ আছে, তাহা প্রতিপন্ন হইল না। এইরূপ সাদৃশ্য আছে ও ভেদ আছে, ইহা বোধ করি ও মানিয়া লই এবং সেইরূপ মানিয়া লওয়াতেই প্রতীয়মান জগতের,—বাহ্য জগতের ও আন্তর্জগতের— অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। যদি এইরূপ বোধ না করিতাম, যদি আমার সকল প্রত্যয়ই একাকার বুঝিতাম, অথবা কোন প্রত্যয়ের সহিত অপর প্রত্যয়ের কোন মিল না দেখিতাম, তাহা হইলে কেই বা থাকিত কোথা? আমার বুদ্ধির বাহিরে একটা কিছু আছে এইরূপ কল্পনা করিলে সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিকই বুদ্ধির অতিরিক্ত বুদ্ধির স্বতন্ত্র হেতুস্বরূপ কিছু আছে, এ কথা জোর করিয়া বলিবার আমার কোন অধিকার নাই।

জ্ঞানসমূহের মধ্যে দুইটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এখানে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। সম্মুখে যে এই কুকুর দেখিতেছি, সেই কুকুরই আমার পার্শ্বে আসিল। সম্মুখে দেখিতেছি ও পার্শ্বে দেখিতেছি, এই দুইটি বিসদৃশ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এটাও কুকুর দেখা, ওটাও কুকুর দেখা; এবং এই কুকুর দেখায় ও ঐ কুকুর দেখায় অন্য কোন পার্থক্য অনুভব করিতেছি না। কেবল একটা মাত্র পার্থক্য অনুভব করিতেছি; সম্মুখে কুকুর দেখিবার সময় আর যাহা যাহা দেখিতেছি, পার্শ্বে দেখিবার সময় সেই সেই বস্তু

দেখিতেছি না। সেই পার্থক্যের সংজ্ঞা দিয়াছি স্থানগত বা দেশগত ভেদ। জ্ঞান দুইটি সর্ব্বাংশে অনুরূপ, কেবল এই একটা মাত্র ভেদবোধ জন্মিতেছে; এই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক; তাই দেশজ্ঞান তাহার সংজ্ঞা। তাই সম্মুখে পশ্চাতে, উত্তরে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে, দূরে সমীপে ইত্যাদি সংজ্ঞা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রত্যয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যেমন বর্ণবুদ্ধি, শ্রুতিবুদ্ধি, ঘ্রাণবুদ্ধি, এ সকলই আমার বুদ্ধি মাত্র, সেইরূপ এই দেশবুদ্ধিও সেই হিসাবে আমার বুদ্ধি মাত্র; বস্তুতঃই যে আমার বাহিরে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, ডাহিনে ও বামে, দেশ নামক একটা পদার্থ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। একখানা আরশি সম্মুখে ধরিলেই বুঝা যাইবে যে, দেশবুদ্ধি থাকিলেই দেশ থাকে না। আরশির পশ্চাতে বিস্তীর্ণ বিবিধ বস্তুসমন্বিত দেশ রহিয়াছে মনে হয়, কিন্তু কেবল মনে হয় মাত্র; উহা অস্তিত্বহীন। ভাস্বুরক সিংহের দেশী গল্প ও মাংসলোভী কুকুরের বিলাতী গল্প মনে কর।

দেশের পর কাল। এক্ষণে যে কুকুর এখানে দেখিতেছি, কল্য সেই কুকুর সেইখানেই দেখিয়াছিলাম। এ স্থলেও এই দুইটি কুকুরদর্শন নামক বোধের মধ্যে অন্য কোন ভেদ না দেখি, অন্ততঃ একটা ভেদ দেখিতেছি; সেই ভেদের একটা সংজ্ঞা আবশ্যক। সেই সংজ্ঞা কালগত ভেদ। প্রথম জ্ঞানটা আর আর যে যে জ্ঞানের সহকারে আসিয়াছিল, দ্বিতীয়টা ঠিক সেই সেই জ্ঞানের সহকারে আসে নাই। প্রথমবার কুকুর দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে রামকে দেখিয়াছিলাম, হরিকে দেখিয়াছিলাম, নবীনকে দেখিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বার কিন্তু গদাধরকে ও বনমালীকে দেখিতেছি। তখন সূর্য্য দেখিয়াছিলাম মাথার উপর; এখন সূর্য্য অস্তগত দেখিতেছি। এই যে ভেদ, ইহার নাম কালগত ভেদ। দেশবুদ্ধির ন্যায় কালবুদ্ধিও আমার বুদ্ধি মাত্র; বস্তুতঃই যে কাল নামক একটা কিছু বর্ত্তমান আছে, আমি যখন ছিলাম না, তখন কাল ছিল, আমি থাকিব না অথচ কাল থাকিবে, ইহা প্রতিপন্ন হইল না।

নানাবিধ বোধ আছে, পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছি। যথা—বর্ণবোধ, আকৃতিবোধ, শ্রুতিবোধ, স্বাদবোধ, ঘ্রাণবোধ। তেমনই দেশবোধ ও কালবোধ। এই শেষ দুইটিকে অন্যান্য বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র-প্রকৃতিক ও ভিন্নজাতীয় স্থির করিয়া একটা বিকট রহস্যের সৃষ্টি করিবার সম্যক্ কারণ দেখি না।

কত দূরে দাঁড়াইল, দেখা যাউক। কতকগুলি জ্ঞান আছে ও তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধ ও ভেদ-সম্বন্ধ এই দুই সংজ্ঞাবিশিষ্ট প্রতীতি আছে। এই পর্যন্ত স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য; অন্যথা বিচার চলে না ও কিছুই থাকে না। ইহার অধিক কোন বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকারে সম্প্রতি দরকার নাই। এই যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধের ও ভেদ-সম্বন্ধের প্রতীতি জন্মে, ইহা লইয়াই চেতনা; অথবা ইহার অপর সংজ্ঞাই জ্ঞানের প্রবাহ বা চেতনার ধারা। এই প্রতীতি আছে, তাই যাহাকে চেতনা বলি, তাহা আছে; এই প্রতীতি না থাকিলে জ্ঞান থাকিতে পারিত, কিন্তু সেই জ্ঞানের অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিতাম না, অর্থাৎ চেতনা থাকিত না। গাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তির অবস্থায় জ্ঞান আমাদের থাকিতে পারে, অথবা থাকিতে না পারে; কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও জ্ঞানের অস্তিত্ব তখন বুঝিতে পারি না অর্থাৎ তখন চেতনা থাকে না। যত ক্ষণ চেতনা থাকে, তত ক্ষণ জ্ঞানের

অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তত ক্ষণ বর্ত্তমান জ্ঞানকে আর পাঁচটা জ্ঞানের সদৃশ অথবা বিসদৃশ বলিয়া বুঝিয়া লই ; জ্ঞানসমূহের একটা ধারাবাহিকতা অনুভব করি। এবং এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, এই কোথাও সদৃশরূপে ও কোথাও বিসদৃশরূপে প্রতীয়মান এই জ্ঞানসমূহের যে সমষ্টি, যে ধারা ও পরম্পরা, তাহারই নাম অথবা সংজ্ঞাই 'আত্মা' অথবা 'আমি' ; তদ্ব্যতীত আর কোনরূপ স্বতন্ত্র আত্মার প্রমাণ নাই।

মনে কর, হাত পা মাথা বুক পেট ইত্যাদির সমষ্টিতে শরীর। হাতও শরীর নহে, পাও শরীর নহে, একাএক তাহারা সমস্ত শরীরের অঙ্গমাত্র। তবে সকলকে জড়াইয়া সকলের সমষ্টিতে শরীর। হাত পা হইতে পৃথক, মাথা পেট হইতে পৃথক ; শ্বাসযন্ত্র হৃৎপিণ্ড হইতে পৃথক ; অথচ উহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। একটার কাজ বন্ধ হইলে অনেক সময়ে অন্যের কাজ বন্ধ হয় ; একটার আঘাত লাগিলে অন্যে আঘাত পায় ; এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অবয়বসমষ্টিকে শরীর বলা যায়। সেইরূপ দৃষ্টিশ্রুতি স্পর্শঘ্রাণ দেশকাল রাগভয় ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি কতকগুলি বুদ্ধি ও অনুভূতি ও প্রতীতি জড়াইয়া যে সমষ্টি হয়, তাহা লইয়া আমার সমস্ত চেতনা। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা এমন সম্বন্ধ দেখিতে পাই, যাহাতে একটার সহিত আর একটার মিল আছে, একটা হইতে আর একটা বাহির হইয়াছে, একটা হইতে আর একটা উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। সাপ দেখিলাম, ভয় পাইলাম, পলায়নপর হইলাম, এ স্থলে এই তিনটার কালগত সম্বন্ধ এইরূপ যে, দৃষ্টি হইতে ভীতি, ভীতি হইতে পলায়ন-চেষ্টার উৎপত্তি। বিশেষতঃ যাহাকে স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা বলা যায়, তাহা পঞ্চাশটা অনুভূতিকে এরূপ দৃঢ়বন্ধনে জড়াইয়া রাখে যে, একটাকে ছাড়িয়া যেন আর একটার উৎপত্তি হয় না। জ্ঞানসমূহের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ বুঝি বলিয়াই, এইরূপ সম্বন্ধের বিষয়ে একটা জ্ঞান আছে বলিয়াই, সেই জ্ঞানের প্রবাহ ও চেতনার ধারার উল্লেখ করিতে পারিতেছি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি ও প্রত্যয় গুলি সেই প্রবাহমধ্যে এক একটি ঊর্ম্মি মাত্র বা কণিকা মাত্র। সংহতি দ্বারা আবদ্ধ বিন্দু বিন্দু জলকণার সমষ্টি যেমন জলস্রোত, পরস্পর গাঢ় সম্বন্ধে গ্রথিত ও আবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যকণার সমষ্টি করিয়া তেমনই চেতনার প্রবাহ। পরস্পারের যে সম্বন্ধ, তাহার নাম কার্য্যকারণসূত্রে সম্বন্ধ ; প্রত্যয়গুলির মধ্যে কতকগুলিকে এক সঙ্গে সহবর্ত্তী দেখি, কতকগুলিকে পর পর দেখি এবং একটা না থাকিলে আর একটা থাকে না, এইরূপ মনে করি। এই সহবর্ত্তী প্রত্যয়পরম্পরাই আত্মা, এরূপ বলিতে পারি। এই অর্থে আত্মা আছে, তাহা এই শ্রেণীর পণ্ডিতে স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া অন্য কোন অর্থে আত্মা থাকিতে পারে না, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায়।

প্রচলিত মত এই, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে। এই জ্ঞাতা যে, সেই আত্মা। শুধু জ্ঞানসমষ্টিকে আত্মা বলিলে চলিবে না ; জ্ঞানের অতিরিক্ত একটা স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করা চাই।

কিন্তু যে শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের কথা বলিলাম, তাঁহারা এই জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র

জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না। সেকালে ভগবান্ বুদ্ধ এই জ্ঞাতার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি বলিয়াছিলেন—এই জ্ঞাতার বা আত্মার অমূলক কল্পনাই সংসারে যাবতীয় দুঃখের নিদান। একালেও হিউম হইতে হক্সলি পর্য্যন্ত বড় বড় পণ্ডিতে আত্মার অস্তিত্ব মানেন না।

ইঁহারা প্রশ্ন করেন, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে, কে বলিল? আমাদের এইরূপ একটা সংস্কার বা ধারণা আছে বটে; কিন্তু সেই ধারণার সত্যতাকে যেখানে বিচারের বিষয় করিয়া নামাইতেছি, তখন তাহার অস্তিত্বের পক্ষে স্বাধীন প্রমাণ কি আছে? যাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গোড়ায় ধরিলে চলিবে না। জ্ঞাতা নাই বা থাকিল; জ্ঞাতার অপেক্ষা না করিয়া জ্ঞান কেন থাকিবে না?

ইঁহারা বলিতে চান যে, আমরা যে একটা জ্ঞাতার অস্তিত্ব মানিয়া লই, সে কতকটা ভাষার কায়দা; আমাদের সুবিধার জন্য, আমাদের দৈনন্দিন কারবার চালাইবার জন্য, আমাদের মানসিক শ্রমসংক্ষেপের জন্য উহা আমাদেরই একটা কল্পনা মাত্র।

'আমি গাছ দেখিতেছি' না বলিয়া যদি দার্শনিকোচিত গাম্ভীর্য্য ও সত্যনিষ্ঠার সহিত সর্ব্বদা বলিতে হয়, এখন এমন একটা জ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে, যাহার সদৃশ জ্ঞান পূর্ব্বেও জন্মিয়াছিল বলিয়া মনে হইতেছে এবং এই জ্ঞানকে 'গাছ দেখা' এই সংজ্ঞা দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে দার্শনিকত্ব বজায় থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনযাত্রা তুমুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। যেখানে সঙ্কেতে ও ইশারায় সত্বর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে, সেখানে সঙ্কেতটা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, এই খুঁটিনাটি আরম্ভ করিলে কার্য্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শত্রু সম্মুখীন হইলে ভোঁতা তলোয়ারও ব্যবহার করিতে হয়।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতের মত সংক্ষেপে এইরূপ দাঁড়ায়। জগৎ নানাবিধ খণ্ড প্রত্যয়ের সমষ্টি। সেই খণ্ড প্রত্যয়ের মধ্যে নানাবিধ সম্বন্ধ অনুভব করি। সেই সম্বন্ধের অনুভব হইতে অহংজ্ঞানের উৎপত্তি। এই অহংজ্ঞান বা আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান একটা জ্ঞান মাত্র। কুকুরের সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, অতএব একটা কুকুর আছে, ইহা যেমন সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ জ্ঞাতার বা আত্মার সম্বন্ধে একটা জ্ঞান থাকিলেই যে একটা আত্মা থাকিবে, ইহাও সিদ্ধ হয় না। নানাবিধ জ্ঞান আছে, এবং নানাবিধ জ্ঞানের মধ্যে আবার বিবিধ সম্বন্ধের বোধ আছে। 'ক' ও 'খ' উভয়ের একটা সম্বন্ধ আছে, 'গ'; 'চ' ও 'ছ' উভয়ের মধ্যে আর একটা সম্বন্ধ আছে 'জ'; আবার 'গ' ও 'জ' এই উভয় সম্বন্ধের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে সেটা 'ট'। এইরূপে সম্বন্ধের সহিত সম্বন্ধ মিলাইয়া একটা নূতন সম্বন্ধ অনুভূত হয়। আবার তাহার সহিত আর একটা সম্বন্ধ মিলাইয়া আরও একটা নূতন সম্বন্ধ অনুভূত হয়। এই বিবিধ সম্বন্ধসূত্রে প্রত্যয়গুলিকে গাঁথিয়া তন্মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ খাড়া করা যায়। এই নূতন নূতন সম্বন্ধের বোধেই চেতনার স্ফূর্ত্তি। এই নূতন নূতন সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তাহাদের নানাবিধ সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিই। সেই সংজ্ঞাগুলি—প্রাকৃতিক নিয়ম। এই সম্বন্ধের অনুভব না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়ম থাকিত না অথবা প্রকৃতিতে কোন নিয়ম দেখিতাম না। এই বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ হয়,

ততই বাহ্য প্রকৃতিতে নিয়মানুগত দেখা যায়। ফলে প্রকৃতিতে নিয়ম বর্ত্তমান আছে, এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না; প্রকৃতিতে নিয়ম দেখা যায়, এইরূপ একটা বোধ বা জ্ঞান আছে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। এই সকল নিয়ম বা সম্বন্ধ দেখিবার জন্য সম্পূর্ণ অকারণে এক জন দ্রষ্টার বা জানিবার জন্য এক জন জ্ঞাতার কল্পনা করা হয়; সেই কাল্পনিক দ্রষ্টার বা জ্ঞাতার নাম আত্মা বা অহম্ বা আমি।

এইরূপ সম্বন্ধ অনুভবে বা নিয়ম স্বীকারেই আত্মবোধ বা অহংকার। বস্তুপক্ষে নানাবিধ জ্ঞানের ও তাহাদের মধ্যে বিবিধ সম্বন্ধ জ্ঞানের সমষ্টিকেই যদি আত্মা নাম দাও, তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু একটা সংজ্ঞা দিয়া তদনুযায়ী একটা স্বতন্ত্র কিছু-না-কিছু বিদ্যমান আছে, এইরূপ মনে করিলে প্রতারিত হইতে হইবে। পরস্পর সম্বন্ধ-শৃঙ্খলায় আবদ্ধরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানের সমষ্টিই আত্মা, ইহা বলিতে পার। সেই সকল জ্ঞানের অন্তরালে একটা স্বাধীন জ্ঞাতা—যে জ্ঞাতার নাম আত্মা--সেই জ্ঞাতার স্বীকার অনুচিত। কতকগুলি ফুলকে পর-পর সাজাইয়া গাঁথিয়া যে সমষ্টি হয়, তাহার নাম দিই মালা; মালা এই ফুলের সমষ্টি মাত্র, ফুল ছাড়া স্বতন্ত্র মালা নাই। ফুলগুলিকে সাজাইবার জন্য, তাহাদিগকে একটা সম্পর্কে গাঁথিবার জন্য একগাছা সুতা থাকিতে পারে। কিন্তু এই সুতা সুতা মাত্র ও ফুল ফুল মাত্র। সুতাও মালা নহে, ফুলও মালা নহে, সূত্রবদ্ধ ফুলসমষ্টিই মালা।

আমরা দুইটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিয়াছি; প্রথম, কতিপয় প্রতীতির অস্তিত্ব; দ্বিতীয়, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যবোধের ও ভেদবোধের অস্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ একটা সাদৃশ্য বা ভেদ আছে কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই ও দরকারও নাই। এই সাদৃশ্যবোধ ও ভেদবোধ দ্বারা প্রত্যয়গুলিকে একটা রীতি অবলম্বনে সাজাইয়া লই। যাহাকে চলতি ভাষায় আত্মা বলা হয়, তাহার প্রধান পরিচয়ই এই যে, এই আত্মা সেই খণ্ড প্রত্যয়গুলির সম্বন্ধ বুঝিয়া তাহাদিগকে পৃথক পৃথক চিনিয়া লইতে পারে ও আপনার বলিয়া বুঝিতে পারে। আত্মার এই পরিচয়। বিবিধ ভেদবুদ্ধির মধ্যে দুইটা ভেদের একটু বৈশিষ্ট্য আছে—দেশভেদ ও কালভেদ। আত্মার পরিচয় এই যে, এই দেশগত ও কালগত ভেদ অনুসারে এই আত্মা সমুদয় প্রত্যয়গুলিকে সাজাইয়া নিরীক্ষণ করে। যে অংশে দেশগত ভেদ দেখিতে পায়, তাহাকে বাহ্য জগৎ নাম দেয়, এবং অবশিষ্ট ভাগকে অন্তর্জগৎ অভিধান দেয়, এবং উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধের আবিষ্কার করে। আত্মার কল্পনায় যদি জীবনযাত্রার সুবিধা হয়, কল্পনা করিতে পার; কিন্তু এই আত্মা একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, ইহা মনে করিয়া প্রতারিত হইও না।

এই শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের মত শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই। গাছ আছে, তাহার প্রমাণ নাই; তবে একটা জ্ঞান আছে, তাহার নাম গাছ। গাছ এখানে আছে ওখানে আছে, তাহার প্রমাণ নাই, তবে গাছ এখানে আছে, ওখানে আছে, এইরূপ জ্ঞান আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই জ্ঞানের নাম দেশজ্ঞান। গাছ আজি ছিল, কাল ছিল, পরশু ছিল, ইহার কোন প্রমাণ নাই;—তবে ঐরূপ একটা জ্ঞান আছে, তাহার নাম কালজ্ঞান। কাজেই এখানে গাছ আছে, ওখানে গাছ আছে, আজি গাছ আছে, কালি গাছ ছিল, এ সব

মানি না ; তবে ঐরূপ জ্ঞান আছে, তাহা মানি। গাছ সম্বন্ধে জ্ঞান যেমন, সেইরূপ কুকুর বিড়াল, চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদিও জ্ঞান। এই সকল জ্ঞানের মধ্যে আবার সামান্ত জ্ঞান, ভেদ জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান আছে। আছে বলিয়াই এটা কুকুর, ওটা গাছ, এটা চন্দ্র, ওটা সূর্য্য। গাছপালা, গরু কুকুর, চন্দ্র সূর্য্য, এই জ্ঞানগুলি নানান ধরণের ফুল ; আর গাছপালা, গরু কুকুর চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্ঞানগুলিকে এখানে-ওখানে, একালে-সেকালে রাখিয়া যাহা নির্ম্মিত হয়, সেই জগৎই মালা,—দেশ ও কালে সাজাইয়া দেখাই মালা গাঁথা। ফুলগুলিকে বিন্যস্ত করিয়া এখানে-ওখানে, এটার পর ওটাকে রাখিয়া, যে শৃঙ্খলায় যে সূত্রে বাঁধিয়া গাঁথিয়া দেখা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জ্ঞানরূপী ফুলগুলি আছে ; ফুলগুলির মধ্যে সাহচর্য্য ও পারম্পর্য্য-সম্বন্ধের অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের জ্ঞানরূপ সূতাগাছটিও আছে ; এবং এই জ্ঞানরূপী সূত্রবদ্ধ জ্ঞানফুলের সমষ্টিকে যদি আত্মা নামে মালা বল, সেই আত্মার মালাও সেই অর্থে আছে। অন্য কোন অর্থে মালা বা আত্মা নাই। উহা একটা সমষ্টির নাম মাত্র ; তদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপ অস্তিত্ব উহার নাই। কয়েকখানা কাঠ একটা রীতিক্রমে সাজাইলে গাড়ীর চাকায় পরিণত হয় ; উহার কোনটার নাম নাভি, কোনটার নাম অর, কোনটার নাম বেড় ; সাজাইবার রীতি অনুসারে নাম পৃথক্ পৃথক্। সমষ্টির নাম চাকা। গাড়ী, অর, বেড় হইতে স্বতন্ত্র চাকা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এক-একখানা কাঠ এক এক করিয়া খুলিয়া লও ; চাকাও লুপ্ত হইবে। যাহারা উল্লিখিতরূপে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে পারি।

ইঁহাদের প্রতি প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, এই অর্থে সূত্রবদ্ধ ফুলসমষ্টিরূপ মালা আছে, কিন্তু মালী আছে কি না? ফুলগুলিকে যথারীতি গাঁথিয়া মালা নির্ম্মিত হইল ; লতা পাতা, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে দেশে ও কালে ছড়াইয়া ও প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্রে গাঁথিয়া জগৎ যেন নির্ম্মিত হইল ; কিন্তু নির্ম্মাণ-কর্ত্তা কে?

সূতা ও ফুল আপনা হইতে মালা হয় না ; বাহিরের একজন উহাকে গাঁথে, তবে উহা মালা হয়। গাছপালা চন্দ্রসূর্য্যের ফুল গাঁথিয়া যেন জগতের মালা হইল ; কিন্তু উহা গাঁথিল কে? যতই ফুল লও না কেন, আর যত শক্ত সূতাই লও না কেন, আপনা হইতে মালা গাঁথিয়া উঠিবে না। একজন মালী চাই ; জগৎ-মালার মালী কে?

প্রচলিত উত্তর এই যে—হাঁ হাঁ, এক জন মালী আছেন, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলা যায় তিনিই কোথায় থাকিয়া বসিয়া বসিয়া এই অপরূপ মালা গাঁথিতেছেন।

এই উত্তরে উক্ত নাস্তিকদের আপত্তি হইবে যে, আচ্ছা, ফুলগুলি গাঁথিবার জন্য মালী আবশ্যক, ইহা না হয় মানিলাম, কিন্তু ফুলগুলি আসিল কোথা হইতে? মালী ত ফুল তৈয়ার করিতে পারে না, সে তৈয়ারি ফুল কুড়াইয়া আনিয়া, সূতাগাছটিও চাহিয়া আনিয়া, কেবল গাঁথে মাত্র। ঈশ্বর যদি মালাকার হন, তিনি ফুলগুলি পাইলেন কোথা হইতে?

প্রচলিত উত্তর এই যে,—তিনি কেবল মালাকার নহেন, তিনি ফুলগুলিরও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই ফুল তৈয়ার করিয়াছেন, সূতাও তৈয়ার করিয়াছেন এবং আপন মনের মতন

করিয়া ফুলগুলি সাজাইয়া গাঁথিয়াছেন। ফুলও তাঁহার, মালাও তাঁহার।

নাস্তিকের আপত্তি হয়, ফুল তাঁহার কিরূপে হইবে? ফুলগুলি জ্ঞানরূপী; সে জ্ঞান ত আমারই জ্ঞান। অন্যের জ্ঞানের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যের জ্ঞান আছে কি না আছে, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ; সে জ্ঞান কিন্তু তকিমাকার, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। যেগুলিকে আমার জ্ঞান বলি, সেইগুলিকেই প্রমাণনিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছি; এবং সেই জ্ঞানের মালাকেই জগৎ বলিয়াছি। এই যে জগৎ, ইহা আমারই জ্ঞানরূপী জগৎ। বাহিরের কোন পুরুষ, তিনি যত বড় পুরুষই হউন না, তিনি আমারই জ্ঞানরূপ পুষ্প আহরণ করিয়া আমার জ্ঞানরূপ জগতের মালা কিরূপে নির্ম্মাণ করিবেন? আমার জ্ঞানের বাহিরে যদি কোনরূপ জগৎ থাকিত, সেই জগতের জন্য স্বতন্ত্র মালাকার স্বীকার করিতে হয়ত পারিতাম। কিন্তু সেরূপ জগতের কথা আমি কিছুই জানি না; সেরূপ জগতের অস্তিত্ব মানিতে আমি বাধ্য নই। আমার জগৎ আমার জ্ঞানরূপী; আমার মালা আমারই মালা; ফুলগুলি আমারই ফুল, সূতাগাছটিও আমারই সূতা; এবং আমিই আমার সূতায় আমার ফুল গাঁথিয়া আমার মালা মনের মত করিয়া তৈয়ার করিয়াছি। আমিই মালাকার, অন্য মালাকার মানি না। ঈশ্বর নাম দিতে চাও, আমিই সেই ঈশ্বর।

নাস্তিক বলেন, জ্ঞানকেই স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া মানি; জ্ঞানের মালা আছে, তাহাও না হয় মানিলাম; কিন্তু ঐ আমিটাকে মানি না; আর আমিই যখন মালাকার, তখন মালাকারও মানি না। অন্য ঈশ্বর ত মানিবই না। সেকালের ও একালের নাস্তিকগণ বুদ্ধদেব হইতে হক্সলি পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ বলিয়া মানেন; যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা স্বয়ম্ভূ; তাহাই একমাত্র অস্তিত্ববান্ পদার্থ; জ্ঞান আছে, জ্ঞানের মালা আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মালা গাঁথা ব্যাপারটাও যখন জ্ঞানরূপী, তখন উহাও স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু সেই মালা গাঁথিবার জন্য মালী ঈশ্বরই হউন আর জ্ঞানই হউন, স্বতঃসিদ্ধ নহে; অতএব স্বীকার্য্য নহে। জ্ঞান যদি আপনা হইতে থাকিতে পারে, তবে জ্ঞানমালার গ্রন্থনও আপনা হইতেই হইতে পারে। উহা স্বতঃসিদ্ধ; উহার আড়ালে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। খণ্ড জ্ঞানের সমষ্টিকে আত্মা বল, উত্তম। কিন্তু জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞাতা বা আত্মা অস্বীকার্য্য। এবং সেই আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী, সে প্রশ্ন অনর্থক। মাথাই নাই, তা মাথাব্যথা কি? নাস্তিকেরা বলেন, আত্মাই যখন মানি না, তখন আত্মা বিনাশী কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা নাস্তিক নহেন; তাঁহাদের নাম বৈদান্তিক। এইখানে তিনি আসিয়া ঘাড় নাড়েন। তিনিও নাস্তিকের মতই জগৎকে জ্ঞানময় বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সেই জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিবার সময় একটু দমিয়া যান। বলেন, জ্ঞান ত আমারই জ্ঞান। আমি জানি বলিয়াই জ্ঞান; আমার জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞান অর্থশূন্য। কিন্তু জ্ঞান যখন আমার জ্ঞান বলিয়াইজ্ঞান, তখন আমাকে ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব মানিতে প্রস্তুত নহি। আমিই চরম স্বতঃসিদ্ধ, আর যত জ্ঞান আছে, তাহা আমারই কল্পনা। এই যে আমি, যে আমার জ্ঞানফুলগুলির সৃষ্টি করিয়া সেই জ্ঞানফুলকে আমার মনের মত করিয়া সাজাইয়া, আমার

সূতায় আমার মনের মত করিয়া গাঁথিয়া, আমার জ্ঞানময়ী জগতের মালা নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করিতেছি, এইরূপ মনে করিতেছি, সেই আমিই আত্মা। বাঙ্গলা করিয়া বলিলে যাহা আমি, সংস্কৃত করিয়া বলিলে তাহাই আত্মা। এই আত্মা বা আমি আমার পক্ষে চরম স্বতঃসিদ্ধ। এই আমি তর্কের বিষয় নহি, বিচারের বিষয় নহি, পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আমি আছি, ইহা চরম সত্য। আর যাহা কিছু আছে, তাহা আমারই জ্ঞান বা কল্পনা। এই জ্ঞাতা নাই বলিলে মানিব কেন? ওহে বৌদ্ধ, ওহে নাস্তিক, ইহা অস্তি, ইহা সৎ। তোমার বাগ্‌জালে ইহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইতে পারে না। ইহাই আত্মা। এখন প্রশ্ন এই যে, এই আত্মা অবিনাশী বা ধ্বংসশীল? এ প্রশ্ন আপাততঃ অর্থশূন্য নহে।

আত্মা অবিনাশী, কি ধ্বংসশীল, আত্মবাদীর পক্ষ হইতে ইহার কি উত্তর হয়, দেখা যাউক। প্রথমতঃ এই বাক্যটার অর্থগ্রহণের চেষ্টা করা যাক। আত্মার ধ্বংস আছে বলিলে বুঝিতে হয় যে, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আত্মার আত্মত্ব লোপ হয়; অর্থাৎ সেই ক্ষণের পূর্ব্বে আত্মা ছিল, তাহার পর আত্মা থাকে না, ইহাই বুঝিতে হয়। সেইরূপ আত্মার ধ্বংস নাই বলিলে বুঝায়, একটা নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পূর্ব্বে দেহ ছিল, তদাশ্রয়ে আত্মা ছিল; সেই ক্ষণের পর দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মা থাকিয়া যায়। যাঁহারা আত্মার ধ্বংস আছে কি না, এই প্রশ্ন তুলেন, তাঁহারা কালরূপ একটা আত্মেতর অনাদি ও অনন্ত পদার্থ মানেন। তাঁহাদের মতে আত্মার ধ্বংস আছে, ইহার অর্থ এই যে, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণে আত্মা লুপ্ত হয়; তার পরে কাল থাকে, কিন্তু আত্মা থাকে না। আত্মার ধ্বংস নাই, ইহার অর্থ এই যে, আত্মা কালের সহব্যাপী; কালও যত দিন, আত্মাও তত দিন; দেহান্তে আত্মা থাকিয়া যায়, দেহান্তর আশ্রয় করুক বা না করুক, কোনরূপে পরবর্ত্তী কাল ব্যাপিয়া থাকিয়া যায়।

এখন বিচারে আইস। আমরা বিবিধ ভেদবুদ্ধি মানিয়া লইয়াছি। কালবুদ্ধি তন্মধ্যে একটা। আত্মা প্রত্যয়গুলিকে দুই রকমে সজ্জিত করিয়া নিরীক্ষণ করে বা চিনিয়া লয়; কাল এই দুইয়ের মধ্যে অন্যতর সজ্জা। কাল আত্মার জগৎ নিরীক্ষণের একটা রীতি মাত্র। কালবুদ্ধি না থাকিলে জ্ঞানগুলি একরকমে পরস্পর জড়াইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া লওয়া যাইত না, সুতরাং আত্মার জগদ্‌বুদ্ধি অসম্ভব হইত। এই হিসাবে ও এই অর্থে আত্মার বাহিরে কাল নাই। কাল নামক কোন স্বাধীন পদার্থ যদি না থাকে, তাহা হইলে আত্মার ধ্বংস হইবে অমুক কালে, অথবা আত্মার ধ্বংস হইবে না কোন কালে, এরূপ বাক্যের কোন অর্থ হয় না।

আত্মার অস্তিত্ব যাঁহারা মানেন, তাঁহাদের নিকটেও আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন অর্থশূন্য।

মানিলাম, আমি আছি, ইহা সত্য। এ স্থলে 'আমি' অর্থে কি বুঝায়, তাহা উপরে যথাসাধ্য খুলিয়া বলিলাম। জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, প্রতীতি আছে, অতএব আমি আছি। বৌদ্ধে ও বৈদান্তিকে এইখানে গোড়ায় অমিল। বৌদ্ধ বলেন, আমি নাই; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ, সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ, সমস্তই জ্ঞান মাত্র, এই জ্ঞানগুলি হয়ত আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই। আমারই এইরূপ বলা হয় বটে, কিন্তু উহা অযুক্ত। উহা

ভ্রান্তি বা অবিদ্যা। এই ভ্রান্তি হইতে বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও আমারও উৎপত্তি। ফলে, কি আছে, ইহার উত্তর দিতে গেলে কিছুই নাই বলাই ভাল। যাহা আছে, তাহা শূন্য। অতএব বৌদ্ধ বলিলেন—নাস্তি। বৈদান্তিক বলিলেন, তা কেন হইবে? কিছু-না-কিছু আছে। নাস্তি নহে—অস্তি। কে আছে? আমি আছি। সেই আমি কে? যাহা কিছু আছে, তাহার জ্ঞাতাই আমি, তাহার কল্পনা-কর্ত্তাই আমি, তাহার দৃষ্টি-কর্ত্তাই আমি। যাহা কিছু বাহিরে দেখিতেছ, যাহা কিছু ভিতরে দেখিতেছ, সবই আমার কল্পনা। যাহা পূর্ব্বে ছিল মনে কর, যাহা এখন আছে মনে কর, যাহা পরে হইবে বিবেচনা কর, সে সকল আমারই কীর্ত্তি। চন্দ্র সূর্য্য, ছায়াপথ নীহারিকা আমি বাহিরে বিক্ষিপ্ত করিয়াছি; যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত, রাম-শ্যামকে আমি বাহিরে প্রেরণ করিয়াছি; সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, শোকতাপ আমি অন্তরে রাখিয়াছি। আমার কিয়দংশ অতীত, কিয়দংশ বর্ত্তমান, কিয়দংশ ভবিষ্যৎ মনে করিতেছি। কেন? এইরূপ করিয়া আমাকে বিক্ষিপ্ত বিশ্লিষ্ট ছিন্নভিন্ন করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রয়োজন কি? উত্তর, ইহা আমার মায়া, আমার লীলা। আমি এইরূপ করি। অন্ততঃ এইরূপ করাই আমার স্বভাব। উহা আমার মায়া, আমার স্বভাব, আমার লীলা। ঐরূপ না দেখিলে জগৎ বলিয়া কিছু থাকিত না এবং জগৎকর্ত্তা যে আমি, সেই আমাকেও আমি জানিতাম না। জানি না জানি, আমি কিন্তু আছি, আমাছাড়া কিছু নাই, কিছু থাকিতেই পারে না। যাহা কিছু ছিল বা আছে বা থাকিবে, তাহা আমি। আমি থাকিব না, জগৎ থাকিবে, জগতের ঘটনা থাকিবে, ইহা অসম্ভব; কেন না, সমস্ত জগৎটা আমারই কল্পিত; আমার সহিত আমার কল্পনাও যাইবে। আমি থাকিব না, কাল থাকিবে? শূন্য ঘটনাহীন কাল থাকিবে? মিথ্যা কথা। আমি না থাকিলে কাল থাকিতে পারে না। আমিই আমাকে কালে বিক্ষিপ্ত করি; আমিই আমাকে ত্রিধা ভিন্ন করি; ত্রিধা বিক্ষিপ্ত করিয়া দেখি; ত্রিকালে আমাকে ছড়াইয়া দেখি। উহা আমার মায়া, আমার লীলা। কাল আমারই আত্মনিরীক্ষণের রীতি। কাল আমারই সৃষ্টি, আমারই কল্পনা। কাল আমারই সহব্যাপী। আমি থাকিব না, কাল থাকিবে, আমা-হীন কাল থাকিবে, ইহা অর্থ-হীন। আমাকে যদি আত্মা বল, তাহা হইলে আত্মা বিনাশী, কি আত্মা অবিনাশী, এ প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না; এই প্রশ্নই হয় না; এ প্রশ্ন করিলেই আমা-ছাড়া স্বতন্ত্র কালের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ স্বতন্ত্র কাল কিছুই নাই। আমি বিনাশী বলিলে বুঝায়, আমি থাকিব না, কাল থাকিবে। ইহা অর্থশূন্য; কেন না, আমি না থাকিলে আবার কাল কি লইয়া থাকিবে? কাল ত আমারই কল্পনা। আমি অবিনাশী বলিলে বুঝায়, আমি থাকিব, কালও থাকিবে, কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব, অনন্ত ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া থাকিব। ইহারও অর্থ হয় না। কাল ব্যাপিয়া আমি থাকিব, এ কি কথা? কালই আমাকে ব্যাপিয়া থাকিবে, ইহা বরং সঙ্গত হইতে পারে। তাহাও সঙ্গত কি না বিচার্য্য। আত্মা বিনাশী, কি অবিনাশী, এই প্রশ্ন একেবারে অর্থশূন্য। যে প্রশ্নের অর্থ নাই, তাহার উত্তর দানের চেষ্টা মূঢ়তা।

কে বড় ?

ইংরেজীতে একটা বাক্য প্রচলিত আছে যে, ইতিহাসে একই ঘটনা ঘুরিয়া ফিরিয়া আইসে। মনুষ্যজাতির জ্ঞানে ইতিহাসেও এই বাক্যের সার্থকতার উদাহরণ পাওয়া যায়।

এক সময় ছিল,—সে বড় অধিক দিনের কথা নহে,—যখন মনুষ্য আপনাকেই জগতের সার পদার্থ মনে করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিত। অধিক দিনের কথা নহে বলিলাম, কেন না, এখনও হয়ত মনুষ্যজাতির পনর আনা ভাগ এই বিশ্বাস নিঃসন্দেহে পোষণ করিয়া আসিতেছে, এবং এই বিশ্বাসে সন্দেহ করিবার কোন হেতু উপস্থিত হইতে পারে, এরূপ চিন্তাও তাহাদের মনে কখন স্থান পায় নাই। খ্রীষ্টানগণের ও ইহুদীগণের ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পাতাতে যে সৃষ্টিবর্ণনা আছে, তাহা এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই লিখিত। প্রচলিত খ্রীষ্টানধর্ম্ম এই বিশ্বাসকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তাহারই উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে বলিলে বড় ভুল হয় না। খোদা সপ্তাহ কাল পরিশ্রম করিয়া এই বিচিত্র জগৎ কেবল মানুষের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে খাঁটি খ্রীষ্টানের কোন সংশয় নাই। বিচিত্র জগতের কিয়দংশ মানুষের রক্ষার জন্য; কিয়দংশ তাহার উপভোগের জন্য; এবং হয়ত কিয়দংশ তাহাকেই দুঃখ দিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য। তবে এইরূপ না কি কথিত আছে যে, মনুষ্যের ভোগের জন্য যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইতেই মনুষ্য আবার দুঃখ লাভ করিবে, সৃষ্টিকর্ত্তার আদৌ এ উদ্দেশ্য ছিল না। মনুষ্য আপনার দোষেই এই দুঃখভোগের অধিকারী হইয়াছে।

পুরাতন জ্যোতিষের মতে আমাদের ক্ষুদ্র ভূমণ্ডলটি সমস্ত ভৌতিক জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল; সেইরূপ ভূমণ্ডলবাসী মনুষ্যনামধেয় জন্তু ভোক্তা স্বরূপে সমস্ত ভোগ্য জগতের কেন্দ্রবর্ত্তী বিবেচিত হইত। এই ধ্রুব সত্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন একটা মহাপাতকের মধ্যে পরিগণিত হইত। যাঁহারা এইরূপ মহাপাতকে লিপ্ত হইতে সাহস করিতেন, তাঁহাদের জন্য গ্যালিলিওর মত অথবা ব্রুনোর মত পাপানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত।

সৃষ্টিকর্ত্তা কি উদ্দেশ্যে এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য মনুষ্যজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে আগ্রহের সহিত নিযুক্ত আছে। এই অনুসন্ধান ব্যাপারে মনুষ্যের এরূপ গুরুতর মাথাব্যথার হেতু কি, তাহা বলা দুষ্কর। হেতু যাহাই হউক, বিধাতা যে বিনা উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার বা একটি ক্ষুদ্র বালুকণার সৃষ্টি করেন নাই ও সেই পিপীলিকাকে ও সেই বালুকণাকে যথাকালে ও যথাস্থানে স্থাপন করেন নাই, ইহা একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে; এই সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যের ভিত্তিমূল আরও দৃঢ়তর করিবার নিমিত্ত বড় বড় মস্তিষ্ক গভীর গবেষণায় নিযুক্ত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জগতের প্রত্যেক ঘটনায় ও জগতের প্রত্যেক রহস্যে বিধাতার একটা গুপ্ত

উদ্দেশ্যের আবিষ্কারই তাৎকালিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের মুখ্য ব্যবসার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহার সন্দেহ হয়, তিনি পেলীর গ্রন্থ ও ব্রিজওয়াটার গ্রন্থাবলী পাঠ করিবেন।

বলা হইত যে, জগৎসৃষ্টি বিষয়ে সৃষ্টিকর্ত্তার একমাত্র উদ্দেশ্য আর কিছু হইতে পারে না; মানবজাতির মঙ্গলসাধন ও স্বার্থসাধন জন্যই বিধাতা এই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। মুখে সময়ে সময়ে বলা হইত বটে যে, বিধাতা মানুষকে যে চোখে দেখেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও ঠিক সেই চোখে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা এ কথা বলিতেন, তাঁহারা জানিতেন এবং অন্য সকলেই জানিত যে, বিধাতা মনুষ্যকে যে চোখে দেখেন, পিপীলিকাকে ঠিক সে চোখে দেখেন না। বাইবেল গ্রন্থের প্রথম পাতায় ইহা স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যই বিধাতার প্রিয়তম সৃষ্টি, এবং চন্দ্র সূর্য্য হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যাহা কিছু জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে, তাহার সৃষ্টি কেবল মনুষ্যেরই উপকার সাধনের জন্য। মনুষ্য যে ঘোড়াকে দিয়া গাড়ী টানায় এবং বলদকে দিয়া লাঙ্গল চালায় এবং দরকার পড়িলে উভয়কেই উদরস্থ করিতে দ্বিধা করে না, তাহাতে তাহার কোন পাপ জন্মে না; কেন না, এ বিষয়ে তাহার বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট চিরন্তন অধিকার প্রতিষ্ঠিত আছে। অল্প দিন হইল, কলিকাতার বিশপ ওয়েলডন স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, আহারের জন্য বা আমাদের জন্য জীবহত্যায় খ্রীষ্টানের কোন পাপ হইতে পারে না। তবে কালা আদমি এই জীবের মধ্যে কি না, তাহা বিশপ খুলিয়া বলেন নাই।

পাঠশালাসমূহে ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে বিধাতার এই মঙ্গলময়ত্বের অর্থাৎ মনুষ্যের প্রতি পক্ষপাতিতার ভূরি উদাহরণ দেওয়া আছে। বায়ু নহিলে মনুষ্য পাঁচ মিনিট কাল বাঁচিতে পারে না, সেই জন্য ঈশ্বর প্রচুর পরিমাণে বায়ু দিয়াছেন; জল নহিলে জীবনযাত্রা দুঃসাধ্য হয়, এই জন্য প্রচুর পরিমাণে জল মহাসাগরে সঞ্চিত আছে এবং মহাসাগর হইতে তাহার সর্ব্বত্র সঞ্চারণের ব্যবস্থা আছে; মেরুদেশবাসী এস্কিমোর আহার সাধনের জন্য ঠিক সেই প্রদেশেই শাদা ভালুকের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং শাদা ভালুককে সেই আহার ঘটনার সমাধান পর্য্যন্ত শীত হইতে বাঁচাইবার জন্য তাহার গায়ে দীর্ঘ লোমের ব্যবস্থা হইয়াছে; এই সকল গভীর তথ্য গম্ভীর ভাষায় প্রায় সকল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ দেখা যায়। সভ্য দেশের সভ্য জাতির জীবনধারণের সুবিধার জন্যই অসভ্য দেশে প্রচুর ভূমির ও প্রচুর অসভ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সভ্য দেশের রাজনীতি-বিদেরা এ বিষয়ে খোদার অভিপ্রায়ে যে কিছু মাত্র সন্দিহান নহেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লও—সূর্য্য! আলারম্ দেওয়া ঘড়ির মত প্রতি দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনুষ্য জাতির ঘুম ভাঙাইয়া প্রত্যেককে আহারান্বেষণরূপ মহাকর্ম্মে প্রেরণ করিবার জন্য সূর্য্য অবিশ্রামে নিযুক্ত আছেন, সে কথা সর্ব্বজনবিদিত। এই জন্যই বিধাতা বার লক্ষটা পৃথিবীর আয়তনবিশিষ্ট এই মহাকায় পদার্থকে পাঁচ

কোটি ক্রোশ দূরে রাখিয়া দিয়াছেন। সূর্য্য না থাকিলে বায়ু বহিত না, জল পড়িত না, মেঘ ডাকিত না, অন্ন-বস্ত্রেরও সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিত। রেশম, পশম ও কার্পাসের অভাবে মনুষ্যের শীতনিবারণ ও ভদ্রতারক্ষা ঘটিয়া উঠিত না; এবং রেশম-পশমাদিও কোনরূপে মিলিলে তাঁতীর অভাবে বস্ত্র জুটিত না। টিণ্ডাল সাহেব বলিয়াছেন যে, সূর্য্যই কার্পাসবৃক্ষরূপে তুলা প্রস্তুত করেন এবং গুটিপোকারূপে রেশম সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই আবার তন্তুবায়রূপে কাপড় বুনিয়া দেন। আলোকের অভাবে চিত্রবিদ্যা ও শব্দের অভাবে সঙ্গীতকলা মনুষ্যের চিত্তরঞ্জনের জন্য উদ্ভাবিত হইত না। এরূপ স্থলে সূর্য্যের মত বহুগুণশালী একটা বৃহৎ পদার্থের সৃষ্টি না করিলে কিরূপে মনুষ্যের বিচিত্র জীবনের বহুবিধ অভাব পূর্ণ হইত, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, এবং এই বহুগুণান্বিত সূর্য্যের সৃষ্টি দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা যে মনুষ্যেরই প্রতি তাঁহার পরম প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কোন্ মূর্খ অস্বীকার করিবে ?

কেবল সূর্য্যই বা কেন ? সূর্য্যের চারি দিকে কয়েকটা বৃহৎ গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহা ছাড়া কয়েক শত ক্ষুদ্র গ্রহ ও কত ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড এই সৌরজগতের ভিতর ঘুরিতেছে। তাহাদের অস্তিত্বে মনুষ্যের কি মঙ্গল সাধন হয়, তাহার নির্দ্দেশ আপাততঃ দুষ্কর। অবশ্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা তাহাদের অস্তিত্বের যে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আধুনিকেরা তাহা মানেন না বা মানিতে লজ্জা বোধ করেন। নেপচুন ও উরেনসের বিষয় প্রাচীনেরা জানিতেন না, কিন্তু বুধাদি গ্রহ যে মনুষ্যের শুভাশুভ ভাগ্য নির্দ্দেশের জন্যই আপন আপন কক্ষায় নির্দ্দিষ্ট বিধানে ঘুরিয়া থাকে, এবং ধূমকেতুর উদয় ও উল্কাপিণ্ডের বর্ষণ সময়ে অসময়ে ঘটিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া সৎপথে চলিতে বলে, তাহা সেকালের পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছিলেন। একালে আমরা তাহা মানি না, কিন্তু তাই বলিয়া গ্রহগণ ও তাহাদের গতিবিধি কি নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ? গ্রহগণের গতিবিধি আপাততঃ এত জটিল বোধ হয় যে মনুষ্যের গণনাশক্তি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সেই জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া পরিশেষে শ্রান্ত ও পরাভূত হয়। কিন্তু লাপ্‌লাস্ দেখিয়াছিলেন, সেই দুর্ভেদ্য জটিলতার অভ্যন্তরে এমন কৌশলময় নিয়ম বর্ত্তমান আছে যে, গ্রহগণ পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া কোন-না-কোন সময়ে ঠিক আপন আপন স্থানে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য রহিয়াছে। লাপ্‌লাস দেখাইয়াছিলেন যে, দেহমধ্যে যেমন হাত-পা, নাক কাণ, অস্থি মজ্জা, স্নায়ু পেশী প্রভৃতি পৃথক ভাবে অথচ পরস্পরের অধীনতায় কাজ করিয়া সমস্ত শরীরের কুশল বজায় রাখে; সেইরূপ গ্রহ উপগ্রহাদিও সমস্ত সৌরজগৎটাকে এরূপ ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে যে, সেই জটিল জগদ্‌যন্ত্রের কখন আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। লাপ্‌লাস্ এই কথা বলিলেন, আর হুইওয়েল করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, দেখ বিধাতার কেমন মানবপ্রীতি! সৌরজগৎরূপ যন্ত্রটা এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে ও চালিত হইতেছে যে, কোন ভবিষ্যৎকালে মনুষ্যের অধিষ্ঠান এই ভূমণ্ডলটি ভাঙ্গিয়া গিয়া মনুষ্যকে আশ্রয়চ্যুত করিবে, এবং তাৎকালিক মনুষ্যগণের গতপ্রাণ কলেবরগুলা উল্কাপিণ্ডের মত অন্তরীক্ষে ঘুরিতে থাকিবে, তাহার অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

বস্তুতই বিনা উদ্দেশ্যে যে কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় নাই, এবং সেই উদ্দেশ্যের নাম যে মানবমঙ্গল, তাহার প্রতিপাদনের জন্য বিজ্ঞানবিদের মস্তিষ্ক এতকাল ধরিয়া অত্যন্তই আলোড়িত হইয়াছে। মশক জাতির সৃষ্টি দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার সাধিত হইয়াছে কি না, স্থির করা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে কঠিন ব্যাপার; বিশেষতঃ মশারিহীন হতভাগ্যদের পক্ষে। কিন্তু সে দিন কোন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, কোন জীবতত্ত্ববিৎ না-কি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মশকে হুলপ্রয়োগে মনুষ্য-শোণিত হইতে কোন বিষময় অংশ বাহির করিয়া লয়, এবং এইরূপে সেই পরিণাম-শুভদ মশক-জীবনও মনুষ্যের কল্যাণসাধনে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু হায়. চিরদিন কখন সমান যায় না। মনুষ্য যখন জগতের মধ্যে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গর্ব্বের সহিত বুক ফুলাইয়া নিশ্চিন্ত ছিল, এবং যখন বিজ্ঞানবিদ্যা তাহার সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়া মনুষ্যের জয়ঢক্কা বাজাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বিজ্ঞানই আবার মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, প্রভু, প্রভুত্বগর্ব্বে গর্ব্বিত হইও না: তুমি জগতের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তুমি তৃণাদপি সুনীচ, তুমি বালুকণা হইতেও অধম।

তুমি আপনাকে যে জগতের প্রভু বলিয়া গর্ব্বিত হইতেছ, সেই জগতের মধ্যে তোমার স্থান কোথায়? জগৎ অনন্ত, তুমি সান্ত; জগৎ অনাদি, তুমি সাদি। যে সান্ত, সে সাদি, সে অনন্তের ও অনাদির প্রভুত্বের স্পর্দ্ধা করিবে, ইহা সেই অনন্তের ও অনাদির সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ্য উদ্দেশ্যে কখনই হইতে পারে না। ইহা ভ্রম, ইহা মূঢ়তা।

সূর্য্য পাঁচ কোটি ক্রোশ দূরে রহিয়া তোমার জন্য তেজ বিকিরণ করিতেছে; কিন্তু তাহার বিকীর্ণ তেজরাশির যে কণিকামাত্র তোমার কাজে লাগে, সূর্য্যমণ্ডলের তেজঃসমষ্টির তুলনায় তাহার পরিমাণ কতটুকু? সূর্য্য হইতে তোমার নিকট আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; কিন্তু এমন প্রকাণ্ডতর সূর্য্য জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা হইতে আলোক আসিয়া এখনও তোমার নিকটে পৌঁছে নাই। আবার সাগরবেলায় যেমন একটি ক্ষুদ্র বালুকাকণা, তোমার সৌরজগতের কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্যটি অসীম আকাশসাগরে তদপেক্ষা বৃহৎ নহে। আবার তোমারই সেই সৌরজগতের মধ্যে তুমি ক্ষুদ্র কীটের মত নগণ্য।

অনাদি ও অনন্তের মধ্যে তোমার নিবাস বটে, কিন্তু অনাদির সহিত ও অনন্তের সহিত তোমার তুলনা কোথায়? কালসাগরের মধ্যে তুমি একটি মাত্র ঊর্মি অথবা একটি মাত্র বুদ্বুদ; কিন্তু সেই অসংখ্য ঊর্ম্মির মধ্যে, অগণ্য বুদ্বুদের মধ্যে, সেই একটি মাত্র ঊর্ম্মির ও একটি মাত্র বুদ্বুদের স্পর্দ্ধা করিবার হেতু কোথায়? ভূবিদ্যা বলিতেছে, সৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেলের মত অমূলক। কত সাত হাজার বৎসর জগতের ইতিহাসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন পৃথিবী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মনুষ্য নামক জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় নাই। কত ম্যামথ, কত ম্যাষ্টোডন, কত ভয়াবহ সরীসৃপ, কত ভীষণ মকর-তিমিঙ্গিল পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে তোমারই মত স্পর্দ্ধার সহিত বিচরণ করিত, তখন তোমার উদ্ভব হয় নাই। তাহারও পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র

পৃথিবীরই কত কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে, যখন কোন জীবেরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন ধরাপৃষ্ঠে জীব ছিল না, কিন্তু চন্দ্র এমনই জোনাকি দিত, সূর্য্য এমনই করিয়া তাপ দিত, দূরস্থ তারকাগণ এমনই করিয়া প্রতি দিন গগনমণ্ডলে দেখা দিত। কিন্তু সে কি তোমারই জন্য? তুমি তখন কোথায়। হুইওয়েলের করতালির শব্দে মোহিত হইও না; লাপ্‌লাসের গণনাতেও প্রমাদ আছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্যা আশা দিয়াছিল, সৌরজগতের ধ্বংস নাই; কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর না যাইতেই বিজ্ঞানবিদ্যা বলিতেছে, সৌরজগতের ধ্বংসে বড় বিলম্ব নাই। সেই ভবিষ্যৎ দূরবর্ত্তী নহে, যখন সূর্য্য নিবিয়া যাইবে; যখন পৃথিবী ভাঙ্গিয়া যাইবে; এককালে যে সূর্যের কুক্ষি হইতে বাহির হইয়াছিল, পুনশ্চ সেই সূর্য্যের কুক্ষিতেই হয়ত বিলীন হইবে। জগৎ তখনও থাকিবে। কিন্তু তুমি মনুষ্য, তুমি তখন কোথায় থাকিবে? সাগরপৃষ্ঠে বুদ্বুদ, তুমি তখন সগরে লীন হইয়া যাইবে; তোমার অস্তিত্ব তখন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইবে। তুমি জগতের প্রভুত্বের স্পর্দ্ধী হইও না।

অর্দ্ধ শতাব্দ হইয়া গেল, ডারুইন তাঁহার মহাগ্রন্থ প্রচার করেন। ডারুইন প্রকৃতির মুখ হইতে যে অবগুণ্ঠনখানা মোচন করিয়া দিয়াছেন, নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন সকলেই জানে যে, তাহাতে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শকের চোখে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের স্পর্দ্ধার তাহাতে কি হইয়াছে? স্পর্দ্ধার হেতু কমিয়াছে বই বাড়ে নাই। প্রজাপতির সৌন্দর্য্য ফুলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ফুলের সৌন্দর্য্য প্রজাপতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ঠিক কথা। কিন্তু মনুষ্যের চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্যে সেই সৌন্দর্য্যে সৃষ্টি হয় নাই। মনুষ্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ফুল আপনার সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া প্রজাপতিকে আহ্বান করিত, মধুর প্রলোভনে তাহাকে প্রলোভিত করিত, প্রজাপতি আপন রূপে ফুলের রূপের অনুকৃতি করিয়া ফুলের পাশে লুকাইয়া শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিত। এস্কিমো জাতির আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে মেরুপ্রদেশে সীলের গায়ে চর্ব্বি ছিল ও ভালুকের গায়ে শাদা শাদা বড় বড লোম ছিল; এবং সেই চর্ব্বিওয়ালা সীল ও লোমওয়ালা ভালুক যখন আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন এস্কিমো জাতির আহার সম্পাদনে তাহারা ভবিষ্যতে নিয়োজিত হইবে, এই কল্পনা কাহারও মনে আসে নাই।

বিশাল জগতের মধ্যে মনুষ্যের স্থান কোথায়, এ সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কতকটা এইরূপ। আমাদের এই যে সৌরজগৎ, সূর্য্য যাহার কেন্দ্রবর্ত্তী ও আমাদের পৃথিবী যাহার অন্তর্গত, তদনুরূপ জগৎ আরও কত কোটি বর্ত্তমান আছে। আমরা চোখে যে কয় হাজার তারকা আকাশে দেখিতে পাই, দূরবীনে যাহাদের সংখ্যা কয়েক কোটি হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি সূর্য্য; প্রত্যেকটি হয়ত এক একটা গ্রহ-উপগ্রহযুক্ত সৌরজগতের কেন্দ্রবর্ত্তী। সকল তারকার আয়তন ও দূরত্ব এ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। যে দুই চারিটির আয়তন ও দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন তারা আমাদের সূর্য্যের অপেক্ষা ত্রিশ চল্লিশ গুণ বড়। আমাদের সূর্য্য হইতে আলো আসিতে আট মিনিট সময় লাগে; কোন কোন তারা হইতে আলো আসিতে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর অতীত হয়। এমন তারা সম্ভবতঃ অনেক আছে, যাহারা আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা এত বড় যে, উভয়ের

মধ্যে তুলনা হয় না। তাহাদের দূরত্ব এত অধিক যে, তাহাদের আলোক হয়ত মানুষের জীবনকালে আসিয়াই পৌঁছে না। এইরূপ বহু লক্ষ তারকার মধ্যে সূর্য্য একটি ক্ষুদ্র তারা। আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবী আবার সেই ক্ষুদ্র তারার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। তিন কোটি পৃথিবী জমাট বাঁধিলে সূর্য্যের সমান হইতে পারে। এককালে হয়ত আমাদের পৃথিবী আমাদের সূর্য্যেরই অংশগত ছিল; সূর্য্য সেকালে এমন ছিল না। হয়ত বাষ্প জমিয়া, হয়ত কোটি কোটি উল্কাখণ্ড জমাট বাঁধিয়া, সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে ও সূর্য্যেরই এক একটা টুকরা কোনরূপে বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহের উৎপাদন করিয়াছে? এইরূপে কত কোটি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, যখন আমাদের এই পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, যখন ইহা সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত ও শরীরগত ছিল। পরে এই পৃথিবী স্বতন্ত্র আকার-বিশিষ্ট হইয়াও কত কোটি বৎসর ধরিয়া শীতল হইয়াছে। যখন ইহার পৃষ্টদেশ অগ্নিময় ছিল, তখন ইহাতে কোন জীবের উৎপত্তি হয় নাই। কালে ভূপৃষ্ঠ শীতল ও কঠিন হইয়া জীবের বাসযোগ্য হইলে জীবের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কত কোটি বৎসর ধরিয়া প্রাকৃতিক নির্বাচনে ও অন্যান্য কারণে সেই সকল জীব হইতে ক্রমশঃ উর্দ্ধতন পর্য্যায়ের জীবের বিকাশ হইয়া অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। কিছু দিন পূর্বে পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। এই যে কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি বৎসর পৃথিবীতে মানুষ দেখা দিয়াছে, সে কয়েক বৎসর পৃথিবীর সমস্ত বয়সের তুলনায়, সৌরজগতের বয়সের তুলনায়, বিশ্ব-জগতের বয়সের তুলনায় এক নিমেষও নহে। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে দেখা দিল, তখন নরে বানরে অধিক প্রভেদ ছিল না। কালে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেরই প্রভাবে মানুষেরও উন্নতি ঘটিয়াছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া ক্রমোন্নতি সহকারে তাহার বর্ত্তমান পদবী লাভ করিয়াছে।

মানুষের এই উন্নতির মূলে মুখ্যতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচন। জীব জীবের সহিত ও সমস্ত প্রকৃতির সহিত কঠোর সংগ্রামে অবিশ্রামে নিযুক্ত রহিয়াছে; এই সংগ্রামে নিরানব্বই জন পরাজয় ও এক জন জয় লাভ করিতেছে। কে যে কি কারণে পরাজিত হয়, কে যে কি কারণে জয় লাভ করে, নিরূপণ দুঃসাধ্য;—তবে মোটের উপর যারা দুর্ব্বল, তারাই পরাস্ত হয়, যারা সমর্থ, তারাই জিতিয়া যায়। মোটের উপর সমর্থের জয়লাভ ঘটে। এইরূপে প্রকৃতি নিষ্ঠুরহস্তে অসংখ্য দুর্ব্বলকে সংহার করিয়া ও কতিপয় সমর্থকে বাঁচাইয়া বর্ত্তমান মনুষ্যের উৎপাদন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে মনুষ্যের পদবী উন্নত, কেন না, অন্য জীব অপেক্ষা সমর্থ। কিন্তু সেই সামর্থ্যেরই বা মাত্রা কতটুকু! মানুষকে এখনও সেই ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আপনার পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইয়াছে;—এই সংগ্রাম হইতে তাহার একটু বিরাম বা অবকাশ লাভ করিবার যো নাই। একটু অসাবধান হইলেই তাহাকে পড়িতে হইবে ও মরিতে হইবে। সাবধান থাকিলেই যে জয়লাভ ঘটিবে, তাহাও সাহস করিয়া বলা চলে না। এই সংগ্রামের ফলেই মনুষ্যের বর্ত্তমান দুঃখ। দুঃখভোগ মনুষ্যজীবনে একরূপ বিধিলিপি। কষ্টে-সৃষ্টে কায়ক্লেশে প্রত্যেকে আপনার মনুষ্যত্ব কয়টা দিবসের জন্য বজায় রাখিতেছে। এইরূপে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া, এইরূপে জীবনাবধি

মরণ পর্যন্ত দুঃখভোগ করিয়া, মানুষ কায়ক্লেশে কিছু দিন ধরাতলে টিকিতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ শোচনীয়। এমন দিন আসবে, যে দিন আবার পৃথিবীতে মনুষ্যের অস্তিত্ব থাকিবে না; এমন দিন আসবে, যে দিন মনুষ্যেতর জীবেরও অস্তিত্ব থাকিবে না; এমন দিন আসবে, যে দিন পৃথিবীরই হয়ত অস্তিত্ব থাকিবে না। সূর্য্য সে দিন নিবিয়া যাইবে। সৌরজগতে সে দিন জীবন থাকিবে না, চেতনা থাকিবে না মনুষ্যের প্রার্থনীয় কিছুই থাকিবে না। তবে কালের বুঝি শেষ নাই; জগতের যেমন আদি কল্পনায় আসে না, সেইরূপ অন্তও কল্পনায় আসে না। জগতের স্রোত চলিবে। জগৎ চলিবে, কিন্তু মানুষ থাকিবে না। সেই ভবিষ্যতে অন্য পৃথিবীতে অন্য জীব থাকিবে কি না, তাহাতে আমাদের মাথাব্যথা জন্মাইবার সম্প্রতি কোন হেতু দেখি না। মানুষ মহাসাগরে বুদ্বুদ, মহাসাগরে চিরতরে মিশাইবে। এইরূপ মানুষের অতীত, এইরূপ মানুষের ভবিষ্যৎ। ইহা লইয়া যদি স্পর্দ্ধা কর, ইহা লইয়া যদি গর্ব্বিত হও, তাহা হইলে মূঢ়তা আর কাহাকে বলে! এই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া বিশ্বের মহত্বকে আপনার অধীন করিবার প্রয়াস উপহাস্য। এই নগণ্য অচিরস্থায়ী মনুষ্য-জীবনের তৃপ্তির জন্য বিধাতা এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মনে করিলে বিধাতার প্রতিও বিলক্ষণ অবিচার হয়।

কিছু দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্যা স্থির করিয়াছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই নির্ম্মিত যাহাতে মানুষের কোন লাভ নাই, এমন কোন বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারে না। এই কথা লইয়া মানুষ আপনার জয়ঢাক আপনি বাজাইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছিল; সেই কোলাহলের প্রতিধ্বনি এখনও স্তব্ধ হয় নাই। ইহারই মধ্যে বিজ্ঞান-বিদ্যা অন্যরূপ কথা আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদপি লঘু, বালুকণা হইতে অধম।

বস্তুতই কি তাই? বস্তুতই কি মানুষ ক্ষুদ্র? বস্তুতই কি অনন্ত জগতের মধ্যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র? না;—ইতিহাসে একই ঘটনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে; জ্ঞানের ইতিহাসেও একই সত্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হয়। মানুষ ক্ষুদ্র নহে।

জগৎ অসীম, আকাশ অনন্ত, কাল অনাদি,—এ সকল মিথ্যা কথা। জগৎ অসীম নহে, আকাশ অনন্ত নহে, কাল অনাদি নহে। মনুষ্য কল্পনায় পিশাচের সৃষ্টি করিয়া আপনি বিভীষিকা দেখে; মানুষে কাল্পনিক অনন্তের ও কাল্পনিক অনাদির সৃষ্টি করিয়া আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার কাল্পনিক বৃহত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া প্রতারিত হয়।

জগৎ কোথায়? জগৎ তোমার বাহিরে নহে; জ্ঞাননেত্রে চাহিয়া দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে। জীবসমাকুলা বসুন্ধরা, সূর্য্যকেন্দ্রক সৌরজগৎ, তারকাকীর্ণ নভস্তল তোমারই অন্তরে। তুমি বিশ্বজগতের অন্তর্গত নহ, বিশ্বজগৎই তোমার অন্তর্গত। বিশ্বজগতের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণই নাই; তুমি আছ বলিয়াই বিশ্বজগৎ আছে। সূর্য্য আলোক দিতেছে, সেই জন্য তুমি দেখিতেছ;—ইহা ভ্রান্তি। তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, সূর্য্য আলোক দিতেছে;—ইহাই সত্য। সূর্য্যের অস্তিত্বের অন্য প্রমাণ কোথায়?

তোমার বন্ধুও হয়ত বলিতেছেন, সূর্য্য আলোক দিতেছে,—এই সাক্ষ্যে ভুলিও না; কেন না, তোমার বন্ধুই বা কে? তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, উনি আমার বন্ধু; তুমি দেখিতেছ বলিয়াই তোমার বন্ধু বিদ্যমান। তোমার খেয়াল হইয়াছে, সেই জন্য বলিতেছ, ওখানে সূর্য্য থাকিয়া আলোক দিতেছে; তোমার খেয়াল, সেই জন্য বলিতেছ, এখানে বন্ধু দাঁড়াইয়া ঐ সূর্য্যের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছেন। তোমার বন্ধুর মুখে যে কথা শুনিতেছ, সে কথা তোমার বন্ধুর নহে। সে তোমারই কথা; তুমি তাহাকে যাহা বলাইতেছ, তাহাই তিনি বলিতেছেন। তুমি তোমার সূর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি তোমার বন্ধুর সৃষ্টি করিয়াছ; আবার কি অদ্ভুত খেয়াল-বলে তোমার কল্পিত বন্ধুর মুখ দিয়া তোমার কল্পিত সূর্য্যের অস্তিত্বের, সাক্ষ্য কল্পিত করিতেছ। সূর্য্যের অস্তিত্বে বিস্ময়ের হেতু নাই, বিস্ময়ের হেতু তোমার খেয়াল। এমন খেয়াল তোমার কেন হয়, এমন খেয়াল তোমার কিজন্য হয়? অথবা এ প্রশ্নই বা কেন? এই নানারূপ খেয়াল আছে, তাই তুমি নিজের অস্তিত্ব জানিতেছ। তোমার খেয়ালগুলার মধ্যে, তোমার কল্পনাগুলার মধ্যে, তোমার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে, একটা শৃঙ্খলা, একটা ধারাবাহিকতা, একটা পারম্পর্য্য, একটা সমবায় দেখিয়া তুমি বিস্মিত হও ও তোমার কল্পিত জগৎকে নিয়মাধীন ও সুব্যবস্থ দেখিয়া চমকিত হও। কিন্তু সে বিস্ময়েরই বা কারণ কি? এই শৃঙ্খলা ও এই সামঞ্জস্য তোমারই সৃষ্টি, তোমাকর্তৃকই তোমার খেয়ালের উপরে আরোপিত। তোমার খেয়ালগুলাকে তুমি ঐরূপে সাজাইয়াছ সেই জন্য তাহারা ঐরূপে সজ্জিত দেখাইতেছে। দুইটা খেয়ালকে তুমি ঠিক একই রূপে দেখ না, একটু না একটু বিভিন্ন ভাবে দেখ; আবার দুইটা খেয়ালকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে দেখ না, কোন না-কোন বিষয়ে সদৃশ দেখ; এই বিশেষের ভাব ও এই সমানতা দেখিয়া, বিবিধ বিশেষ বিবিধ সামান্য অনুসারে সাজাইয়া ও গোছাইয়া তুমি তোমার এ বিচিত্র জগতের নির্ম্মাণ করিয়াছ; অপরে ইহা নির্ম্মাণ করিতে আসে নাই। ইহার সৃষ্টিকর্তা তুমি স্বয়ং; অথবা ইহা লইয়াই তুমি; ইহাই তুমি; তৎ ত্বম্ অসি।

কেন তোমার এমন খেয়াল, তাহা জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত জানি, এই খেয়াল-গুলি না থাকিলে কিছুই থাকিত না; এমন কি, তোমার অস্তিত্বও তুমি জানিতে পারিতে না; সবই হয়ত শূন্যে পরিণত হইত। তোমার খেয়ালে খেয়ালে সামান্য, আবার খেয়ালে খেয়ালে বিশেষ, তুমি এইরূপ কেন দেখ, তাহা জানি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এই সাদৃশ্য ও এই ভেদ আছে বলিয়াই তুমি আপন অস্তিত্বে আস্থাবান্। তোমার সকল কল্পনা সমান হইলে, অথবা তোমার সকল কল্পনা বিসদৃশ হইলে, তোমার ব্যক্তিত্ব কোথায় থাকিত, বুঝিতে পারি না। তুমি আছ; ইহা যদি ঠিক হয়, তবে তোমার কল্পিত জগৎও ঠিক এইরূপই হইবে। না হইয়া বুঝি উপায় নাই।

জগৎ কোথায়? তোমাকে ছাড়িয়া জগৎ নাই। জগৎ তোমারই সৃষ্টি। তুমিই উহাকে তোমার বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। তোমার জগৎ কি অনন্ত? মিথ্যা কথা। তোমার জগৎ সান্ত, সঙ্কীর্ণ, পরিধিবান্। তোমার জগৎ, অর্থাৎ তোমার দর্শন স্পর্শ

প্রভৃতি দ্বারা তুমি যে কল্পিত জগতের সঙ্গে কারবার করিয়া থাক, সে জগৎ সান্ত। তবে তাহার পরিধি প্রসরণশীল, তাহার সীমারেখা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে। কেন? তোমার নিজত্বের স্ফূর্তির সহকারে, তোমার নিজের অভিব্যক্তির সহকারে, তোমার জগতের পরিধি প্রসার লাভ করিতেছে। ঠিক যে রীতিতে তুমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছ, ঠিক সেই রীতিক্রমে তোমার জগতের সীমা বাড়াইতেছ। দেশে তাহার সীমা বাড়াইতেছ ও কালে তাহার সীমা বাড়াইতেছ। তোমার নিজত্ব ক্রমে স্ফূর্তি লাভ করে, ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। কেন হয়, তাহা জানি না, তোমার অস্তিত্বের এই লক্ষণ। তোমার যে অবস্থার নাম সুপ্তাবস্থা, তখন তোমার জগৎ খাটো হইয়া সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে লীন হয়; তোমার যে অবস্থার নাম জাগ্রৎ অবস্থা, তখন তোমার জগতের পরিধি বিস্তৃত হয়। কিন্তু তোমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত, এমন কোন ক্ষণ দেখি না, যখন তোমার জগৎ অনন্ত ও সীমাহীন ও পরিধিহীন। তুমি জগতের সৃষ্টি করিতেছ, ক্রমশঃ জগৎকে গড়িয়া তুলিতেছ; কোথায় তুমি থামিবে, তাহা জানি না; তুমিও তাহা জান না। সেই জন্য তুমি বলিতেছ, জগতের সীমা নাই। তুমি ভ্রান্ত। তোমার অভিব্যক্তির সীমা তুমি পাও নাই, তোমার সৃষ্টিক্ষমতার সীমা-নির্দ্দেশে তুমি সমর্থ হও নাই, এইরূপ তুমি ভাণ করিতেছ।

তোমার জগৎ সুনিয়ত, সুব্যবস্থ, শৃঙ্খলাযুক্ত। বিস্মিত হইও না। সে তোমারই কীর্ত্তি। জগতে নিয়ম আছে, কেন না, তুমি জগতে নিয়ম স্থাপন করিযাছ। জগতের স্রোত আকাশ ব্যাপিয়া কাল বহিয়া চলিতেছে; সুনিয়তভাবে চলিতেছে; কেন না, তোমার ইচ্ছাক্রমে উহা ঐরূপে চলিতে বাধ্য। তোমার জগতে নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে; কেন না, সেই নিয়ম, সেই ব্যবস্থা তুমি স্থাপন করিয়াছ। তুমিই জগতের স্রষ্টা, তুমিই তাহার বিধাতা।

মানুষের ইতিহাসে বহু দিন গত হইয়াছে, যখন মনুষ্য আপনার কল্পনার সমক্ষে আপনাকে ক্ষুদ্র স্থির করিয়া সেই কল্পনার মাহাত্ম্যে ভীত ও সেই কল্পনার পূজায় নিরত হইয়াছে, এবং আপনার জীবনকে কাল্পনিক দুঃখের আধার ভাবিয়া সেই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের নিষ্ফল প্রয়াসে প্রতারিত হইয়াছে। এমন দিন কি আসিবে না, যখন এই মিথ্যা বিভীষিকা, তাহার মনুষ্যত্বকে আর সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ রাখিবে না, এই কাল্পনিক মুক্তিপ্রয়াস তাহাকে উন্মার্গগামী করিবে না। যখন মনুষ্য আপন মনুষ্যত্বের অর্থ বুঝিবে; আপনাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া জানিতে পারিবে। পূর্ণ মনুষ্যত্বে বলীয়ান্ মনুষ্যের কণ্ঠে সোঽহম্ এই মহাবাক্য ধ্বনিত হইবে; কিন্তু সেই মহাবাক্য মনুষ্যকে অতীত কালের মত স্বার্থপর বৈরাগ্যের পথে চালিত না করিয়া হৃদিস্থিত অন্তর্যামীর উপদিষ্ট কর্ত্তব্যের পালনে নিযুক্ত রাখিয়া ব্যবহারিক মৃত্যুর ভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া অভয় দান করিবে।

মাধ্যাকর্ষণ

নিউটন এক দিন আপেল ফল ভূমিতে পড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে। অমনই মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব বাহির হইল ও নিউটনের নাম ইতিহাসে চিরস্থায়ী হইয়া গেল। এবং তদবধি আপেল ফল কেন পড়ে, জিজ্ঞাসা করিলেই প্রত্যেক পাঠশালার বালকে উত্তর দেয়, মাধ্যাকর্ষণই উহার কারণ।

গল্পটা কত দূর সত্য, সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। গল্পটা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আপেল ফল যে কেন ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে বোধ করি, কাহারও আর সন্দেহ নাই।

মানুষের মন সর্ব্বদাই কারণ অনুসন্ধান করিতে চায়; এবং শুনা যায়, এই জন্যেই জীবসমাজে মনুষ্যের স্থান এত উচ্চে। কিন্তু সেই কারণ-অনুসন্ধানস্পৃহাটা যদি এত সহজে পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, জীবসমাজে শ্রেণি-বিভাগ কার্য্যটার এখনও পুনঃসংস্করণ আবশ্যক: মনুষ্যকে অত উচ্চে তুলিলে চলিবে না।

নিউটনের বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য অথবা অন্য কোন পণ্ডিত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা সগর্ব্বে সংস্কৃত শ্লোকের প্রমাণ আওড়ান, তাঁহাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, ভাস্করাচার্য্যই কি, আর নিউটনই কি, কোন পণ্ডিতই পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির অস্তিত্ব নূতন আবিষ্কার করেন নাই। নিউটনের ও ভাস্করের বহু পূর্ব্বে এই আকর্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যে জম্বুক আঙ্গুরের প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখে অপেক্ষা করিয়াছিল, সেও জানিত যে, আঙ্গুর ফল পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়। অপিচ, আমার এই উক্তিতে নিউটনের ও ভাস্করের মহিমামণ্ডিত যশোরাশির কণিকামাত্র অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, আপেল ফল যে কি কারণে ভূপতিত হয়, এ পর্য্যন্ত তাহা অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

নিউটন আপেল ফলের ভূপতনের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই, তবে তিনি যে একটা প্রকাণ্ড কর্ম্ম সাধন করিয়া গিয়াছেন, সেটার তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা পাওয়া উচিত।

আপেল ফল যে বৃন্তচ্যুত হইলেই পৃথিবীর দিকে দৌড়ায়, ইহা নিউটন যেমন দেখিয়াছিলেন, মনুষ্য হইতে জম্বুক পর্য্যন্ত সকলেই তাহা চিরকাল ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই ঘটনার মূলে আপেলের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ আছে, অথবা পৃথিবীর প্রতি আপেলের অনুরাগ আছে, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না।

ফলে বৃন্তচ্যুত আপেল ফল, আপন প্রেমভরেই হউক বা মেদিনীর আকর্ষণবলেই হউক, চিরকালই মেদিনীর প্রতি ধাইতেছে। এবং শুধু আপেল ফল কেন, গগনবিহারী শশধর স্বয়ং এই আকর্ষণরজ্জুতে বাঁধা রহিয়া পৃথিবীকে ছাড়িয়া যাইতে

পারিতেছেন না, ইহাও নিউটনের অতি পূর্ব্ব হইতে মানবজাতি দেখিয়া আসিতেছে।

এইখানে আকর্ষণের কথা ও অনুরাগের কথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ নীরস পদার্থবিদ্যার কথার অবতারণ করিতে হইল, তজ্জন্য পাঠকের নিকট পূর্ব্বেই ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইলাম। অতি প্রাচীন কাল হইতে কতিপয় ব্যক্তি দেখিয়া আসিতেছিলেন যে, শুধু চাঁদ কেন, অনেকগুলি জ্যোতিষ্ক বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবীর চারিদিকে অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিনা উদ্দেশ্যে ভ্রমণশীল এই জ্যোতিষ্কগুলার সাধারণ নাম গ্রহ। রবী শনী উভয়কে ধরিয়া এইরূপ সাতটি গ্রহের অস্তিত্ব বহু দিন হইতে মনুষ্যের নিকট বিদিত ছিল।

এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, হয়ত এইরূপ নির্দ্দেশ উচিত হইল না। গ্রহগণের এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোমার জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পঁয়ত্রিশটি বিবাহ করিতে বাধ্য, ইহা অনেক ভদ্রলোকে অদ্যাপি পূর্ণ সাহসে বলিয়া থাকেন। গ্রহগণের অবস্থান মনুষ্যের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে; ইহাতে যে সন্দেহ করে, সে নির্ব্বোধ; কেন না, চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার-ভাটা কি প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে? আর ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধাতা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, এতগুলি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উদ্দেশ্য যাহাই হউক, গ্রহগুলা যে ঐরূপে পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু দেখা যায়, উহাদের পরিভ্রমণের পথ বড়ই আঁকাবাঁকা। প্রাচীনেরা অনেক চেষ্টাতেও সেই পথের জটিলতার অন্ত পান নাই। গ্রহগণের মধ্যে চন্দ্র আর সূর্য্য কতকটা সরল নিয়মে চলিয়া বেড়ান। কিন্তু অন্যান্য গ্রহ কখন কোথায় থাকেন, তাহার গণনা দুষ্কর। উঁহারা কখন ধীরে চলেন, কখন দ্রুত চলেন, কখন আবার চলিতে চলিতে পিছু হাঁটেন। যেখানে ঘুরিয়া না বেড়াইলে নিস্তার নাই, সেখানে আবার এত লুকোচুরি খেলা কেন?

হঠাৎ কোপর্নিকস বলিলেন, কি তোমাদের দৃষ্টির ভ্রম! উহাদের গতির নিয়মে এত যে জটিলতা দেখিতেছ, সে তোমাদেরই দৃষ্টির দোষে। এক বার মনোরথে চাপিয়া পৃথিবী ছাড়িয়া সূর্য্যমণ্ডলে গিয়া দাঁড়াও; দেখিবে, কেমন সুন্দর সুশৃঙ্খলায় উহারা ধীর ভাবে ও সুনিয়ত ভাবে সূর্যমণ্ডলেরই চারি দিকে ঘুরিতেছে। আর দেখিতে পাইবে, তোমার পৃথিবী, সেও স্থির নহে, সেও অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্য্যেরই চারি দিকে ভ্রমণশীল। আর চন্দ্র, একা তিনিই পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছেন।

বস্তুতঃ, সূর্য্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না; পৃথিবীই সূর্য প্রদক্ষিণ করে; এবং অন্য গ্রহেরাও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না, তাহারাও সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। তাহাদের ভ্রমণপথে বিশেষ কোন জটিলতা নাই; তাহাদের ভ্রমণে বিশেষ কোন অনিয়ম নাই। তাহারা কলুর চোখঢাকা বলদের মত অপার গাম্ভীর্য্যের সহিত চক্রপথে একই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে একই মুখে সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে। তুমি যদি সূর্য্য-মণ্ডলের অধিবাসী হইতে, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে, উহাদের গতি কেমন

সুনিয়ত। যে কেন্দ্রের চারি দিকে উহাদের পথ, তুমি স্বয়ং সে কেন্দ্রে না থাকিয়া দূরে পৃথিবীতে রহিয়াছ ও স্বয়ং পৃথিবীর সহিত ঘুরিতেছ ; তাই তোমার বোধ হইতেছে, উহাদের পথ এত আঁকাবাঁকা, উহাদের গতি এমন অনিয়ত।

কোপর্নিকসের কথাটা সকলেই দুই চারি বার মাথা নাড়িয়া অবশেষে মানিয়া লইল। ধার্য্য হইল সূর্য্যই স্থির, আর পৃথিবীই অস্থির ; সূর্য্য গ্রহ নহে ; পৃথিবীই গ্রহ। কেন না, এখন হইতে স্থির হইল যে, যাহারা সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, তাহারাই গ্রহ।

কোপর্নিকসের পর কেপ্‌লার। কেপ্‌লার দেখাইলেন, গ্রহগণ সূর্য প্রদক্ষিণ করে বটে, এবং উহাদের চলিবার পথ প্রায় বৃত্তাকার বটে, কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার নহে। একটা গোলাকার আঙটিকে দুই পাশ হইতে চাপ দিলে যেমন হয়, পথ কতকটা সেইরূপ। এইরূপ পথকে জ্যামিতি-বিদ্যায় বৃত্তাভাস বা অপবৃত্ত বলিয়া থাকে। সূর্য্য সেই প্রায় বৃত্তাকার পথের, অর্থাৎ বৃত্তাভাস পথের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত না থাকিয়া একটু পাশে অবস্থিত আছে। বৃত্তাভাস পথের যাহাকে অধিশ্রয় বলে, যাহা ঠিক মধ্যস্থানে না থাকিয়া একটু পাশ ঘেঁষিয়া থাকে, সূর্য্যের অধিষ্ঠান সেইখানে। এই জন্য প্রত্যেক গ্রহ কখন সূর্য্যের একটু কাছে থাকে, কখন বা একটু দূরে যায়। এই আমাদের পৃথিবীই শীতকালে সূর্য্যের একটু নিকটে আসে, আর গ্রীষ্মকালে একটু দূরে যায়। শীতকালে নিকটে থাকে শুনিয়া পাঠক চমকিয়া উঠিবেন না ; তাহাই ঠিক। আরও একটা কথা ; কোন গ্রহ যখন সূর্য্যের একটু কাছে থাকে, তখন একটু দ্রুত চলে, আর যখন একটু দূরে থাকে, তখন ঠিক সেই অনুপাতে একটু ধীরে চলে। কেপ্‌লার প্রত্যেক গ্রহের সম্বন্ধে কেবল এই কয়টা নূতন কথা বলিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি আরও একটা নূতন ব্যাপার দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইলেন, ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের সূর্য্য হইতে দূরত্বের সহিত উহাদের ভ্রমণকালের একটা সম্বন্ধ আছে। গ্রহগণ স্বতন্ত্রভাবে আপন আপন পথে ঘুরিতেছে বটে, কিন্তু আগে হইতে যেন একটা পরামর্শ আঁটিয়া ঘুরিতেছে। যে যত দূরে আছে, তাহাকে এক পাক ঘুরিয়া আসিতে তত অধিক সময় লাগিতেছে ; কত দূরে থাকিলে কত সময় লাগিবে, সে বিষয়েও একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম স্থির হইয়া আছে। নিয়মটা এই। মনে কর, দুইটা গ্রহকে আর খ ; খ'র দূরত্ব ক'র চারি গুণ। এখন চারিকে ত্রিঘাত করিলে চারি চারি যোল ও চারি যোলতে চৌষট্টি হয়। আর চৌষট্টির বর্গ-মূল হয় আট। এখন ক যদি ঘুরে এক বৎসরে, খ'কে ঘুরিতে হইবে আট বৎসরে। তেমনই গ-এর দূরত্ব হয় নয় গুণ, তাহা হইলে নয়কে ত্রিঘাত করিলে ৯×৯×৯=৭২৯ ; আর ৭২৯-এর বর্গ-মূল ২৭ ; তাহা হইলে ক যদি ঘুরেন এক বৎসরে, তাহা হইলে গ, যিনি নয় গুণ দূরে আছেন, তাঁহাকে ঘুরিতে হইবে ২৭ বৎসরে। বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত ছয়টা গ্রহ এইরূপে যেন পরামর্শ করিয়া যথাবিহিত সময়ে আপন আপন পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে।

কেপ্‌লার গ্রহগণের গতির সম্বন্ধে এই কয়টা নিয়ম আবিষ্কার করেন। প্রত্যেক গ্রহই বৃত্তাভাস পথে চলিতেছে, এবং সূর্য্য হইতে দূরত্বভেদে কখন বা একটু দ্রুত, কখন

বা একটু মন্দ গতিতে চলিতেছে। আর বিভিন্ন গ্রহ বিভিন্ন পথে থাকিয়াও আপন আপন দূরত্বের হিসাবে ভ্রমণকালের একটা নিয়ম স্থির করিয়া সেই হিসাবে যথাকালে চলিতেছে। এই পর্য্যন্ত হইল ঘটনা। ইহার সত্যতায় অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই; কেন না, সত্য বটে কি না, কিছু দিন ধরিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকিলেই বুঝিতে পারিবে। আপেল ফল বৃন্তচ্যুত হইলেই মাটিতে পড়ে, ইহা যেমন সত্য ঘটনা, গ্রহগণ উক্ত নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, ইহাও সেইরূপ সত্য ঘটনা।

কিন্তু উহারা ঐরূপে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন, এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। ঘুরিয়া বেড়ায়, সে ত দেখিতেছি; কিন্তু কেন বেড়ায়?

গ্রহগুলার কি এত মাথাব্যথা যে, সূর্য্যকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করিতেই হইবে? আর ঘুরিবেই যদি, ত প্রত্যেকেরই পথটা এমন কেন? আর বেড়াইবার রীতিটাই বা এমন কেন? কাছে থাকিলে একটু দ্রুত যাইতে হইবে, দূরে গেলে একটু ধীরে চলিতে হইবে; ইহার তাৎপর্য্য কি?

আবার এতগুলি গ্রহ বিভিন্ন পথে চলিতেছে, অথচ সকলে মিলিয়া ভ্রমণকালের এমন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া লইয়াছে কেন?

কেপ্‌লার এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়াছিলেন, এমন নহে। উত্তর কতকটা এইরূপ;—উহারা ঘুরে, উঁহাদের মর্জি; উঁহারা বড় লোক ও ভাল লোক, উঁহারা কি আর অসংযতভাবে অনিয়মে ঘুরিতে পারে? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন; দেবতারা কি একটা মতলব আঁটিয়া ঐরূপ খেলা খেলিতেছেন। সূর্য্যের আকর্ষণে গ্রহগণ আপন পথে বিচরণ করে জানিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা কেপ্‌লারের উত্তরে হাসিলে অনুচিত হইবে।

কেপ্‌লারের পর দেকার্ত্তে। তিনি বলিলেন, সূর্য্যমণ্ডলকে ঘেরিয়া ও সৌরজগৎ ব্যাপিয়া একটা অবিরাম ঝড় বহিতেছে। গ্রহগুলা সেই ঝড়ের মুখে ভাসিয়া যাইতেছে। এই ঝড় যত দিন না থামিবে, উহাদিগকে তত দিন এইরূপে ঘুরিতে হইবে।

দেকার্ত্তের পর নিউটন। নিউটন কেপ্‌লার-প্রদর্শিত গ্রহগণের গতির নিয়ম আলোচনা করিলেন। দেখিলেন, প্রত্যেক গ্রহ নির্দ্দিষ্ট কালে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করে। আরও দেখিলেন, যার দূরত্ব যত অধিক, তার ভ্রমণের কালও তত অধিক-দিন-ব্যাপী। দেখিলেন, এই দূরত্ব ও এই ভ্রমণকালের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। নিউটন সেই সমুদয় আলোচনা করিয়া গ্রহগণের গতির নিয়মগুলি একটি সংক্ষিপ্ত সূত্রে ফেলিলেন। সূত্রটির আকার অতি সংক্ষিপ্ত; কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত সমুদয় নিয়মগুলি সেই সংক্ষিপ্ত সূত্রের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। সেই সূত্রটির একটু আলোচনা করা যাউক।

সূত্রটি এই। প্রত্যেক গ্রহের প্রতি সূর্যের অভিমুখে একটা আকর্ষণবল রহিয়াছে; যে গ্রহের দূরত্ব যত অধিক, এই আকর্ষণ-বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প।

এই সূত্রে একটা নূতন শব্দ রহিয়াছে,—আকর্ষণ-বল। আকর্ষণ শব্দটার বিশেষ

মাহাত্ম্য নাই। বল শব্দটার তাৎপর্য্য হৃদগত করা একটু কঠিন।

বল কাহাকে বলে? বল একটা পারিভাষিক শব্দ। যাহাতে গতি উৎপাদন করে, তাহাই বল। একবার দেখিয়াছিলাম, কোন পণ্ডিত গম্ভীর ভাবে তর্ক উপস্থিত করিতেছেন, ক্রোধে হস্ত-পদাদির গতি উৎপন্ন হয়, অতএব ক্রোধ একটা বল। নিউটনের প্রেতপুরুষ তাঁহার পরিভাষার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, কি কাঁদিয়াছিলেন, বলিতে পারি না।

মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষা আবশ্যক। কিন্তু ভাষার দোষে ভাব কেমন বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়, নিউটনের দত্ত বলের সংজ্ঞার দুর্গতি দেখিলে কতক বুঝা যাইতে পারে। নিউটনের ভাষায় গতি উৎপাদন বলের কাজ; বল গতি জন্মায়। গতি জন্মায়, ইহার অর্থ কি? মনে কর, একখানা ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল, চলিতে লাগিল। উহার গতি জন্মিল। ক্রমে উহার বেগ বাড়িতে লাগিল; ষ্টেশন ছাড়িয়া প্রথম মিনিটে চলিয়াছিল আধ পোয়া, তার পর মিনিটে চলিল এক পোয়া; উহার বেগ বাড়িল; এখানেও বলিব—উহার গতি জন্মিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী যখন পুরা দমে ঘণ্টায় ষাটি মাইল বেগে চলিতেছে, তখন আর গতি জন্মিতেছে কি? না। বেগ তখন খুব অধিক, কিন্তু বেগ আর বাড়িতেছে না; গতি জন্মিলে বেগ বাড়িত। এখন উহা মিনিটে এক মাইল চলিতেছে; এ মিনিটেও এক মাইল, আবার পর-মিনিটেও এক মাইল; বেগ খুব অধিক বটে, কিন্তু সে বেগ আর বাড়িতেছে না, কাজেই এখন গতি আর নূতন করিয়া উৎপন্ন হইতেছে না। নিউটনের ভাষায় বলিতে হইবে, যতক্ষণ বেগ বাড়িতেছিল, ততক্ষণ গতি উৎপন্ন হইতেছিল, ততক্ষণ বল ছিল। যখন আর বেগ বাড়ে না, তখন আর গতি জন্মে না; তখন আর বল থাকে না। বলের কাজ গতি উৎপাদন; বলের কাজ বেগ বাড়ান।

আবার ট্রেণখানা যখন সোজা পথ ছাড়িয়া, সরল রেখা ছাড়িয়া, বাঁকা পথে কুটিল রেখায় চলে, তখনও উহাতে নিউটনের ভাষায় গতি জন্মায়। গতি ছিল এক মুখে, অন্য মুখে নূতন গতি জন্মাইয়া গতির মুখ বদলাইয়া দেয়। এ ক্ষেত্রেও নিউটনের ভাষায় বলা হয়, বলের কাজ গতি উৎপাদন; এখানেও গতি জন্মিতেছে, অতএব বল আছে।

যাঁহারা পদার্থবিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হজম করেন নাই, তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, গতি উৎপাদনের কারণ বল। গতি উৎপাদন কার্য্য, বল তাহার কারণ। গতি উৎপন্ন হয় কেন? বল আছে বলিয়া। বল না থাকিলে গতি উৎপন্ন হইত না।

কথাটা এক হিসাবে ঠিক; অন্য হিসাবে ঠিক নহে। বল না থাকিলে গতি উৎপন্ন হয় না; বলই গতি জন্মায়। ইহা ঠিক কথা। কেন না, নিউটন বলিয়াছিলেন, যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে, সেইখানেই বলিবে যে, বল আছে। যেখানে দেখিবে গতি জন্মিতেছে না, সেইখানেই বলিবে, বল নাই। কাজেই ইহা ঠিক কথা। ঠিক কথা বটে; কিন্তু তথাপি গতির উৎপাদনের কারণ বল, এরূপ বলিলে ভুল হয়। গতি উৎপাদনের কারণ কি জানি না। কারণ যাহাই হউক, বল তাহার

কারণ নহে। কেন, বুঝাইতেছি।

ঐ জন্তুটার চারি পা ও উহা হাম্বা স্বরে ডাকিতেছে। উহার সর্ব্ববাদিসম্মত নাম গরু।

এখন জিজ্ঞাস্য, ইহা গরু, এই জন্য উহা হাম্বা ডাকে? না হাম্বা ডাকে বলিয়াই উহা গরু? কোন্ প্রশ্নটা ঠিক? হাম্বাধ্বনির কারণ উহার গোত্ব, না গোত্বের কারণ হাম্বা-ধ্বনি?

ফলে উহাকে তুমি গরুই বল আর ভেড়াই বল, নামে কিছুই যায় আসে না; ও হাম্বা ডাক কিছুতেই ছাড়িবে না। উহাকে ঐরাবত নাম দিলেও হাম্বা ছাড়িয়া বৃংহিত ধ্বনি করিবে না। উহার হাম্বা ডাকই স্বভাব, উহা হাম্বাই ডাকিবে—অকাতরে ডাকিবে।

তবে যে চতুষ্পদ হাম্বা ডাকে, তাহাকে আমরা ভেড়া না বলিয়া গরু বলি; ঐরাবত না বলিয়া সুরভি বলি। যে হাম্বা ডাকে, সে গরু; ও হাম্বা ডাকে, অতএব ও গরু; ইহা বলাই ঠিক। হাম্বা-ধ্বনির কারণ গোত্ব নহে; গোত্বের কারণ হাম্বা-ধ্বনি।

ঠিক এই হিসাবে গতি উৎপাদনের কারণ বল নহে; বলের বিদ্যমানতার কারণ গতির উৎপত্তি। বল আছে, অতএব গতি জন্মিতেছে, বলা সঙ্গত নহে। গতি জন্মিতেছে দেখিলেই বলিব যে, বল আছে; ইহাই সঙ্গত। গতি উৎপাদনের নামান্তর বলের প্রয়োগ।

বৃন্তচ্যুত আপেল-ফলে পৃথিবীর মুখে গতি উৎপন্ন হয়। কেন হয়? পণ্ডিত অপণ্ডিত সমস্বরে বলেন যে, পৃথিবী বল প্রয়োগ করে; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বল আছে, এই জন্য উহা গতি পায়। আমরা বলি, উত্তরটা ঠিক হইল না। উহার ভূপতনের, ভূমিমুখে উহার গতির উৎপত্তির কারণ মাধ্যাকর্ষণ নহে। উহা কেন পড়ে, কি কারণে পড়ে, তাহা জানি না। গরুর যেমন হাম্বা-ধ্বনিই স্বভাব, তাহার তেমনই ভূপতনই স্বভাব। পতনকালে বেগ বাড়ে, তাহাই দেখিয়া আমরা বলি, উহা মধ্যাকর্ষণ-বলে ভূপতিত হইতেছে, উহা পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইতেছে।

গ্রহ সূর্য্যকে ঘুরে কেন? সূর্য্য অভিমুখে বল রহিয়াছে, এই জন্য কি? না, তাহা নহে। বল রহিয়াছে, এই জন্য ঘুরে না; ঘুরে, তাই দেখিয়া আমরা বলি, বল রহিয়াছে। একটা কথাই দুই রকম ভাষাতে ব্যক্ত করি।

হরিচরণ ভাত খাইতেছেন, অথবা অন্নের পিণ্ড ভোজন করিতেছেন। ভোজনের কারণ কি খাওয়া? অথবা খাওয়ার কারণ কি ভোজন? এ প্রশ্ন উপহাস্য। সেইরূপ পৃথিবী সূর্য্যকে ঘুরিতেছে; সূর্য্যমুখে পৃথিবীর প্রতি বল আছে বা আকর্ষণ আছে। ঘুরিবার কারণ বল, অথবা বলের কারণ ঘুরিয়া বেড়ান? এ প্রশ্নও ঠিক সেইরূপ। একটা ঘটনা দুই রকম ভাষায় বর্ণিত হইতেছে; একটা ভাষা সরল ভাষা, সাধারণ লোকের বোধগম্য প্রচলিত ভাষা; আর একটা ভাষা পণ্ডিতের ভাষা; সঙ্কেতের ভাষা; সংক্ষিপ্ত ভাষা: এই পর্য্যন্ত প্রভেদ।

পৃথিবী ঘুরে কেন? তাহার উত্তর হইল না। কেন ঘুরে, জানি না; দেখিতেছি যে ঘুরিতেছে; ঘুরিতেছে দেখিয়া বলিতেছি যে, বল আছে; সূর্য্যের মুখে গতি

জন্মিতেছে ও সূর্য্যের মুখে আকর্ষণ-বল আছে। ঘুরিতেছে কেন, বল রহিয়াছে কেন, জানি না।

কেপ্‌লার দেখিয়াছিলেন, বুধ শুক্র পৃথিবী প্রভৃতি সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সূর্য প্রদক্ষিণ করে। নিয়মটা কেপ্‌লার সহজ ভাষায়, সাধারণের বোধগম্য চলিত ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। নিউটন সেই কেপ্‌লারেরই নিয়ম অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাষায়, সাঙ্কেতিক ভাষায়, পণ্ডিতের বোধ্য ভাষায়, ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

নিয়মটা কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের একটা বাঁধা সম্বন্ধ আছে। যে সকল গ্রহ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, সকলেরই ভ্রমণ পক্ষে সেই নিয়ম। কেপ্‌লার সেই নিয়ম দেখিয়াছিলেন; নিউটনও তাহাই ভিন্ন ভাষায় সূত্রাকারে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

নিউটন আর একটু অধিক দেখিয়াছিলেন। কেপ্‌লার তাহা দেখেন নাই। গ্রহগণ যেমন সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগণে সূর্য্যের মুখে গতি জন্মিতেছে; আবার চন্দ্রেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মিতেছে। আবার আপেল-ফল ভূপতিত হয়; বৃন্তচ্যুত হইলেই উহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে উহা ভূপৃষ্ঠে উপনীত হয়; সুতরাং আপেল ফলেও পৃথিবীর মুখে গতি জন্মে। নিউটন কেপ্‌লার অপেক্ষা অনেকটা অধিক দেখিয়াছিলেন; তিনি দেখিলেন, গ্রহগণ যে বাঁধা নিয়মে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, ঠিক সেই নিয়মেই চন্দ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, আর ঠিক সেই নিয়মে আপেল-ফলও পৃথিবীর দিকে ধায় বা যায় বা চলে বা আকৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই এক নিয়ম। নিয়মটা দূরত্বের সহিত ভ্রমণকালের সম্বন্ধ লইয়া; এই সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই এক। কেপ্‌লার গ্রহগণের গতিবিধিতে যে নিয়ম, সে সম্বন্ধ দেখিতে পান, নিউটন চন্দ্রের গতিতে ও আপেল-ফলের গতিতেও নিয়ম, সেই সম্বন্ধ দেখিতে পান। এইটা নিউটনের বাহাদুরি।

নিউটন দেখিলেন, এতগুলা জড়-দ্রব্যের গতিতে, গ্রহগণের সূর্য্য-মুখ গতিতে, চন্দ্রের ও আপেল-ফলের পৃথিবীমুখ গতিতে একই নিয়ম, দেশ-কালগত একই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। নিউটন অনুমান করিলেন, সাহস করিয়া বলিলেন, তবে জড় জগতের সর্ব্বত্র জড় দ্রব্য মাত্রেরই গতিতে এই নিয়ম বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। নিউটনের অনুমানের, নিউটনের সাহসিকতার সমূলকতা পদে পদে পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত, অন্ততঃ সৌরজগতের ভিতরে, কোন জড়পিণ্ডকে এই নিয়ম অতিক্রম করিতে দেখা যায় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইল, দেখা যাক। গ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; উপগ্রহগণ গতিবিশিষ্ট; সৌরজগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী পদার্থ মাত্রই গতিবিশিষ্ট। প্রাচীনকালে কয়েক শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, এই সকল গতি অসংযত অনিয়ত বোধ হইত। কেপ্‌লারের পর ও নিউটনের পর হইতে আমরা দেখিতেছি, এই সমুদয় গতির মধ্যে একটা সুন্দর নিয়ম বিদ্যমান আছে। নিয়মটা কিরূপ, তাহা নিউটন সংক্ষিপ্ত সূত্রের আকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই অমুক দ্রব্য আজি অমুক স্থানে রহিয়াছে বলিয়া দিলে, কাল বা দুই শত বৎসর পরে তাহা কখন্ কোন্ স্থানে থাকিবে, অব্যর্থ সন্ধানে গণিয়া বলিয়া

দিতে পারি।

কিন্তু এই সম্বন্ধ কেন? এই নিয়মের অস্তিত্বের কারণ কি? গ্রহগণ, উপগ্রহগণ ও আপেল-ফল সকলেই একই নিয়মে চলাফেরা করিতেছে কেন? এ প্রশ্নের কোন উত্তর মিলিল না। পৃথিবী আপেল-ফলকে আকর্ষণ করে, তাই আপেল ফল গতি-বিশিষ্ট হয়; সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবী সূর্য্যমুখে গতিবিশিষ্ট হয়;— বলিলে চোখে ধুলা দেওয়া হয়। এই ধরণের উত্তর বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; ইহা প্রতারণা। অজ্ঞানকে জ্ঞানের সাজ দিলে যদি প্রতারণা হয়, ইহা সেইরূপ প্রতারণা। আপেল-ফল পৃথিবীর দিকে চলে, ইহা সকলেই জানে। সালঙ্কার ভাষায় বলিতে পার, কবিতার ভাষায় বলিতে পার, পৃথিবী আপেল-ফলকে আকর্ষণ করে বা আপেল-ফলকে টানে। আকর্ষণের স্থলে অনুরাগ শব্দ বসাইলে বা প্রেম শব্দ বসাইলে ভাষা আরও কবিত্বময় হইতে পারে, আরও সরস হইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধি কিছু হয় না। আপেল-ফল পড়ে, এই শাদা কথার যে অর্থ, পৃথিবী আপেলকে আকর্ষণ করে, এই সরস কথাটারও বুদ্ধিমানের নিকট সেই অর্থ। আপেল-ফল কেন পড়ে, তাহা জানি না। জানিবার উপায় আছে কি? পৃথিবী আপেল-ফলকে কোন অদৃশ্য রজ্জুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে কি? হইতে পারে; কিন্তু জানি না।

নিউটন সৌরজগতের অন্তর্ভূত দ্রব্য মাত্রেরই গতিতে একটা বিশেষ নিয়মের অস্তিত্ব দেখাইয়াছেন। নিউটন সাঙ্কেতিক ভাষায়, সংক্ষিপ্ত ভাষায় উহার বর্ণনা দিয়াছেন। একটা সংক্ষিপ্ত সূত্রের ভিতর অনেকগুলা কথা পূরিয়াছেন; একটা বিস্তৃত ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা বিবরণ মাত্র; বিবরণের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ব্যাকরণ কৌমুদীর দশটা সূত্র মুগ্ধবোধের একটা সূত্রের সমান ফল দেয়। উভয়ই বিভিন্ন ভাষায় একই ব্যাপারের বর্ণনা দেয়। চলিত ভাষায় যে বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিতে দশ পাতা কাগজ লাগে, এই দীর্ঘ প্রবন্ধে পাঠককে নির্যাতন করিয়াও যে বিবরণ সম্যক্‌ভাবে দিতে পারি নাই, নিউটনের ক্ষুদ্র সূত্রে তাহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়ম সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করাই বিজ্ঞানের কাজ। ইহাতে নির্ব্বোধের চোখে ধাঁধা লাগে, বুদ্ধিমানের পক্ষে মানসিক শ্রমের সংক্ষেপ সাধন ঘটে। নির্ব্বোধে বলে, নিউটন আপেল-ফল পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; বুদ্ধি-মানে জানেন, নিউটন দেখাইয়াছেন, আপেল-ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ উপ-গ্রহ হইতে ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড পর্য্যন্ত সেই নিয়মেই চলে। কেন চলে, নিউটন জানি-তেন না, আমরাও জানি না। নিয়ম আছে, ভাল। নিয়ম না থাকিত, হয়ত আরও ভাল হইত। অন্ততঃ এই দুর্ব্বহ মানবদেহধারণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইত।

এক না দুই ?

জগৎ এক না দুই ? এই প্রশ্নের মীমাংসা লইয়া দার্শনিকেরা বহুকাল হইতে দুই দলে বিভক্ত হইয়া আছেন। কোন কালে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। কখনও হইবে কি না সন্দেহ; বর্ত্তমান প্রবন্ধে মীমাংসার কোন উপায় হইবে, লেখকের সেরূপ অনুচিত স্পর্দ্ধা নাই; তবে পাঁচ জন পণ্ডিতে পাঁচ রকম উত্তর দিয়া থাকেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে মাত্র।

প্রথমে প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। প্রত্যক্ষ বস্তুর সংখ্যা করিয়া উঠে, মনুষ্যের মনের এরূপ শক্তি নাই। বস্তুতঃই যে সকল জ্ঞানগোচর বস্তু জগতের উপাদান, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন উপায় নাই। সংখ্যা করিতে উপস্থিত হইলেই মনুষ্যকে দিশাহারা হইতে হয়। অথচ জগৎ লইয়া যখন কারবার, তখন উহাদের সহিত একরকম পরিচয় না রাখিলেও চলে না। প্রত্যেকের সহিত পৃথক্ করিয়া পরিচয় যেখানে অসম্ভব, সেখানে বাধ্য হইয়া শ্রেণিবিভাগের ব্যবস্থা করিতে হয়। গোটাকতক লক্ষণ ধরিয়া সেই লক্ষণের হিসাবে সকলকে শ্রেণিবদ্ধ করিতে হয়। এইরূপে সংখ্যাতীত বস্তু অল্পসংখ্যক শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট হয়। আবার পঞ্চাশটা শ্রেণীকে কোন একটা বিশেষ লক্ষণ করিয়া আর একটা বৃহত্তর শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে হয়। এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞানগোচর সমুদয় পদার্থ ই স্থান লাভ করে। এই শ্রেণীর কয়টাব লক্ষণ মনে করিয়া রাখিতে পারিলে সমস্ত জগৎটারই একরকম পরিচয় জানা হয়। এইরূপে মানসিক পরিশ্রমের লাঘব ঘটে; এবং দুরন্ত জীবন-সমরে কোনরূপে মানসিক শ্রমের লাঘব ঘটিলেই তজ্জাত আরাম ও আনন্দ স্বতই উপস্থিত হয়। এই জন্য মনুষ্যের মন অসংখ্যককে অল্পসংখ্যক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিবার জন্য, জাগতিক পদার্থনিচয়কে কয়েকটা পরিচিত শ্রেণীর মধ্যে আনিবার জন্য ব্যাকুল।

এইরূপে মানসিক শ্রম সংক্ষেপ করিবার চেষ্টা বহু কাল হইতে দেখা যাইতেছে। যাবতীয় পদার্থকে শেষ পর্য্যন্ত গোটাকতক শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে। সেই শ্রেণীর সংখ্যা যতই অল্প হয়, ততই সুবিধা। এখন প্রশ্ন এই, কোথায় থামিবে ? দশে, না পাঁচে, না দুইয়ে, না একে ? কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে। সমস্ত জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; সেই দুইটার মধ্যে আর কোন সাধারণ লক্ষণ, কোন সমানতা বা সমান্য দেখা যায় না; উহারা পরস্পর এত ভিন্ন যে, উহাদিগকে আর একের ভিতর, এক পর্য্যায়ের ভিতর আনা চলে না। আবার কেহ কেহ বলেন, দুইয়ে থামিব কেন ? একটু অভিনিবেশ করিলে সেই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য, সামান্য বা সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব বাহির করা যাইতে পারে। সুতরাং দুইকেও টানিয়া একের ভিতর ফেলিতে পারা যায়।

এইরূপে দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বিষম কোলাহল করেন। কেহ বলেন দুই; কেহ বলেন এক। কোলাহল তীব্র ও কর্ণভেদী। কখনও ইহার নিবৃত্তি হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

কথা হইতেছে জ্ঞানগোচর পদার্থ লইয়া; জগতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপকরণ লইয়া। জগতের উপকরণ কি? জগতের উপকরণ সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র জলবায়ু রূপরস সুখদুঃখ রাগদ্বেষ ইত্যাদি। এই সকলই জগতের অন্তর্গত। সূর্য্যচন্দ্রাদিও যেমন জগতে বর্ত্তমান, রূপরসাদি বা হর্ষবিষাদাদিও তেমনই জগতে বর্ত্তমান। সকলই আমাদের জ্ঞানের গোচর বা অনুভবগম্য। এ সকলকে লইয়াই এই বিশাল বিচিত্র জগৎ।

প্রথম দৃষ্টিতেই এই সকল পদার্থের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পার্থক্য আসিয়া পড়ে, যাহা ধরিয়া দুইটা জাতির মধ্যে সবগুলিকে ফেলা চলিতে পারে। চন্দ্রসূর্য্য হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত একজাতীয় সামগ্রী; অনেক প্রভেদ থাকিলেও একটা সাদৃশ্য লইয়া ইহারা জ্ঞানগোচর হয়। আর সুখদুঃখ রাগদ্বেষ ইহাদের হইতে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন-প্রকৃতির পদার্থ; উহারা যেন আর একটা স্বতন্ত্র জগতের অন্তর্গত।

জগতের পানে চাহিবা মাত্র প্রথম দৃষ্টিতেই দুই শ্রেণীর পদার্থ দেখা দেয়। এক শ্রেণীর পদার্থকে আমরা জড় পদার্থ ও অন্য শ্রেণীর পদার্থকে চিৎপদার্থ অভিধান দিই। জড় যেন চেতনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, উভয়ের মধ্যে কোন মিল নাই, কোন সাদৃশ্য নাই। জগৎ যেন দুইটা—একটা জড় জগৎ, একটা চিৎ-জগৎ বা মনোজগৎ। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়, তাহা একটু তলাইয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথমেই দেখা যায়, জড় জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর জগৎ; অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি কতিপয় শারীরিক যন্ত্রযোগে আমরা জড় জগতের সহিত কারবার চালাইয়া থাকি। এই সকল যন্ত্রগুলিকে আমরা ইন্দ্রিয় আখ্যা দিয়া থাকি, এবং আমরা জানি, এই ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের জড়জগৎ সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া সমুদয় জ্ঞান আমাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রোধ করিয়া দিলে ঐ জগতের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিজের শরীরটাও ঠিক এই অর্থে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, অতএব জড় জগতের অন্তর্বর্ত্তী। কিন্তু চন্দ্রসূর্য্যকে ও জলবায়ুকে যেমন ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ বলা যায়, রাগদ্বেষ হর্ষবিষাদ প্রভৃতি পদার্থকে তেমন ইন্দ্রিয়গোচর বলা যায় না। চন্দ্রসূর্য্য ও জলবায়ু রূপরসাদিযুক্ত; আর আমার রাগদ্বেষ হর্ষবিষাদাদি রূপরসাদি-বর্জ্জিত; সুতরাং তাহারা জড় জগতের অন্তর্ভূত নহে।

এখানেই একটা খট্‌কা আসিয়া উপস্থিত হয়। এমন পদার্থ কি থাকিতে পারে না, যাহা রূপরসাদিবর্জ্জিত, অথচ জড় পদার্থের মধ্যে গণ্য? আজকালকার পণ্ডিতেরা আকাশ বা ঈথর নামে একটা জড় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে, তাহা রূপ-রস-গন্ধাদি-বর্জ্জিত; তবে কি সেই আকাশকে জড় পদার্থ না বলিয়া চিৎপদার্থের মধ্যে ফেলিব, না তাহার জন্য না-জড় না-চিৎ একটা মাঝামাঝি তৃতীয় জগতের কল্পনা করিব?

ইহার উত্তর এই। এই ঈথর বা আকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ নহে; কিন্তু ইহাতে বিবিধ গতি উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ। যেমন স্থির বায়ু আমাদের স্পর্শগোচর হয় না, কিন্তু চলন্ত বায়ু আমাদের স্পর্শবোধ জন্মায়; সেইরূপ স্থির

আকাশই আমাদের অনুভবগম্য নহে, কিন্তু আকাশে যে নানাবিধ গতি উৎপন্ন হইতেছে, তাহার অনেকেই আমাদের অনুভবগম্য। আকাশে যে সব ছোট ছোট ঢেউ উঠে, তাহা আমাদের দৃষ্টিজ্ঞানের একমাত্র অবলম্বন ; সেই ঢেউগুলি আমরা দেখি না, কিন্তু ঢেউগুলির ধাক্কা চোখে না পড়িলে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে না ; প্রকৃতপক্ষে ঢেউগুলির ধাক্কা অনুভবের নামই দৃষ্টি। বস্তুতঃ কোন জড় পদার্থ ই সাক্ষাৎ সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গোচর নহে ; উহাদের গতি, উহাদের প্রবাহ, উহাদের কম্পন আন্দোলন ঘূর্ণন প্রভৃতিই আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর। আমাদের ক্ষিতি জল মরুৎ প্রভৃতিকেও অনুভব করি না ; উহাদের ধাক্কা অনুভব করি ; সেইরূপ আকাশকে অনুভব করি না, কিন্তু আকাশের ধাক্কা অনুভব করি। সুতরাং ক্ষিতি জল মরুৎ যদি জড় পদার্থ হয়, আকাশ বা ঈথরও সেই অর্থে জড় পদার্থ। কোন জড় পদার্থ ই মুখ্যতঃ আমাদের প্রত্যক্ষ হয় না, প্রত্যক্ষ হয় গতি ; জড় পদার্থ একটা অনুমান মাত্র।

সুতরাং জড় পদার্থ ছাড়িয়া আর একটা নূতন পদার্থ জগতে উপস্থিত হইল, ইহার নাম গতিপদার্থ। জড়পদার্থে ও গতিপদার্থে সম্বন্ধ কি ? যত দূর দেখা যায়, এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। গতিহীন জড় পদার্থ আছে কি না, আমরা জানি না। থাকিলেও বর্ত্তমান কালে তাহার আলোচনা মস্তিষ্কের নিষ্ফল ক্লেশ মাত্র। সেরূপ জড় পদার্থ কোন কালে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবে না বা জ্ঞানগোচর হইবে না। তাহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে; তাহার আলোচনা নিষ্ফল।

গতি ছাড়িয়া জড় নাই ; জড় ছাড়িয়াও গতি নাই। জড়কে আশ্রয় করিয়াই গতি। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গতির সহিত, গৌণতঃ জড়ের সহিত। যদি একটা জড় জগৎ মানিতে হয়, তবে একটা গতিজগৎ মানিব না কেন ?

জড়ের সহিত গতির নিত্য সম্বন্ধ। যাহা জড়, তাহাই গতিশীল, অথবা যাহা গতিশীল, তাহাই জড়, এইরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

জড়ের সহিত গতির এই সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া জড়ের একটা লক্ষণ পাওয়া যায়। জড় কি ? না, যাহা গতিশীল। গতি কি ? না, স্থানপরিবর্ত্তন। অমুক দ্রব্য গতিশীল অর্থাৎ কি না, উহা এই ক্ষণে এখানে ছিল, পরক্ষণে ওখানে গেল। এই এই ক্ষণ আর পর-ক্ষণ, এখানে আর ওখানে, ইহার মধ্যে দুইটা পরিবর্ত্তনের উল্লেখ দেখা যায়। একটা পরিবর্ত্তনকে আমরা কালগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি, আর একটাকে দেশগত পরিবর্ত্তন বলিয়া থাকি। কাল ব্যাপিয়া দেশগত যে পরিবর্ত্তন, তাহারই নাম গতি। আমরা জড় দ্রব্য অনুভব করি না, আমরা উহার গতির অনুভব করিয়া থাকি। গতির অনুভব কি ? না একটা পরিবর্ত্তনের অনুভব। পরিবর্ত্তনটা কিরূপ ? ইহা বাক্য দ্বারা ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না, মনে মনে বুঝিয়া থাকি। আমিও বুঝি, তুমিও বুঝ। তবে এই পরিবর্ত্তনের একটা নাম দেওয়া যায়। সেই নামোল্লেখেই তুমি বুঝিতে পারিবে, পরিবর্ত্তনটা কিরূপ। একটা পরিবর্ত্তন দেশগত ; যথা উহা, এখানে ছিল, ওখানে গেল। আর একটা পরিবর্ত্তন কালগত ; এখানে ছিল তখন ; ওখানে আসিয়াছে এখন। দুইটা পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। দেশের পরিবর্ত্তন কালের সহব্যাপী। একই ক্ষণে একই দ্রব্যের বিভিন্ন

দেশে অবস্থিতি কল্পনায় আসে না। এখানে ছিল, ওখানে গেল ; উভয় ঘটনার মধ্যে কালের ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। তাই কালক্রমে দেশ-গত পরিবর্ত্তন, ইহাই গতি। এই গতি জড় পদার্থের প্রধান লক্ষণ ; কেন না, গতি ছাড়িয়া জড় নাই ; গতিহীন জড় জ্ঞানগম্য নহে। দেশব্যাপ্তি ও কালব্যাপ্তি জড়ের লক্ষণ ; জড় দেশ ব্যাপিয়া আছে ও কাল ব্যাপিয়া আছে ; এখানে আছে, আবার হয়ত ওখানে যাইবে ; এই ক্ষণে আছে, আবার পরক্ষণে যাইবে। এই দ্বিবিধ ব্যাপ্তিকে জড়ের লক্ষণ বলিয়া থাকি। আর এই দ্বিবিধ-ব্যাপ্তি-গত যে পরিবর্ত্তন আমরা অনুভব করি, তাহাকেই আমরা গতি আখ্যা দিই।

সুতরাং আমাদের জ্ঞানগোচর জগতের একাংশ জড় জগৎ ও গতিজগৎ। কেহ কেহ জড় জগৎ ও গতিজগৎ না বলিয়া হয়ত জড় জগৎ বা গতিজগৎ বলিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, গতিই জড়, গতি ভিন্ন জড়ের আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। সে তর্কে এখন কাজ নাই। কিন্তু বিশ্বজগতের আর একটা বৃহৎ অংশ আছে, তাহা এই জড় জগতের বা গতি জগতের অন্তর্ভুক্ত নহে। আমার আশা, আমার ভয়, আমার হর্ষ ও আমার বিষাদ, আমার স্বাস্থ্য ও বেদনা, সম্পূর্ণ জ্ঞানগোচর সামগ্রী। বরং চন্দ্র-সূর্য ক্ষিত্যপ্‌তেজ ছাড়িয়া আমি দুই দণ্ড থাকিতে পারি, কিন্তু ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমার এক পা চলিবার সামর্থ্য নাই। স্বপ্নকালে যখন চন্দ্রসূর্য ক্ষিত্যপ্‌তেজ অজ্ঞানে লীন হইয়া যায়, তখনও হর্ষবিষাদ আশাভয় বেদনা ও বাসনার ছায়া আমার সম্মুখে নৃত্য করে। ইহারা অস্তিত্ববান্ ; কিন্তু ইহারাও কি জড় পদার্থ? ইহাদের গতি আমরা বুঝি না ; ইহাদের দেশব্যাপ্তি আমাদের ধারণায় আইসে না। ইহাদের রূপ নাই, রস নাই, গন্ধস্পর্শও নাই ; সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আকার আয়তন স্থিতি গতিও নাই। মোটা কথায় ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, অথচ কালব্যাপ্তি আছে। ভয় এই ছিল, এই নাই ; আশা তখনও ছিল, এখন আর নাই ; বাসনা লুপ্ত হইয়াছে ; স্মৃতি ক্রমে বিস্মৃতিতে ডুবিতেছে। ইহাদের দেশব্যাপ্তি নাই, কিন্তু কালব্যাপ্তি আছে। সুতরাং দেশ-কাল-ব্যাপ্ত গতিশীল জড় জগৎ ছাড়া কালব্যাপ্তিমাত্র-বিশিষ্ট গতিহীন আর একটা চিৎ-জগৎ বা মনোজগৎ আছে।

সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের উত্তর হইল, জগৎ দুইটা, অথবা জ্ঞানগম্য বিশ্বজগতের দুইটা ভাগ ; একটা জড় জগৎ গতিজগৎ বা বাহ্য জগৎ ; দেশকালব্যাপ্তি ইহার মুখ্য লক্ষণ ; রূপরসগন্ধস্পর্শাদি ইহার গৌণ লক্ষণ ; অথবা রূপরসাদি উল্লিখিত গতির ইন্দ্রিয়লব্ধ ফল। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় জগৎ বর্ত্তমান,—মনোজগৎ চিৎজগৎ বা অন্তর্জগৎ ; কেবল কালব্যাপ্তি ইহার লক্ষণ। ইহাতে দেশব্যাপকতা নাই, আছে কেবল কালব্যাপকতা ; ইহার অন্যান্য ধর্ম্ম ভাষায় প্রকাশ্য নহে, তবে অনুভবগম্য বটে।

সুতরাং জগৎ দুইটা ; অথবা একই জগতের দুইটি স্বতন্ত্র ভাগ। এই হল এক দলের উক্তি। এই দুই ভাগকে আর মিলাইয়া একটা মাত্র ভাগের মধ্যে ফেলিবার উপায় নাই। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে, কিন্তু সাদৃশ্য নাই ; ইহারা স্বভাবতঃ পৃথক্। এই হইল এক দল পণ্ডিতের মত।

এইখানে জড়বাদী আসিয়া দাঁড়ান। তিনি জড়বাদী, কিন্তু তিনি এক বই দুই মানেন

না। তিনি বলেন, জড় জগৎই একমাত্র জগৎ। গতি জড়ের ধর্ম্ম। গতির বিভিন্ন মূর্ত্তি। কখন স্রোত, কখন ঢেউ, কখন ঘূর্ণি। গতির বিবিধ মূর্ত্তি অনুসারে তাড়িত ক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া, আলোক-ক্রিয়া, রাসায়নিক ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়া, প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যের শরীর জড় পদার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যের শরীর জীবন্ত পদার্থ। জীবন কি? নানাবিধ গতির সমষ্টি মাত্র। জীবনে গতির ব্যাপার জটিল বটে; এত জটিল যে, ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু কোন গতিই বা বুঝি? আতা-ফল মাটিতে পড়ে; কেন পড়ে, বুঝি কি? অম্লজানকণিকা উদজানকণিকার প্রতি ধাবিত হয়; কেন হয়, কেহ বলিতে পারে কি? অঙ্গারকণিকা ও উদজানকণিকা আর পাঁচটা কণিকার সহিত যুক্ত হইয়া বিচিত্র জীবনক্রিয়ার উৎপাদন করে; ইহা অধিক আশ্চর্য্য হইল কিসে?

ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। মনুষ্য-শরীরের সমস্ত ভাগে ও প্রত্যেক অংশে যে জীবন-ক্রিয়ার বিকাশ দেখি, জীবনের মূল পদার্থ প্রোটোপ্লাজমে তাহাই দেখিতে পাই। সর্ব্বত্রই জীবন-ক্রিয়া সজাতীয়। শর্করাদ্রব্যে মিছরির দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়; বায়ুমধ্যে চারা গাছ বড় গাছে পরিণত হয়; উভয় ঘটনা সমান জটিল না হউক, বিভিন্ন-জাতীয়, তাহা কে বলিল? অভিব্যক্তিবাদ কে না মানে? যে আজিও মানে না, সে মূর্খ। নির্জ্জীবে ও সজীবে প্রকৃতিগত কোন বিভেদ আছে, ইহা স্বীকার করিলে অভিব্যক্তিবাদ উণ্টাইয়া যাইবে।

আর একটা কথা। জীবন জড়ধর্ম্ম হউক, ক্ষতি নাই; কিন্তু চেতনা কি? সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, এ সকল কি?

জড়বাদীর উত্তর,—মনুষ্যের শরীর জড় পদার্থ, আর মস্তিষ্ক মনুষ্য-শরীরের অন্তর্গত জড় পদার্থ। যেখানে মস্তিষ্ক, সেইখানেই সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ। যেখানে মস্তিষ্ক নাই, সেখানে উহাদের অস্তিত্ব নাই। অঙ্গারকণিকা গতিযুক্ত হইলে তাপ জন্মে, মস্তিষ্ক-কণিকা যুক্ত হইলে হর্ষবিষাদের উৎপত্তি হয়। অতএব হর্ষবিষাদ একরূপ গতি, অথবা জড় পদার্থের গতিবিশেষে উৎপন্ন জড়ধর্ম্ম।

জড়বাদী বলেন,—অন্তর্জ্জগৎ বা মনোজগৎ বলিয়া এতটা স্বতন্ত্র জগৎ কল্পনা করিবার দরকার নাই। মস্তিষ্কের আশ্রয় ব্যতীত চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ব কোথাও দেখা যায় নাই। মস্তিষ্কহীনের চেতনা নাই। ফস্‌ফরস যেমন আলোক উদ্গিরণ করে, খেজুর-রসে যেমন মাদকতা জন্মে, মস্তিষ্ক পদার্থ সেইরূপ চেতনা উদ্গিরণ করে। উভয়ের মূলে জড় ও জড়ের গতি।

এই হইল বিশুদ্ধ জড়বাদীর মত। জগৎ একটা, উহা জড় জগৎ, গতি উহার ধর্ম্ম। গতির ফলে বিবিধ ঘটনা,—তাড়িত, চৌম্বক, রাসায়নিক, জৈব, মানসিক। জড়-বাদীরা সকলেই আবার একত্ববাদী নহেন; কেহ কেহ জড়কে ও গতিকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলেন। জড় একরূপ পদার্থ; গতি অন্যরূপ পদার্থ; একে অন্যের আশ্রয়স্বরূপ; কিন্তু উভয়ে বিভিন্নজাতীয় পদার্থ।

আধুনিক পদার্থবিদ্যা আসিয়া আর একটা নূতন কথা বলে। পদার্থবিদ্যা প্রায় একশত বৎসর হইল সপ্রমাণ করিয়াছে—জড় পদার্থের সৃষ্টিও নাই, ধ্বংসও নাই। আবার

প্রায় অর্দ্ধ শত বৎসর হইল, বৈজ্ঞানিকেরা শক্তি নামক একটা পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে, এই শক্তিরও সৃষ্টি নাই, ধ্বংসও নাই। এই শক্তি-পদার্থ টা কি, তাহা যিনি পদার্থবিদ্যা অনুশীলন করেন নাই, তাঁহাকে বুঝান কঠিন। গতির ফল শক্তি সন্দেহ নাই ; কিন্তু গতি আর শক্তি ঠিক এক পদার্থ নহে। গতির শাস্ত্রসম্মত ইংরেজী নাম motion ; শক্তির শাস্ত্রসম্মত নাম energy। আবার পদার্থ-বিদ্যা শাস্ত্রে বল নামে আর একটা শব্দ পাওয়া যায়, তাহার ইংরেজী নাম force। দর্শনশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতেরা পদার্থবিদ্যা-শাস্ত্রের motion, energy ও force বা গতি শক্তি ও বল, এই তিনটাকে লইয়া মহা গোলযোগ বাধাইয়া ফেলেন। বড় বড় পণ্ডিতের রচিত দার্শনিক গ্রন্থে দেখা যায়, force এবং energy, এই দুই শব্দ একার্থে প্রযুক্ত হইতেছে, এবং একের সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য, অপরের প্রতি তাহার প্রয়োগ হইতেছে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে বস্তুতই ফেলান হয়। বেইন এবং স্পেন্সারের মত পণ্ডিতেও এখানে গোলযোগ বাধাইয়াছেন। পদার্থবিদ্যোক্ত বল ও পদার্থবিদ্যোক্ত শক্তি এক পদার্থ নহে। শক্তির যে হিসাবে অস্তিত্ব আছে, বলের সে হিসাবে অস্তিত্ব নাই। বলের বেচাকেনা হয় না, কিন্তু শক্তির বেচাকেনা চলে ; শক্তি ঠিক জড় পদার্থের মতই খরচ করা চলে বা মজুত রাখা চলে। জড় পদার্থের যেরূপ ধ্বংস নাই, শক্তিরও সেইরূপ ধ্বংস নাই ; অথচ শক্তি জড় পদার্থ নহে ; জড় পদার্থ ইহার অবলম্বন মাত্র। শক্তি এক জড় দ্রব্য হইতে অন্য জড় দ্রব্যে যায়। যখন এক দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্যে যায়, তখন গতি উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ বল বলিয়া কোন বস্তু নাই ; বস্তু যদি থাকে তাহা শক্তি। আমরা যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করি, তাহাও শক্তি। শক্তি যখন বহিঃস্থ জড় দ্রব্য হইতে আসিয়া আমাদের শরীরে, আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবেশ করে, তখনই আমরা রূপরসগন্ধাদিরূপে সেই জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করি।

পদার্থবিদ্যার মতে জড় ও শক্তি উভয়ই অবিনাশী নিত্যপদার্থ। ইহাদের সৃষ্টিও আমরা দেখি না, ধ্বংসও আমরা দেখি না। জড়বাদী যাবতীয় পদার্থকে এই দুই কোঠায় ফেলিতে চাহেন। জগতের দুইটা ভাগ ; একটা ভাগ জড়, আর একটা ভাগ শক্তি ; তৃতীয় ভাগের কল্পনার প্রয়োজন নাই। শক্তিযোগে জড় পদার্থে গতি উৎপন্ন হয়। সেই সমুদয় জাগতিক ক্রিয়ার মূল।

একটু সূক্ষ্ম হিসাব করিলে এই মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি আসিয়া দাঁড়ায়। সেই আপত্তির সম্মুখে জড়বাদ ও তদনুযায়ী গতিবাদ বা শক্তিবাদ সমূলে ধ্বংস পায়। প্রথম কথা এই। জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। ধ্বংস নাই কে বলিল? আমাদের দর্শনশাস্ত্রে একটা কথা আছে যে, অভাব হইতে ভাব অথবা ভাব হইতে অভাব জন্মে না। হার্বার্ট স্পেন্সার সেই কথাটা ঘুরাইয়া বলেন, জড়ের ধ্বংস বা শক্তির ধ্বংস আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না ; অতএব জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই। হার্বার্ট স্পেন্সার কল্পনায় আনিতে পারেন না ; কিন্তু দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লাবোয়াশিয়ের পূর্ব্বে, জড়ের ধ্বংস সকলেরই কল্পনায় আসিত ; এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শত বৎসর পূর্ব্বে, হেলম্‌হোলৎজের পূর্ব্বে,

শক্তির ধ্বংসও সকলেরই কল্পনায় আসিত। জড়ের অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য লাবোয়াশিয়ের এবং শক্তির অনশ্বরতা প্রতিপাদনের জন্য হেলম্‌হোলৎজের জন্মগ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল। এমন কি, যে হার্বার্ট স্পেন্সার শক্তির নশ্বরতা কল্পনায় আনিতে পারেন না, তিনিই স্বরচিত First Principles নামক বিখ্যাত গ্রন্থে পদার্থবিদ্যাবিদের Conservation of Energyর সহিত স্বকপোলকল্পিত Persistence of Forceকে এমনভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে, আধুনিক শক্তি-তত্ত্বের তাৎপর্য্যই তাঁহার কত দূর হৃদ্গত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় জন্মে। এই জন্য তাঁহাকে পদার্থবিদ্যাবিদের অনেক বিদ্রূপ সহিতে হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে জড়ের ধ্বংস নাই ও শক্তির ধ্বংস নাই, ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে, আমাদের ভূয়োদর্শন হইতে আমরা জানিয়াছি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা কত দিনের? আমাদের ভূয়োদৃষ্টি কত দূর ব্যাপিয়া আছে? বিশাল জগতের অতি সঙ্কীর্ণ প্রদেশ যে কয়টা দিন ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি, সেই অকিঞ্চিতকর অভিজ্ঞতা লইয়া অত লম্বা কথাটা বলিয়া ফেলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। জড় অনশ্বর, শক্তি অনশ্বর —সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনশ্বর, ইহা বলিবার আমাদের কোনই অধিকার নাই। কালই এমন একটা নূতন প্রদেশের আবিষ্কার হইতে পারে, যেখানে জড় পদার্থের অহরহঃ সৃষ্টি হইতেছে, অথবা শক্তির অহরহঃ সংহার হইতেছে। হার্বার্ট স্পেন্সার জড়ের ও শক্তির সৃষ্টি ও ধ্বংস কল্পনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু যাঁহারা আধুনিক পদার্থবিদ্যার সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, এখানকার অনেক বৈজ্ঞানিক অক্লেশে উভয়ের সৃষ্টি ও ধ্বংস কল্পনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় আপত্তি,—জড় কোথায়? জড়বাদী বলিয়া থাকেন, জড় শক্তির আশ্রয়। কিন্তু জড় শক্তির আশ্রয় তাহার প্রমাণ কি? শক্তি ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে; তখন আমাদের রূপরস-স্পর্শাদি প্রতীতির উৎপত্তি হয়। শক্তির সঞ্চারে গতি উৎপন্ন হয়। শক্তি লইয়া আমাদের কারবার; শক্তি আমাদের অনুভবগোচর; শক্তি সঞ্চারের ফলে যে গতি, সেই গতিই আমাদের জ্ঞান-গম্য। আলোক তাপ শব্দ প্রভৃতি শক্তির প্রকারভেদ; ইহাই আমাদের জ্ঞানগম্য। ইহাদিগকে আমরা জানি; ইহাদিগকে ছাড়িয়া অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব আমরা কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু তাহা কল্পনা মাত্র। জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। শক্তির সহিতই আমাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক। শক্তিময় জগৎ। শক্তি আমাদের প্রত্যক্ষ, শক্তিই বাহ্য জগতের প্রত্যক্ষ উপাদান। পদার্থবিদ্যা শক্তিরই আনাগোনার আলোচনা করে: কাল্পনিক জড়ের সহিত আধুনিক পদার্থবিদ্যার কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। জড়ের উল্লেখ মাত্র না করিয়া সমস্ত পদার্থবিদ্যার আলোচনা আজকাল সম্ভব নহে।

যাঁহারা বিচারসংস্কৃত দার্শনিক বুদ্ধি দ্বারা আধুনিক পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, জগতের মধ্যে গতিবিধির ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার জন্য জড় পদার্থ নামক একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিষের কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই। তবে পদার্থবিদ্যার মধ্যে জড়ের যে উল্লেখ দেখা যায়, উহা গণিতবিদ্‌গণের

কল্পিত একটা সংজ্ঞা মাত্র; উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণহীন। জড়ের অস্তিত্ব কল্পনা মাত্র হইলে জড়বাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে।

জড়বাদ ভিত্তিশূন্য হইলেও শক্তিবাদ থাকিয়া যায়। জড় অস্তিত্বহীন হইলেও শক্তির অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু আর একটা সূক্ষ্ম হিসাব করিলে দেখা যায়, শক্তিই বা কোথায়? আলোক তাপ শব্দ প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট দৃষ্টি স্পর্শ ও শ্রুতি মাত্র; আমরা যে ব্যাপারকে শক্তির আনাগোনা আখ্যা দিয়া থাকি, তাহা কেবল আমাদের কতকগুলি প্রতীতির উৎপত্তি ও বিলয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই প্রত্যয়গুলিই আমাদের প্রত্যক্ষ; প্রত্যয়ের মূলে প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা আমাদের অনুমান, তাহা আমাদের মানসিক ব্যায়াম, তাহা আমাদের বুদ্ধির খেলা। জড় যেমন কল্পিত পদার্থ, শক্তিও সেইরূপ কল্পিত পদার্থ। বাহ্য জগৎই একটা কল্পনা।

এই শেষোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে উত্তর আমি কোথাও দেখি নাই। উত্তর দিবার চেষ্টা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কিন্তু সে কেবল ছেলেখেলা। কিন্তু ইহা মানিলে শক্তিবাদ বা জড়বাদ অমূলক হয়। আত্মবাদ বা চেতনাবাদ থাকিয়া যায়। জড়বাদের সহিত ইহার প্রকৃতিকগত বিরোধ।

যাঁহারা এই প্রকৃতিগত বিরোধের সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ বলেন। জগৎ প্রকৃতই দুইটা। একটা বাহ্য জগৎ, একটা অন্তর্জগৎ। এই উভয় জগৎই আমার পরিচিত বটে; কিন্তু আমার পরিচয় বস্তুতঃ উভয় জগতের বাহ্য মূর্ত্তির সহিত; উহার অভ্যন্তরের প্রকৃত স্বরূপ কখন আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় না। একটা কিছু আমার বাহিরে বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত রূপ আমার জানিবার কোন উপায় নাই। তাহা একটা বাহ্য মূর্ত্তি লইয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হয়; সেই মূর্ত্তিকেই আমরা জড় জগৎ বলিয়া থাকি। যেটা উহার আসল স্বরূপ, সেটা আমাদের অগোচর, সেটা আমাদের অজ্ঞেয়।

আর জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র আর একটা অন্তর্জগৎ আছে, উহা বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ না হইলেও অতিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ। উহা জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র; অথচ জড় জগতের সহিত উহার অত্যন্ত সম্বন্ধ আছে। এই অন্তর্জগতেরও প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না; উহার বাহিরের মূর্ত্তিটার সহিতই আমাদের পরিচয়।

ইহারা বলেন, বাহ্য জগতের মূলে একটা কিছু আছে, যাহার স্বরূপ অজ্ঞেয়; তাহার নাম জড়। অন্তর্জগতের মূলেও অজ্ঞেয়স্বরূপ একটা কিছু বর্ত্তমান আছে; তাহার নাম চিৎ। আমরা চিৎপদার্থের অস্তিত্ব লোপ করিতে চাহি না; জড়ের অস্তিত্বও তোমরা যেন অপলাপের চেষ্টা করিও না। এত বড় বাহ্য জগৎ, ইহাকে একেবারে উড়াইলে চলিবে কেন? বস্তুতঃ উভয়ই বর্ত্তমান; উভয়ের মধ্যে ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ। চিৎ ভোক্তা, জড় ভোগ্য। সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের ইহাই বোধ হয় পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্যা; আর পুরুষের প্রকৃতিভোগ ব্যাপার লইয়াই জড় জগতের সহিত অন্তর্জগতের কারবার, এই দেনালেনা, আনাগোনা। পুরুষ অজ্ঞেয়, প্রকৃতিও অজ্ঞেয়। তবে প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখীন হইলে জড় জগৎ তাহার

প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি লইয়া অন্তর্জ্জগতের নিকট দণ্ডায়মান হয়। কেন দণ্ডায়মান হয়, কেন এমন দেখায়, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল সাংখ্যদর্শনের এই মতের অতি বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

এই দ্বৈতবাদকে মাজিয়া ঘষিয়া একরকমের অদ্বয়বাদে পরিণত করা না চলে' এমন নহে। জগৎ একটাই; একেরই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি। একটা মূর্ত্তি বাহ্য জগৎ, দ্বিতীয় মূর্ত্তি অন্তর্জগৎ। এই সত্তার এক রূপ জড়, অন্য রূপ চিৎ। একটা বক্ররেখার যেমন এক পিঠ কুব্জ, অন্য পিঠ ন্যুব্জ, এক পার্শ্ব হইতে দেখিলে একরূপ দেখায়, অন্য পার্শ্ব হইতে অন্যরূপ দেখায়, কতকটা সেইরূপ। উভয়ের এই সম্বন্ধ প্রকৃতিগত; এ সম্বন্ধ আকস্মিক, আগন্তুক সম্বন্ধ নহে। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই। জড় ছাড়া চিৎ নাই; আবার অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে বলিতে হইবে, চিৎ ছাড়াও জড় নাই; মনুষ্য হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত যদি চেতন হয়, তবে অঙ্গার-কণা ও জলকণাও কেন চেতনাহীন হইবে? কেন না, অঙ্গার-কণা ও জলকণা লইয়াই ত কীটাণুদেহ ও মনুষ্যদেহ নির্ম্মিত; প্রকৃতিগত বিভেদ কিছুই নাই। অঙ্গার-কণাকে চেতনাযুক্ত বলিতে আপত্তি করিও না; চেতনা শব্দের প্রয়োগে যদি সঙ্কোচ বোধ হয়, চিৎপদার্থ অথবা এইরূপ আর একটা নাম ব্যবহার করিলে সে আপত্তি কাটিয়া যাইবে। ফলে যেমন পূর্ব্ব থাকিলেই পশ্চিম থাকিবে, ঊর্দ্ধ থাকিলেই অধঃ থাকিবে, সেইরূপ জড় থাকিলেই চিৎ থাকিবে। আধুনিক দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা পদার্থতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ বিশিষ্টাদ্বয়বাদের পক্ষপাতী। উদাহরণ হার্বার্ট স্পেন্সার ও লয়েড মরগান।

জড় জগতের তরফে এই ভাবে ওকালতি আরম্ভ করিলে উহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে অত্যন্ত নির্দ্দয় বিচারকেরও মায়া জন্মিতে পারে। কিন্তু তথাপি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ-নামধেয় আমার প্রত্যয় কয়েকটা ছাড়িয়া দিলে, এই বাহ্য জগতে আর কি অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত কোন মতেই ঠাহর পাইতেছি না। রূপরসাদির অস্তিত্বে আমি সন্দিহান নহি, উহারা আমারই প্রত্যক্ষ বস্তু; উহারা আমার অন্তর্জগতের উপাদান। কিন্তু উহাদিগকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র পদার্থ আমার বাহিরে কি আছে, তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে? রূপ দেখিতেছি, ইহা সত্য কথা; কিন্তু কাহার রূপ দেখিতেছি, এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে? গাছের রূপ দেখিতেছি, পাহাড়ের রূপ দেখিতেছি, চাঁদের রূপ দেখিতেছি, এ সবই আমার মন-গড়া কথা। আগুনে হাত দিলে যাতনা হইতেছে; এই যাতনাটা সত্য কথা; একটা স্পর্শ ও একটা রূপের একযোগে একটা প্রত্যয় জন্মিতেছে, ইহাও প্রকৃত কথা। কিন্তু সেই যাতনার কারণস্বরূপে, সেই স্পর্শের, সেই রূপের, সেই প্রত্যয়ের কারণস্বরূপে আমা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু আমার বাহিরে বর্ত্তমান আছে, ইহা কিরূপে স্বীকার করিব, বুঝিতে পারি না। যখন আমার ঐ বিশেষ রূপের অনুভব হয়, তার সঙ্গেই ঐ স্পর্শেরও অনুভব ঘটে; এবং স্পর্শ ও রূপ যখন একত্র যুগপৎ প্রতীয়মান হয়, তখন ঐ প্রতীতিকে আমি অগ্নি আখ্যা দিয়া থাকি। এমন কি, যখনই অগ্নি নামক প্রতীতির সহিত আমার হস্ত নামক আর একটা প্রতীতির স্পর্শ-সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তখন একটা উৎকট যাতনাও

প্রতীত হয়। এই কয়েকটা প্রত্যয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ কেন ঘটিল, তাহা না জানিতে পারি, কিন্তু এই অন্যোন্য-সম্বন্ধ-নিবদ্ধ প্রত্যয়গুলি ছাড়িয়া আর কি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিল তাহা কোন মতেই বুঝি না।

আসল কথা এই। সমুদয় প্রতীতির মধ্যে দেশ ও কাল নামক দুইটা কাল্পনিক প্রত্যয় বিশাল কায় বিস্তার করিয়া আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়। আমরা জড়ের অস্তিত্ব ও এমন কি, শক্তির অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারি; কিন্তু এই দেশ ও কাল যেন কি একটা বিকট স্বাধীন অস্তিত্ব লইয়া আমাদের আত্মাকে ম্রিয়মান করিয়া রাখে। আমার সম্মুখে ও পশ্চাতে সীমাহীন মহাকাশ, আমার পূর্ব্বে ও পরে অনাদি অনন্ত মহাকাল, আমার ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, আমাকে অবসন্ন করিয়া কি এক বিভীষিকা দেখায়। আমি বুঝিতে পারি না, আমারই সৃষ্ট বিভীষিকা দর্শনে আমি আকুল হইতেছি; আমারই মনঃকল্পিত পিশাচমূর্ত্তি আমার সম্মুখে, দাঁড়াইয়া আমাকে ভয় দেখাইতেছে। একখানা দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে দর্পণের সম্মুখস্থ সমস্ত প্রদেশ তাহার অন্তর্গত সমুদয় দ্রব্য লইয়া দর্পণের পৃষ্ঠভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই সেই ছায়াদেশের অস্তিত্ব যে আমার চিত্তভ্রান্তি মাত্র, তাহা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা বোধ হয় না; কিন্তু আমার দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে, উর্দ্ধে ও নিম্নে যে দেশ বর্ত্তমান দেখি, উহাও যে ঐরূপ আমার মনঃকল্পিত ভ্রান্তি মাত্র, তাহা বলিতে গেলেই একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমার নিমেষমধ্যে যুগব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন করিতে পারি, সেখানে সেই যুগব্যাপী কাল আমার ভ্রান্তি বলিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু আমাদের জাগ্রদবস্থায় লক্ষিত কালকে মনঃকল্পিত মনে করিতে গেলেই আমরা একেবারে শিহরিয়া উঠি।

বস্তুতই দেশ ও কাল আমারই কল্পনা বা আমারই সৃষ্টি। আমার প্রত্যয়গুলিকে আমি দুইটা রীতিতে সাজাইয়া থাকি; তাহার মধ্যে একটা সজ্জার নাম দেশ, আর একটার নাম কাল। কেন সাজাই, তাহা স্বতন্ত্র কথা; কোন-না-কোন রূপে না সাজাইলে আমি সে প্রত্যয়গুলির পরিচয় পাই না। সেই জন্য কোন-না-কোন রূপে সাজাইতে আমরা বাধ্য। আমরা দুই রূপে সাজাইয়া থাকি। দেশ ও কাল সেই দুই রূপ। দেশ ও কাল ব্যতীত অন্য কোন রূপে সাজান সম্ভবপর কি না, অন্য কোন জীবে অন্য কোন রূপে সাজাইয়া থাকি কি না, তাহা আমরা জানি না। আমরা কিন্তু ঐ দুই রূপে সাজাইয়া থাকি। আমাদের রূপরসগন্ধাদি প্রত্যয়গুলিকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; ও এইরূপে সজ্জিত করিয়া যে জগৎ নির্ম্মাণ করি, তাহার জড় জগৎ বা বাহ্য জগৎ আখ্যা দিয়া থাকি। আর তদতিরিক্ত সুখদুঃখাদি সমুদায় ব্যাপারকে কালে সাজাই ও তদ্দ্বারা একটা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে অন্তর্জগৎ বলিয়া থাকি। এই দুইটা জগৎ আমারই নির্ম্মিত; এমন কি, এই দুইটা জগতের সমষ্টিকেই 'আমি' সংজ্ঞা দিতে কেহ কেহ আপত্তি দেখেন না।

আমার শব্দস্পর্শাদি এবং সুখদুঃখাদি প্রত্যয়ের সমষ্টি 'আমি', ইহা বলিতে গেলেই একটা খট্‌কা উপস্থিত হয়। কেন না, সহজেই বোধ হয়, এই সকল ছাড়িয়াও আমার

মধ্যে এক একটা পদার্থ আছে, তাহার যেন এখনও হিসাব লওয়া হয় নাই। আমি দেখি, আমি শুনি, আমি চিন্তা করি, আমি ভয় পাই, এ সব সত্য; কিন্তু ইহা যেন সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমি জানি আমি দেখি, আমি জানি আমি শুনি, আমি জানি আমি চিন্তা করি, এইরূপ বলিলে সত্যটা যেন সম্পূর্ণ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র শ্রবণ দর্শন চিন্তয়ন প্রভৃতি ব্যাপারের অন্তস্থলে যেন কে এক জন অবস্থান করিয়া এই সকল ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ব্যাপারগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতেছে ও সেই সকল খণ্ড ব্যাপারগুলির বহুত্বকে একের অধীন করিয়া বিচ্ছেদের মধ্যে অবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। বহু বিষয়কে একের প্রত্যক্ষগোচর যাহা করে, তাহার ইংরেজী নাম consciousness, বাঙ্গালায় চেতনা। যে ইহা করায়, তাহার বেদান্তসম্মত নাম সংবিৎ। সংবিৎ যেন ভিতরে থাকিয়া এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে পরস্পর বাঁধিয়া রাখিতেছে; এই সংবিৎ না থাকিলে এই সম্বন্ধ-বন্ধন, এই একতা-বন্ধন যেন ঘটিত না। আমি দেখি ও আমি শুনি, উভয় ব্যাপার পরস্পর অসম্বদ্ধ। যে আমি দেখিয়া থাকি ও যে আমি শুনিয়া থাকি, উভয় 'আমি'র মধ্যে ঐক্য-সম্পাদন সংবিদের কার্য্য। আমি খাই, আমি হাসি, আমি নাচি, আমি গাই; আমি দেখি, এবং আমি শুনি; এবং আমার দেখিবার জন্য ও শুনিবার জন্য এই দৃষ্টির বিষয় ও শ্রুতির বিষয় এই জড় জগতের কল্পনা করি; আমার হাসিবার গাহিবার নাচিবার জন্য এই বিশাল ক্রীড়াক্ষেত্র নির্ম্মাণ করি; এবং আমিই আবার অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া আমার এই হাসিকান্না, নাচগান, দেখাশুনা প্রত্যক্ষ করি। আমিই ভিতর হইতে দেখি যে, আমি ইহা করিতেছি, আমি ইহা দেখিতেছি। আমিই দেখি আমাকে; আমার প্রত্যক্ষ বিষয় আমি। অদ্ভুত কথা; কিন্তু সত্য কথা। আমিই আমার জ্ঞাতা ও আমিই আমার জ্ঞেয়।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'সার সত্যের আলোচনা' নামক প্রবন্ধ মধ্যে এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, এতদুভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও উভয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দর্শনশাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, সত্য কথা; ইহাতে কেহ আপত্তি করিবেন না। কিন্তু যে-আমি দেখিলাম ও যে-আমি শুনিলাম, সে যে একই আমি তাহা উপলব্ধির জন্য যে আর এক আমি আড়ালের ভিতর অবস্থিত, তাহা সকলে স্বীকার করিতে চাহেন না। অন্ততঃ হিউম চাহেন না; হক্সলি চাহেন না; ভগবান্ বুদ্ধ তথাগত চাহিতেন না। অথচ এই জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় আমিকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার লীলারেখা ও তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায়ও সহজে দেখা যায় না। এই জ্ঞাতা আমি যেন স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ; মাসাব্দ-যুগ-কল্প অনেকধা গিয়াছে ও আসিবে; দেশ-কালের অতীত এই জ্ঞাতা আমি বসিয়া বসিয়া সেই-দেশব্যাপী ও কালব্যাপী জ্ঞেয় আমার মাসাব্দ-যুগকল্প ব্যাপী কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। যে আমি লীলাপর, ক্রীড়াপর, যে বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিয়া খেলা করে, সে সোপাধিক, সে জ্ঞেয়। যে বসিয়া বসিয়া সেই লীলারচনা ও সেই ক্রীড়াকল্পনা দেখে, সে জ্ঞাতা; তাহাকে কি উপাধিতে, কি বিশেষণে বিশিষ্ট

করিব, তাহা আমি জানি না ; কাজেই বলি, সে নির্গুণ ও নিরুপাধিক। অথচ এই দুই আমিই এক ; দুই আমি অভিন্ন ; যে দেখে ও যাহাকে দেখে, দুইই এক। ব্যবহারে দ্বয়, পরমার্থতঃ অদ্বয়। বেদান্তের ভাষায় একের নাম জীব, অপরের নাম ব্রহ্ম। জ্ঞেয় আমি জীবাত্মা, জ্ঞাতা আমি পরমাত্মা। ব্যবহারে দুই ; কিন্তু বস্তুতঃ এক। ব্রহ্মই জীব—জীবই ব্রহ্ম—কেন না, আমিই আমাকে দেখি। আমিই সেই—সোঽহম্।

এইখানেই নিরস্ত হওয়া উচিত ; কিন্তু এখানেও মন মানে না। জিজ্ঞাসা হয়, কেন এমন? আমি আমাকে কেন এমন দেখি? কেন আমি আমাকে উপাধিযুক্ত করিয়া দেখি? কেন আমি আমাকে এইরূপ লীলাপর, ক্রীড়াপর মনে করি? কেন এখানে নীল, কেন ওখানে পীত? কেন চন্দ্র, কেন সূর্য্য? কেন আলো, কেন আঁধার? কেন সামান্য, কেন ভেদ? কেন চিৎ, কেন জড়? কেন দেশ, কেন কাল? কেন আকর্ষণ, কেন বিকর্ষণ? এইরূপ নানাবিধ প্রশ্ন উঠে। কিন্তু এমন প্রশ্ন উঠে না, যদি এই নীল পীত, আলো আধার, চন্দ্র সূর্য, চিৎ জড় না থাকিত, তাহা হইলে থাকিত কি? একটা কিছু ত আছে, যাহা এই দৃশ্যমান জগৎ। কিছু একটা থাকিতে হইলে যাহা থাকিবে, ইহা তাহাই। আর যদি বল, কিছু একটা থাকারই বা প্রয়োজন কি, অথবা কিছুই নাই, তাহা হইলে সব গোল চুকিয়া যায়। বৌদ্ধগণ এইরূপে সকল গোল মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ঐ প্রশ্ন বোধ করি উঠিতেই পারে না—ঐ প্রশ্ন বোধ করি অর্থশূন্য। তথাপি প্রশ্ন উঠে ; প্রশ্নের উত্তর দিবারও চেষ্টা হয়। বৈষ্ণবের ভাষায় উত্তর হয়, এ আমার লীলা ; লীলাময়ত্বই আমার স্বরূপ। কেন? না, ইহাতেই আমার আনন্দ—আমি ইহাতে আহ্লাদ পাই ; আমার আহ্লাদিনী শক্তির সহিত এই ক্রীড়া আমার আনন্দ ; আমি মন্ময়া সেই আহ্লাদিনী শক্তির সহিত সর্বদা রাসোৎসবে মগ্ন থাকি। শাক্ত বলেন, ইহা আমার মায়া ; এই মায়াই বিশ্বজননী ; আমি স্বয়ং নিষ্কাম নিশ্চেষ্ট হইয়াও আমার মায়া দ্বারা এই বিশ্বজগৎ নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে ক্রীড়া করিতেছি। বৈদান্তিক ঘুরাইয়া বলেন, ইহা ভেলকি কুহক ইন্দ্রজাল ; ইন্দ্রজাল যে অর্থে সত্য, জগদ্ব্যাপারও তেমনই সত্য ; উহা যে অর্থে মিথ্যা, জগদ্ব্যাপারও সেই অর্থে মিথ্যা। যাহা এই জগতের আরম্ভ ঘটায়, তাহা অবিদ্যা বা মায়া। অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞান ; মায়ার অর্থ ভেলকি অথবা ভেলকি নির্ম্মাণের ক্ষমতা। মূলে নির্ব্বিকার সৎপদার্থ। সেই সৎপদার্থ ই আমি—আমি মায়াবী ঐন্দ্রজালিকের মত একটা জগতের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া নিজের রচিত ইন্দ্রজালের কুহকে আপনাকে প্রতারিত করিয়া, নিজের অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে আপনাকে আবৃত করিয়া মূঢ় সাজিয়া বসিয়া আছি। জগদ্ব্যাপারটা আমার একটা মজা দেখা। আধুনিক অজ্ঞেয়বাদী আগ্নিষ্টিকের ভাষায় বলিলে বলিতে হয়, কেন এমন হয় জানি না ; এ তত্ত্ব অজ্ঞেয়। অবিদ্যা অর্থে যদি ভ্রান্তি বলা যায়, তাহা হইলেও সেই একই উত্তর দাঁড়ায়। যাহা দেখিতেছ,

তাহা ভ্রান্তি; প্রকৃত কি, তাহা জানি না। মায়া অর্থে যদি খেয়াল বুঝ, তাহা হইলেও অধিক স্পষ্ট হয় না। খেয়াল অর্থ—যাহার হিসাব নাই, যাহা গণনার বাহিরে, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের বাহিরে। খেয়াল? কাহার খেয়াল? আমার। আমি আপনাতে মানুষ-ধর্ম্ম জীবধর্ম্ম অর্পণ করিয়া জীবরূপে মদ্রচিত জগতের অধীন হইয়াছি॥

আমি ব্রহ্ম—আমি মায়াবশ হইয়া আমাকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া জীবরূপে দেখিতেছি; মনে করিতেছি যে, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি হাসিতেছি, আমি নাচিতেছি; মনে করিতেছি যে, আমার জন্ম আছে, আমার মরণ আছে। আমি মনে করিতেছি যে, উহা নীল, উহা পীত; উহা চন্দ্র, উহা সূর্য্য; ঐ দেশ, ঐ কাল; উহা ধর্ম্ম, উহা অধর্ম্ম; উহা নশ্বর, উহা অনশ্বর; মনে করিতেছি যে, আমি অনিত্য, আমি সাদি, জগৎ নিত্য, জগৎ অনাদি; আমি অসীম দেশে সান্ত, অনাদি কালপ্রবাহে সাদি। কিন্তু উহা অবিদ্যা—ভ্রম। আমার মায়াবলে আমি অবিদ্যাগ্রস্ত—আমার পক্ষে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞাতার পক্ষে, ব্রহ্মের পক্ষে উহা মায়া; আমার পক্ষে, পরপ্রকাশ জীবের পক্ষে, জ্ঞেয়ের পক্ষে উহা অবিদ্যা। এক পক্ষে মায়া বা ইন্দ্রজাল—অন্য পক্ষে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আমি জীব সাজিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ দেখি; কিন্তু আমি ক্ষুদ্র নহি, সঙ্কীর্ণ নহি। কেন না, আমিই ব্রহ্ম ও আমিই জীব—যে জ্ঞাতা, সেই জ্ঞেয়—দুইই এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্। অতএব এক না দুই, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিব যে, এক—এক বই দুই নাই। সেই এক আমি।

সেই আমি কে? বলিতে পারি না। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—বাক্য সেখানে গিয়া প্রতিহত হয়; মনও সেখানে নিবৃত্ত হয়;—বলিব কিরূপে, বুঝাইব কিরূপে? নিতান্ত বলিতে হয়, বলিতেছি;—আমি সৎ—আমি আছি; আমি চিৎ—আমি চৈতন্যস্বরূপ; আর—আর—নিতান্ত না ছাড়—আমি আনন্দ—আমি আনন্দ স্বরূপ—আমি আছি, এই আমার আনন্দ।

অমঙ্গলের উৎপত্তি

একখানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার দুইটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন; সেইজন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, কাহারও বা হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যথোচিত শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষে গরিব লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহু লোকের ঘরবাড়ীর নির্ম্মাণ উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে। উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

কিন্তু কূটবুদ্ধি লোকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক বড় লোক প্রজাপীড়ক ছিলেন, ঘরের দেওয়াল

পড়িয়া তাঁহার হাড় ভাঙ্গিয়াছে, ইহা সুদৃশ্য ; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যক্তি, যাহার সুশীলতায় এ পর্য্যন্ত কেহ সংশয় করে নাই, তাহার মাথা চেপ্‌টা করিয়া দিয়া তাহার অনাথা পত্নীর অন্নের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল ?

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি না হয় নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে ? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল ; অথবা এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্ব্বজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল ? ব্যাঘ্র মেষশাবককেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল।

প্রকৃত কথা এই, বিধাতার ন্যায়পরতাতে যখন সংশয় করিবার কোন উপায় নাই, তখন জুবিলির বৎসরে উত্তর-বাঙ্গালায় দুষ্কৃতকারীর যে বিশেষ জটলা হইয়াছিল, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

ইহুদী জাতির বাইবেল নামক প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধের ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থুল ঘটাইয়া দিতেন এবং তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁর অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া পাপের শাস্তি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের উপর অপক্ষপাতে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে অনেকে বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর গঠন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের পরমকারুণিকতা ও ন্যায়পরতা সম্বন্ধে ঐরূপ যুক্তি অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়।

জগতের যে সকল ঘটনা স্থূলদর্শীর চোখে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরমকারুণিক বিধাতৃপুরুষের যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী লোকের কেন সংশয় নাই।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন, অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি চেতন জীবের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত কেন, সমস্ত ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও, কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল, তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখদুঃখ বুঝিবার শক্তি না থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক দল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীব মধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহাই অমঙ্গল। ইঁহাদের ভাবটা এই ;—এই প্রকাণ্ড জগৎ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া মানুষের ভোগের জন্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে ; মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব সার্থক ; মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের

ভোগের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন ; তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে যাহা মনুষ্যের সুখবিধানে যত সাহায্য করে, তাহার অস্তিত্ব তত দূর সার্থক এবং সৃষ্টি-কর্তার চেষ্টা তত দূর সফল এবং তাঁহার নৈপুণ্য তত দূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্তা ধন্য, কেন না, তাঁহার নির্ম্মিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে তিনি আমাদের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিগর, কেন না, এত কৌশল সহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে মানুষের অসুবিধা হইবে, তখন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন, স্তুতিভাজন ও প্রীতিভাজন ; কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্ত্তি সহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাঁহার নাম ইত্যাদি।

সূর্য্য কেমন অদ্ভুত পদার্থ! সূর্য্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞান-বিদ্যা শত মুখে সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ গান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদিগকে বায়ু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকি-তাম? তাই বিধাতা আমাদিগকে জল দিয়াছেন। পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াই-বার স্থল থাকিত না ; পৃথিবীর সৃষ্টি তাঁহার কেমন দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্য ঘাসের ফলকে শস্যে ও আমাদের শীত নিবারণের জন্য কাপাসের ফলকে তুলায় পরিণত করিয়া কি অপূর্ব্ব মানবহিতৈষার পরিচয় দিয়াছেন! এই ভূমণ্ডল দেখ, কি সুখের স্থান, সকল প্রকারের সুখ করিতেছে দান ;—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও ধর্মবক্তা সকলেরই মুখে এই একই কথা চিরকাল শুনা যাইতেছে।

সমস্ত জগৎটাই যখন মনুষ্য জাতির উপকারের জন্য ও সুবিধার জন্য নির্ম্মিত, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যপ্রণালীতে দোষারোপ ঘটে। সেই জন্য এক দলের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল। যদি সহজ চোখে কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতি সহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্য্যমণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকাকণা মাত্র, এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়া মানুষের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কয়েক বৎসর পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন না। বিশ্বজগতের কিন্তু সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন্ কাল হইতে জগৎ বিদ্যমান আছে, এবং কত কাল ধরিয়া জগৎ বিদ্যমান রহিবে, তাহারও আদি অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র, সাদি ও সান্ত মনু-ষ্যের জন্যই এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীব জন্তু

বর্ত্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাহিরে অসীম আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জীব জন্তু যে বর্ত্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই ; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রে জীব বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কাজেই জগৎটা কেবল মানুষের জন্য নির্ম্মিত, মানুষেরই একমাত্র ভোগ্য বস্তু, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্য, চেতন সুখদুঃখভোগী জীব মাত্রেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীব, যাহার চেতনা আছে, যাহার সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহারই সুবিধার জন্য, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য ও আরামে রাখিবার জন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই। যে ব্যাপার এই উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা মঙ্গল ও যাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায়। কেন না, সৃষ্টিকর্ত্তার উদ্দেশ্যই তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, অথচ অমঙ্গল সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে। তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল ?

ইহার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ। একে একে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা ; তাঁহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেয়ালের ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দ্দেশে তর্কশাস্ত্র কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া পড়ে। পরমকারুণিক, মঙ্গলময় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে নিজস্ব রহিয়াছে, সেইগুলির আর প্রযোজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ উত্তর অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর মঙ্গলার্থেই সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন ; তবে কি কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে : ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বদা প্রয়াস ; কাজেই ইহার মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

মনুষ্যের কল্পনা কিছুতেই হটিবার নহে। মনুষ্য তর্কের খাতিরে মঙ্গলময় দেবতার প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী অমঙ্গলময় আর এক দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এক দেবতা মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছে ; আর এক দেবতা অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সহিত বিরোধ উপস্থিত করিতেছেন। একের নাম জেহোবা, অন্যের নাম শয়তান ; একের নাম

অহুরমজ্‌দ, অন্যের নাম আহ্রিমান। উভয়ের চিরন্তন বিরোধ; একে অন্যকে পরাভবের চেষ্টায় রহিয়াছেন। শয়তান জেহোবার বিদ্রোহী। শয়তান জেহোবার কার্য্য পণ্ড করিবার জন্য, তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। উভয়ের মধ্যে চিরকাল হাঙ্গামা চলিতেছে। ঈশ্বর শয়তানকে জব্দ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত; কিন্তু শয়তান শয়তানীতে অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের সাধ্য নহে যে, তাহাকে সহজে করায়ত্ত করেন। তবে শুনা যায়, শেষ পর্য্যন্ত শয়তানের পরাভব হইবে। সে দিন কবে আসিবে, তাহা কেহ গণিয়া বলেন না।

শয়তানে বিশ্বাস মনুষ্যের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক। ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে বিশ্বাস যাঁহার যত দৃঢ়, তিনি শয়তানের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে সেই পরিমাণে বাধ্য। গত ভূমিকম্পে অনেকে চুলে চুলে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, ঈশ্বর করুণাময়। ভূকম্প ঘটনাটা শয়তানের কাজ; বাড়ীগুলা ভূমিসাৎ করা, মানুষগুলাকে মারিয়া ফেলা শয়তানের কাজ। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে এই শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন, তাহাতে বিস্ময় কি? কিন্তু শয়তানের অত্যাচারে যে সকল জননী পুত্রহীনা ও নারী পতিহীনা হইয়াছে, অথচ ঈশ্বর সেখানে দয়া প্রকাশ করেন নাই, তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা আদায় কবিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই।

কাজেই শয়তানের কল্পনা না করিলে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দোষ পড়ে। কল্পনা করিলে আবার তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের, শক্তির অপরিসীমত্বে যাঁহার বিশ্বাস, তিনি সর্ব্বশক্তিমানের প্রতিদ্বন্দ্বী শয়তানে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

কাজেই অন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যের অমঙ্গল ঈশ্বরের অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু মনুষ্যের ইচ্ছাকৃত। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন। মনুষ্যের জন্য ভাল মন্দ দুইটা পথ আছে, মনুষ্য ইচ্ছা করিলে যে কোন পথে চলিতে পারে। যে ভাল পথে চলে, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন। যে মন্দ পথে চলে, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে দণ্ডিত করেন অথবা তাহার হিতার্থ তাহাকে সাবধান করিবার জন্য দণ্ডিত করেন। মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া আপন অমঙ্গল আপনি ডাকিয়া আনে। বিধাতা তাহাকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন: সে সেই পথে যায় না, তাহা তাহারই দোষ। মনুষ্যের দোষে মনুষ্যকে শাস্তি দিবার জন্য, মনুষ্যকে সাবধান করিবার জন্য, মনুষ্যের পাপ ক্ষালনের জন্য অমঙ্গলের উৎপত্তি।

উত্তরটা সুন্দর, কিন্তু বিচারের বিষয়। অনেকে বলিলেন, মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীনতার একটা পরিচ্ছদ পরিয়া আছে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তাহার ইচ্ছা স্বাধীন নহে। তাহার শারীরিক গঠন তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন নহে। তাহার চিত্তের গঠনও তাহার ইচ্ছামত সে প্রাপ্ত হয় নাই। পিতৃ-পিতামহাদি সহস্র পূর্ব্বতন পুরুষ তাহার শারীর প্রকৃতির ও তাহার চিত্ত প্রকৃতির জন্মদাতা; সে সেই প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়া কর্ম্মভোগ করিতেছে মাত্র। তাহার ইচ্ছা তাহার চিত্ত-প্রকৃতির একটা অঙ্গ মাত্র। সে যেমন ইচ্ছাশক্তি তাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়ছে, সে তাহারই প্রয়োগ করিতেছে; তজ্জন্য তাহাকে দায়ী করিও না।

কথাটা তর্কের বিষয়। মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন কি না, তাহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তর্ক চলিতে পারে। বস্তুতই এখনও ইহার মীমাংসা হয় নাই। স্বীকার করা গেল, ইচ্ছা স্বাধীন। কিন্তু মানুষের দুর্ব্বলতার জন্য দায়ী কে? সংসারের প্রচণ্ড নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে সে কি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আপনার ইচ্ছামত চলিতে পারে? ইচ্ছা থাকিলেও কি তাহার যথেচ্ছ পথে চলিবার শক্তি আছে? সহস্র শত্রু তাহাকে গন্তব্য পথে চলিতে দিতেছে না; সহস্র প্রলোভন তাহাকে অপথে টানিতেছে। সে সর্ব্বদা অক্ষম ও দুর্ব্বল; সৎপথে চলিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও সে চলিতে পায় না। ভাগ্যবান্ সে, যে এই শত্রুকুলকে অতিক্রম করিয়া, প্রলোভনসমূহ এড়াইয়া, যথেচ্ছ পথে চলিতে সমর্থ হয়।
আবার মানুষের পাপে না হয় মনুষ্যের অমঙ্গল উৎপন্ন হইল। কিন্তু অমঙ্গল মনুষ্যমধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মনুষ্যের নিম্নস্থ জীবমধ্যে নিদারুণ নিষ্ঠুর জীবনদ্বন্দ্ব কোথা হইতে আসিল? জীবনসমাজে যে দুঃখের, যাতনার ও মরণের করুণ কোলাহল প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ করিয়া নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, এইরূপ অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জীবের আহার জীব, বিধাতার যখন এইরূপ ব্যবস্থা, একের মাংসশোণিত ব্যতীত অপরের ক্ষুন্নিবৃত্তির যখন উপায়ান্তর তৎকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন আহারদাতৃত্বে ও রক্ষা-কর্ত্তৃত্বে সমন্বয়সাধন অসাধ্য হইয়া পড়ে।
চারি দিকেই গোল। ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে তাঁহার দয়াময়ত্বে সন্দেহ প্রকাশ হয়। অমঙ্গল-সৃষ্টির ভারটা শয়তানের উপর চাপাইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় দোষ পড়ে। নিরীহ মনুষ্যকে দায়ী করিলে দুর্ব্বলের উপর অনুচিত অত্যাচার করা হয়। দায়িত্বশূন্য ইতর জীবের যাতনাভোগের উদ্দেশ্য ত একেবারে পাওয়া যায় না। অগত্যা বলিতে হয়, অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক; অগত্যা বলিতে হয়, মঙ্গল সম্পাদনের জন্য অমঙ্গলের বিকাশ। বলিতে হয়, অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বুদ্ধি লোকে দূরদর্শনে ও সূক্ষ্মদর্শনে অসমর্থ; স্থূল দৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই মঙ্গল।
কথাটা প্রকৃত। অমঙ্গলের পরিণাম মঙ্গল। জীব-সমাজেই দেখা যায়, দারুণ জীবন-সংগ্রাম, রক্তপাত, দুর্ব্বলের নিগ্রহ, সবলের অত্যাচার, দুঃখ, যাতনা, মৃত্যু; তাহার ফলে জীব-সমাজেই অযোগ্যের বিনাশ, যোগ্যের অভ্যুদয়। জীবের উন্নতির এই মুখ্যতম-উপায়। অভিব্যক্তির এই প্রধান পথ। এই পথে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি, জগতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যের আবির্ভাব, বিবিধ সৌন্দর্য্যের, বিবিধ রূপের ক্রমশঃ বিকাশ। সমস্তই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া। ভালর জয়, মন্দের ক্ষয়, সবলের জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয়, সুন্দরের বিকাশ, কুৎসিতের নাশ, সর্ব্বত্র এই একই সূত্র। তোমার ব্যক্তিগত সুখের জন্য, তোমার উন্নতির জন্য, তোমার আরামের জন্য প্রকৃতির এই কারখানা চলিতেছে না। ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি নহে; জাতির জন্য সৃষ্টি। ব্যক্তির জীবনে সুখের আশা না থাকিতে পারে; কিন্তু জাতির জীবনে সুখের আশা আছে। জীবের ইতিহাস সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। মনুষ্যের ইতিহাস সাক্ষিস্বরূপে দণ্ডায়মান। জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে জীবনসংগ্রাম চলিতেছে। কত জীব এই সংগ্রামে নিষ্ঠুর ভাবে জীর্ণ পিষ্ট আহত হইয়া ধরাধাম পরিত্যাগ করিল। শুধু জীব কেন? কত

জাতি এই ধরাপৃষ্ঠে দিনকতক জীবনের খেলা অভিনয় করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ভূপঞ্জরের স্তরমালা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ। কত লুপ্ত জীবের কঙ্কাল ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কত অতিকায় হস্তী, কত ভীমকায় কুম্ভীর, কত বিশাল বিহঙ্গম এক কালে ধরাপৃষ্ঠে নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। এখন তাহারা কোথায়? এখন তাহারা লোপ পাইয়াছে তাহাদের শিলীভূত কঙ্কালচয় তাহাদের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী হইয়া বর্ত্তমান। তাহারা গিয়াছে; তাহারা জীবনদ্বন্দ্বে পরাভূত হইয়াছে; অন্যে তাহাদের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহাদের রাজ্যে নূতন রাজপাট স্থাপন করিয়াছে। পুরাতন গিয়াছে, নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দুঃখ যাতনা ও মৃত্যুর পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা উন্নত জীবকে তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে।

জীবনসংগ্রাম আজিও চলিতেছে। এখন দুঃখ, এখন যাতনা, এখন মৃত্যু। কিন্তু ভাবী ফল উন্নতি, ভাবী ফল বৈচিত্র্য, ভাবী ফল সৌন্দর্য্য, ভাবী ফল অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের আবির্ভাব। অমঙ্গলের ক্ষয়, মঙ্গলের জয়। বিশ্বনিয়ন্তার এই অভিপ্রায়, বিশ্বপ্রণালীর এই রহস্য, বিশ্বসৃষ্টির এই উদ্দেশ্য।

ঠিক কথা, দুঃখের পর সুখ এবং দুঃখ হইতেই সুখ। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখের অস্তিত্ব মিথ্যা নহে। অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি, কিন্তু তাহা হইলে অমঙ্গল অস্তিত্বহীন নহে। বিধাতার বিধানই এইরূপ। কিন্তু হায়, বিধান কি অন্যরূপ হইলে চলিত না? মঙ্গল হইতে মঙ্গলের উপাদান কি বিশ্ববিধাতারও অসাধ্য ছিল? উন্নতির জন্য অভিব্যক্তির জন্য, মৃত্যুর পথ বিধাতা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, মৃত্যুর পথের পরিবর্ত্তে জীবনের পথ নির্দ্দেশ করিলে কি বিধাতার উদ্দেশ্য সিদ্ধি লাভ করিত না? উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ না করিলে কি তাঁহার করুণাময়ত্বে ব্যাঘাত পড়িত? জীবের শোণিতপাত ভিন্ন কি জীবের উদ্ভবের অন্য উপায় অমিত বুদ্ধিও আবিষ্কারে সমর্থ হয় নাই? এক বল, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্; তাহা হইলে তিনি দয়াময় নহেন। অথবা বল, তিনি দয়াময়; তাহা হইলে তিনি পূর্ণশক্তি নহেন।

এইরূপ স্থলে আর একটা মাত্র উত্তর আছে। মনুষ্যের বুদ্ধি দিগ্বিজয়ী। ইহার অনধিগম্য দেশ নাই, ইহার অসাধ্য কাজ নাই। ইঙ্গিতে মাত্রে মনুষ্য-বুদ্ধি না-কে হাঁ ও হাঁ-কে না তে পরিণত করিতে সমর্থ। তখন আর ভয় কি? নীতিকার ও শাস্ত্রকার, ধর্ম্মপ্রচারক ও দার্শনিক একবাক্যে একস্বরে বলিয়া উঠিবেন, মঙ্গলের রাজ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কোথায়? অমঙ্গল একেবারে অস্তিত্বহীন। বৃথা তুমি বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছ; বৃথা বাক্যব্যয়ে নিজে মজিতেছ ও পরকে মজাইতেছ। মিথ্যা, মিথ্যা, ভ্রান্তি। তোমার জ্ঞানচক্ষুর উপর যে মোহের আবরণ ও ভ্রান্তির আবরণ অবস্থিত, তাহা অপসারণ করিয়া দেখ; পূর্ণ মঙ্গলে অমঙ্গল নাই। বৃথা স্বপ্নে তুমি শিহরিতেছ, অলীক আতঙ্কে তুমি আতঙ্কিত ও দিশাহারা হইতেছ। ভ্রান্ত তুমি, অন্ধ তুমি; তোমার সম্মুখে জগৎ বিস্তীর্ণ,—জ্যোতিতে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ। অন্ধ তুমি, তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না। আনন্দের কোলাহলে আমার শ্রবণপথ প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। জ্যোতির তীব্র আলোকে আমার নয়ন ঝলসিতেছে। জ্যোতির্ম্ময় প্রভা তরঙ্গে বিশ্বের মহাসাগর উথলিতেছে; জ্যোতির তরঙ্গ, আলোকের হিল্লোল, তরঙ্গে

তরঙ্গে আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে। কাহাকে তুমি দুঃখ বলিতেছ? দুঃখই সুখ, দুঃখই আনন্দ। কাহাকে তুমি মৃত্যু বলিতেছ? মৃত্যুই জীবন, মৃত্যু জীবনের সহচর, মৃত্যু জীবনের সোপান।

জ্ঞানীর কথা এইরূপ, ভক্তের কথা এইরূপ, প্রেমিকের কথা এইরূপ। যিনি একাধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও প্রেমিক, তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী; তাঁহার জীবন সুখের জীবন; কেন না, অমঙ্গল তাঁহার নিকট মঙ্গল, অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোক। তিনি পিতা; পুত্রের অকালমৃত্যুতে বিধাতার মঙ্গলহস্তের আহ্বান দেখিয়া তিনি পুলকিত হইয়া থাকেন। তিনি ক্ষুৎপীড়িতের মরণযাতনায় বিধাতায় প্রেমার্পণে অবসর পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। তিনি সুখী; তিনি দুঃখের অস্তিত্ব জানেন না; তাঁহার সৌভাগ্যে আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক হয়, তাঁহার ক্ষমতায় আমরা বিস্মিত হই। তিনি অন্ধকারকে আলোতে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট অমঙ্গল মঙ্গলরূপী। তিনি অসাধ্য সাধনে পটীয়ান্, তাঁহার চরণে প্রণাম।

তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁহাকে আত্মীয় মনে করিতে আমরা অসমর্থ। তাঁহাকে আমরা ভক্তি করি, কিন্তু ভালবাসিতে পারি না। তিনি দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছেন; স্বয়ং তিনি সুখী; তিনি ভাগ্যবান। আমার সে শক্তি নাই; আমি তাঁহার সুখে সুখী হইব কিরূপে? তিনি চক্ষুষ্মান্; তিনি আলোকে থাকিয়া আনন্দে পূর্ণ। আমি অন্ধ; অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার আনন্দে যোগ দিতে আমি অসমর্থ। কিন্তু ইহা সত্য, তাঁহার জগৎ যেমন মঙ্গলময়, আমার জগৎ তেমন নহে। তিনি সৌভাগ্যশালী, ক্ষমতাশালী, বিশ্ববিধানের পরম ভক্ত। আমি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত, সে ক্ষমতায় হীন, আমার ভক্তিরস তেমন উথলিয়া উঠে না। তিনি আমার মত হতভাগ্যকে কৃপা করুন; কিন্তু সংসার-বিষে জর্জ্জরিত আমার নিকট অমঙ্গলের অস্তিত্ব অপলাপ করিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিলে তাঁহার সহৃদয়তায় আমি বিশ্বাস করিব না।

বিশ্বজগৎ মঙ্গলে পূর্ণ ও আনন্দে পূর্ণ, স্বীকার করিতে আপত্তি নাই, যদি সেই মঙ্গল শব্দ ও আনন্দ শব্দ প্রচলিত অভিধানসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত না হয়। আমরা মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের নিকট আঁধার ছাড়িয়া আলো নাই, শাদা ছাড়িয়া কাল নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। জগৎ হইতে যদি আঁধারের বিলোপসাধন করিতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আলোকের বিলোপসাধন ঘটিয়া যাইবে। দুঃখকে যদি নির্ব্বাসিত করিতে যাই, সুখও সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইবে। আঁধার ও আঁধার ও আঁধার—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আঁধার কেমন, তাহা বুঝিতে পারি না। আবার আলোক আর আলোক আর আলোক—নিরবচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ আলোক কেমন, তাহাও আমাদের কল্পনার অনধিগম্য। আলোকের পার্শ্বে আমরা আঁধার দেখিতে পাই; আঁধার আছে বলিয়াই আমরা আলোকের অস্তিত্ব প্রত্যয় করি। অমঙ্গলকে লোপ কর; মঙ্গলকে ধরিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, মঙ্গল সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে। অমঙ্গলের পার্শ্বে থাকিয়াই মঙ্গল মঙ্গল, নতুবা মঙ্গল অর্থশূন্য বাতুলের

প্রলাপ।

কবিকল্পিত অলকাপুরে নিত্য বসন্ত বিরাজ করিয়া থাকে। সেখানে মলয় পবন নিরন্তর প্রবাহিত হয়, রজনী নিরন্তর জ্যোৎস্নাময়ী, সেখানে যৌবন ভিন্ন জরা নাই, মরণের দ্বার সেখানে রুদ্ধ। সেখানে বিরহ নাই, মিলনের আনন্দ সেখানে সর্ব্বদা বিদ্যমান। কবির কল্পনা এই দেশের সৃষ্টি করিতে সমর্থ বটে; কিন্তু কল্পনার বাহিরে সত্যের রাজ্যে ইহার অস্তিত্ব নাই। এই নিত্য বসন্তে ও নিত্য জ্যোৎস্নায় কবি-কল্পনা নিত্য সুখের অস্তিত্ব দেখতে পায়; কিন্তু সুস্থ মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা এই নিত্য জ্যোৎস্নায় ও নিত্য বসন্তে সুখ দেখিতে সর্ব্বতোভাবে অক্ষম। অথবা এই প্রাকৃত দেশে জ্যোৎস্নার ও বসন্তের ও আরামের ও মিলনের নিতান্ত অসদ্ভাবের উপলব্ধি করিয়াই বোধ করি কবি কল্পনা এই অতিপ্রাকৃত সুখাবতীর নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছে। অন্ধকারের পার্শ্বেই জ্যোৎস্না সম্ভবপর। বিরহ-দুঃখের পরেই মিলনসুখ উপভোগ্য। যে বিরহের দুঃখ ভোগ করে নাই, সে মিলনের সুখ আস্বাদনে অধিকারী নহে। যে মরণের সম্মুখীন হয় নাই, সে জীবনে মমত্বহীন।

অমঙ্গলকে জগৎ হইতে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিও না; তাহা হইলে মঙ্গল সমেত উড়িয়া যাইবে। মঙ্গলকে যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অমঙ্গলকে সেই ভাবে গ্রহণ কর। অমঙ্গলের উপস্থিতি দেখিয়া ভীত হইতে পার, কিন্তু বিস্মিত হইবার হেতু নাই। অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া অকূলে হাবু-ডুবু খাইবার দরকার নাই। যে দিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উভয়ের উৎপত্তি। এককে ছাড়িয়া অন্যের অস্তিত্ব নাই, এককে ছাড়িয়া অন্যের অর্থ নাই। যেখান হইতে মঙ্গল, ঠিক সেইখান হইতেই অমঙ্গল। সুখ ছাড়িয়া দুঃখ নাই, দুঃখ ছাড়িয়া সুখ নাই। একই প্রস্রবণে একই নির্ঝর-ধারাতে উভয় স্রোতস্বতী জন্মলাভ করিয়াছে। একই সাগরে উভয়ে গিয়া মিশিয়াছে। উভয়ই বা কেন বলিব? একই স্রোতস্বতী একই নির্ঝর হইতে বাহির হইয়াছে। এ-পার হইতে বলি সুখ, ও-পারে দাঁড়াইয়া বলি দুঃখ। দক্ষিণ পারে সুখ, বাম পারে দুঃখ। দক্ষিণে মঙ্গল, বামে অমঙ্গল। দক্ষিণ ছাড়া বাম নাই, বাম ছাড়িয়া দক্ষিণ নাই। যেখানে এ-পার নাই, সেখানে ও-পারও নাই। সেখানে স্রোতস্বতীও কল্পনার অগোচর। জগতের ইতিহাসে অমঙ্গলের উৎপত্তির কালনির্দ্দেশ মহাসমস্যা; কিন্তু সেই দিনে তাহার সহচর অমঙ্গলেরও উৎপত্তি। মঙ্গলের অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। জগতের নিয়ম এই; অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সূত্রে ধৃত রহিয়াছে।

জীবের অভিব্যক্তির ইতিহাস কিরূপ? অভিব্যক্তির নাম উন্নতি বল ক্ষতি নাই, কিন্তু উন্নতি অর্থে সুখবৃদ্ধি ও আনন্দবৃদ্ধি বুঝিও না। উন্নতি সহকারে সুখের বৃদ্ধি, উন্নতি সহকারে দুঃখেরও বৃদ্ধি। যখন সুখ ছিল না, তখন দুঃখও ছিল

না; যখন সুখের আধিক্য ঘটে, তখন দুঃখের জ্বালা তীব্র হয়। অচেতন জগতে, জড় জগতে অনুভব-শক্তি নাই; অর্থাৎ সুখও নাই, দুঃখও নাই। চেতনাসহ সুখ দুঃখ উভয়েরই পার্থক্যবিকাশ। যে যত সুখ বুঝে, যে যত দুঃখ বুঝে, সে তত চেতন; তাহার চেতনা সেই পরিমাণে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। জীবপর্য্যায়ে যত উন্নতি, যত অধম হইতে উত্তমের বিকাশ, যত নীচ হইতে উচ্চের উদ্ভব, ততই সুখ-দুঃখেরও অধিক বিশ্লেষণ। জীবসমাজে যাহা দেখা যায়, মনুষ্য-সমাজেও তাহাই। সভ্যতার উন্নতির অর্থ কি? সুখের উন্নতি কি দুঃখের উন্নতি, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ বলে, সভ্যতার সহিত সুখের পরিমাণ বাড়িতেছে; কেহ বলে, দুঃখের পরিমাণ বাড়িতেছে। প্রকৃত কথা উভয়েরই মাত্রা বাড়িতেছে; কেন না, এককে ছাড়িয়া অন্যের স্বতন্ত্র অস্তিতা থাকিতে পারে না। জীবনের সহিত সুখদুঃখের সম্বন্ধ। যাহার জীবন নাই, তাহার দুঃখও নাই, সুখও নাই। জীবনের অর্থ জড় হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা। জড় জগৎ জীবনকে জড়ত্বের অভিমুখে টানিতেছে। জীবন জড় হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়াসী। জীবনের জড়ত্বে পরিণতির নাম অমঙ্গল। জীবনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সফলতার নাম মঙ্গল। জীব অমঙ্গল পরিহার করিতে চায়, মঙ্গল গ্রহণ করিতে চায়। কেন না, উহাতেই জীবের জীবত্ব; উহাই জীবনের বৈশিষ্ট্য; উহা ছাড়িয়া জীবনের সার্থকতা নাই। অমঙ্গল কেন হইল, মঙ্গল কেন হইল, ইহার উত্তর চাও, তবে জীবনের উৎপত্তি কেন হইল, ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। কেন না, জীবনের সহিত মঙ্গলামঙ্গলের নিত্য সম্পর্ক: জীবনকে ছাড়িয়া মঙ্গলামঙ্গলের অর্থ নাই ও অস্তিত্ব নাই। জীবনের সহিত আবার চেতনার সম্পর্ক। অন্ততঃ জীবনের অভিব্যক্তি সহকারে চেতনার স্ফূর্ত্তি। চেতনা মঙ্গল বুঝে, অমঙ্গলের পার্শ্বে মঙ্গলকে বুঝে, সুখ দুঃখে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

অমঙ্গলের জন্মস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিতে চাও। মঙ্গলের জন্মস্থান অনুসন্ধান কর। অমঙ্গল কেন? ইহার উত্তরে বলিব মঙ্গলই বা কেন? এক প্রশ্নের উত্তর মিলিলেই অন্যেরও উত্তর মিলিবে। অথবা পূর্ব্বে চেতনার উৎপত্তি কোথায়, তাহার অনুসন্ধান কর; চেতানার উৎপত্তি কেন, তাহার উত্তর দাও। চেতনা কি? না, সুখে ও দুঃখে পার্থক্যবোধই চেতনা। যেখানে সুখ ও দুঃখ উভয়ে পার্থক্য বোধ নাই, সেখানে চেতনাও ফুটে নাই। আবার যাহাতে সুখ, তাহা মঙ্গল; যাহাতে দুঃখ, তাহাই অমঙ্গল। কাজেই যে দিন চেতনার সৃষ্টি, সেই দিনই অমঙ্গলের সৃষ্টি। জগতে অমঙ্গল অবর্ত্তমান, জগতে দুঃখ অবর্ত্তমান, চেতন জীব কেবল একই শান্তি একই আরাম একই আনন্দ উপভোগে নিরত রহিয়াছে,—ইহা চিন্তার অগোচর, ইহা অলীক কল্পনা।

অতএব এস বন্ধু, অকারণে আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রয়োজন নাই। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না; অমঙ্গলকে সম্মুখে দেখিয়াও অস্বীকারের চেষ্টা পাইও না। অমঙ্গলের অপলাপ করিও না; অমঙ্গল তোমার সহচর, তোমার চেতনার সহচর, তুমি ছাড়িতে চাহিলেও সে তোমাকে ছাড়িবে না। যত দিন তোমার জাগ্রদবস্থা, মঙ্গল ও অমঙ্গল সমান ভাবে তোমাকে জড়াইয়া থাকিবে। যত

দিন তোমার জাগ্রদবস্থা স্ফূর্ত্তি পাইবে, তত দিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলও নিত্য ফুটিয়া উঠিবে। যখন অমঙ্গলের তিরোধান হইবে, তখন মঙ্গলেরও তিরোধান হইবে; তোমার জাগরণ তখন সুষুপ্তিতে বিলীন হইবে। তুমি সুষুপ্তির প্রার্থনা করিও না; সুষুপ্তিতে তোমার লাভ নাই, সুষুপ্তিতে তোমার ব্যক্তিগত বিলোপ। যত দিন জাগিয়া আছ, তত দিন তোমার ব্যক্তি; তত দিন মঙ্গল তোমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া থাকিবে, অমঙ্গল তোমার বাম হস্ত ধরিয়া থাকিবে। উভয়ে তোমাকে জীবনের পথে লইয়া চলিবে। একের বুঝি আকর্ষণ, অপরের বুঝি বিকর্ষণ; উভয়ের মধ্যে তোমার গমনীয় পথ। জীবনের পথ তোমার সম্মুখে প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, তোমার গন্তব্য দেশ তোমার সম্মুখে প্রসারিত। তোমার অন্তরের অন্তর হইতে তোমার তুমি তোমাকে মন্দ্র ধ্বনিতে সেই গন্তব্য পথে চলিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা পাইও না। মঙ্গলকে আহ্বান কর, অমঙ্গলের নিকট প্রণত হও। একাকে আলিঙ্গন কর, অপরকে নমস্কার কর। গন্তব্য পথে তোমার গতি হউক; মঙ্গল ও অমঙ্গল তোমার পথপ্রদর্শক হইয়া তোমায় প্রেরণা করিতে রহুক। ধীরপদে তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, তোমার নিরূপিত স্বধর্ম্ম আচরণ কর। কর্ম্মেই তোমার অধিকার; ফলে তোমার অধিকার নাই। ফলের প্রতি, মঙ্গলের প্রতি বা অমঙ্গলের প্রতি তুমি দৃক্‌পাত করিও না। শ্রুতি স্মৃতি সদাচার তোমার পদপ্রদর্শক হউক। সকলের উপর আত্মতৃপ্তি তোমার পদপ্রদর্শক হউক। যিনি তোমার অভ্যন্তর হইতে তোমাকে পথ দেখাইতেছেন, তাঁহার তৃপ্তিবিধানে তোমার মতি থাকুক। তৎপ্রদর্শিত মার্গে তুমি নির্ভয়ে অগ্রসর হও। মঙ্গলের জয় হউক, অমঙ্গলেরও জয় হউক; উভয়ের জয়েই তোমার জয়।

ভীত মানব বহু কাল ধরিয়া মঙ্গলের জয় গান করিয়া আসিতেছে; অমঙ্গলের জয়বার্ত্তা কি কখন গীত হইবে না? অমঙ্গলের জয়বার্ত্তা গীত হইয়াছে। রামায়ণের আদি কবি সেই গীত গাহিয়াছেন; ভারতের ইতিহাস সেই গীতের প্রতিধ্বনি।

বর্ণ-তত্ত্ব

প্রকৃতিতে আমরা বিবিধ বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে গোটাকতক স্থূল কথা এই সন্দর্ভে আলোচ্য।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, বর্ণ কয় প্রকার? সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে, বর্ণ সাত প্রকার। এই উত্তরের একটা ভিত্তি আছে। রামধনুতে আমরা বিবিধ বর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই। সূর্য্যের আলো একটা কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে নানা রঙ দেখা যায়। শাদা আলো ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে কিরূপে মৌলিক বর্ণগুলি বাহির করিতে হয়, তাহা নিউটন প্রথমে দেখাইয়াছিলেন। একটা চুলের মত সঙ্কীর্ণ অথচ দীর্ঘ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলোক লইয়া যাইতে হইবে। পরে সেই

আলোক একখানা তিন-কোণা কাচের কলমের ভিতরচালাইলে একটা পাঁচ-রঙা আলো দেওয়ালের গায়ে পড়িবে। কেহ কেহ এইখানে বলিবেন, পাঁচ-রঙা নয়, সাত-রঙা ; কেন না, এই আলোর ভিতরে রক্ত, অরুণ, পীত, হরিৎ, নীল, ইণ্ডিগো ও ভায়লেট, এই সাত রঙের বিকাশ দেখা যাইবে। কিন্তু এইরূপ বিবরণে একটু দোষ আছে। প্রকৃত কথা, সেই আলোর মধ্যে আমরা নানা বর্ণের বিকাশ দেখি। বর্ণমালার এক পাশে থাকে লাল, অন্য পাশে থাকে ভায়লেট। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝে কত নানাবিধ রঙ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সংখ্যা নাই। ভাষাতে অতগুলা শব্দ নাই ও নাম নাই, কাজেই আমরা পাঁচ রঙ, ছয় রঙ বা সাত রঙের নাম করি। বস্তুতঃ হরিৎ ও পীত, এই দুয়ের মাঝেই নানাবিধ বর্ণ থাকে। কোনটা পীতাভ হরিৎ, কোনটা হরিদাভ পীত। এই সকল বর্ণে পার্থক্য আছে, অথচ সেই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ভাষার নাম নাই ; কাজেই ভাষাতে কুলায় না।

সূর্য্যের আলোর মধ্যে পাঁচ রকম বা সাত রকম মাত্র রঙ আছে বলিলে ভুল হয়। এত রঙ আছে যে, আমরা তাহাদের সকলের নাম দিতে পারি না। পীতবর্ণ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া হরিতে দাঁড়ায়, হরিৎ ক্রমশঃ নীলে দাঁড়ায়। কিন্তু এই পীত ও হরিতের মাঝামাঝি কত রঙ আছে, এবং হরিৎ ও নীলের মাঝামাঝি আবার কত রঙ আছে, তাহা বলাই যায় না। ভাষা এখানে পরাস্ত। আমরা এই অসংখ্যেয় বর্ণগুলিকে মোটামুটি সাতটা শ্রেণীতে ভাগ করি। কতকগুলাকে বলি রক্ত, তাহারা রক্তশ্রেণীভুক্ত : কতকগুলা পীত বা পীতশ্রেণীভুক্ত ; ইত্যাদি।

কাজেই সূর্য্যের শুভ্র আলোক বিশ্লেষণ করিলে অগণ্য বিবিধ বর্ণের আলোক পাওয়া যায়। এই বর্ণগুলিকে আমরা বিশুদ্ধ বর্ণ বলিব। বিশুদ্ধ বর্ণের অর্থ কি ? সূর্য্যের আলো কাচের কলমের ভিতর দিয়া লইয়া গেলে যে সকল বর্ণ দেখা যায়, তাহাই বিশুদ্ধ বর্ণ। কোন একটা বিশুদ্ধ বর্ণের আলোকে ঐরূপে বিশ্লেষণ করিয়া আর কোন বর্ণ পাওয়া যায় না।

রামধনুতে যে সকল আলো দেখা যায়, তাহারা এই বিশুদ্ধ বর্ণের আলো। প্রকৃতিদেবী এখানে নিউটন সাজিয়া জলকণাকে কাচের কলমে পরিণত করিয়া শুভ্র সূর্য্যালোককে বিবিধ বিশুদ্ধ বর্ণের আলোক দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু চারি দিকে প্রাকৃতিক দ্রব্যে আমরা সাধারণতঃ যে সকল বর্ণ দেখিয়া থাকি, তাহা বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। এই সংখ্যাতীত বিশুদ্ধ বর্ণ ব্যতীত আরও সংখ্যাতীত অবিশুদ্ধ বর্ণের অস্তিত্ব আমরা সর্ব্বত্র উপলব্ধি করি। প্রাকৃত দ্রব্যে যে পীত, যে হরিৎ, যে নীল দেখা যায়, তাহা প্রায়শই বিশুদ্ধ পীত, বিশুদ্ধ হরিৎ, বিশুদ্ধ নীল হয় না। কেন না, উহার প্রত্যেক রঙকে কাচের কলম দিয়া বিশ্লেষণ করিলে নানা রঙ পাওয়া যায়। পাটল ধূসর পিঙ্গল প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ বর্ণ নহে। সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ করিলে এই সকল পাটল পিঙ্গলাদি রঙ পাওয়া যায় না। এই জন্য ইহাদিগকে অবিশুদ্ধ বলিতেছি। তবে বিশুদ্ধ বর্ণের আলো নানা ভাগে মিশাইয়া এই সকল অবিশুদ্ধ মিশ্র বর্ণের উৎপাদন

করিতে পারা যায়।

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে বর্ণতত্ত্বের শেষ কথা বলা হয় না। আরও ভিতরে যাইতে হইবে। আসল কথা, বর্ণমাত্রই—নীলই বল, আর পীতই বল, বর্ণমাত্রই কেবল আমাদের একটা উপলব্ধির বা প্রতীতির প্রকারভেদ মাত্র। শব্দ একটা জ্ঞান, তাহারও আবার সহস্র প্রকারভেদ আছে; ঘ্রাণ একটা জ্ঞান, তাহার সহস্র প্রকারভেদ আছে। সেইরূপ বর্ণও বিশেষ জ্ঞান। ইহারও সহস্র প্রকার ভেদ আছে।

ঐখানে সবুজ রঙের ঘাস রহিয়াছে; এইখানে আমি রহিয়াছি। সবুজ রঙটা বস্তুতঃ ঘাসের নহে। সবুজ রঙ আমার মনে আছে। উহা আমার অনুভব মাত্র। আমার মনে ঐ অনুভূতিটা জন্মিতেছে; তাহা হইতে আমি অনুমান করিতেছি যে আমার বাহিরে ঐ স্থানে ঘাস পদার্থটা রহিয়াছে। ঘাসের অস্তিত্বের কল্পনা আমার এই অনুভূতি হইতেই উৎপন্ন। অর্থাৎ ঐ অনুভূতি আমাকে ঘাসের অস্তিত্বের কল্পনায় সমর্থ করিতেছে।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান আরও একটু অধিক বলে। পদার্থবিদ্যা কল্পনা করে যে, ঐ ঘাসের ও আমার চোখের মধ্যে একটা চক্ষুর অগোচর পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, সে পদার্থটা ঐরূপে মাঝে না থাকিলে ওখানে ঘাস থাকিলেও আমার ঐ সবুজ বর্ণের অনুভূতি জন্মিত না। সেই মধ্যবর্ত্তী পদার্থটার ইংরেজী নাম ঈথর; বাঙ্গালায় আকাশ বলা যাইতে পারে। ঘাসের গায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা সেই আকাশে ছোট ছোট ধাক্কা দিতেছে; সেই ধাক্কাগুলি সেই আকাশ কর্তৃক বাহিত ও চালিত হইয়া আমার চোখের পর্দ্দায় প্রতিহত হইতেছে। এক এক ধাক্কাতে আকাশে এক একটি ঢেউ জন্মিতেছে। বীণাযন্ত্রের তারে পুনঃ পুনঃ ঘা দিলে যেমন বায়ুমধ্যে ঢেউ জন্মে, জলের পৃষ্ঠে আঘাত দিলে যেমন জলে ঢেউ জন্মে, শস্যক্ষেত্রে ঊর্দ্ধশীর্ষ গাছগুলির শীর্ষে ও পাতায় বাতাসের ধাক্কা লাগিয়া যেমন ঢেউ জন্মে, কতকটা সেইরূপ। পদার্থবিজ্ঞান কেবল এইটুকু বলিয়াই নিরস্ত হয় না। সেই ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত, মিনিটে কত বার ধাক্কা পড়িতেছে, এবং কি বেগেই বা ধাক্কাগুলি আকাশ-মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়া চক্ষুতে পৌঁছিতেছে, তাহাও গণিয়া দেয়।

পদার্থবিজ্ঞান যে যুক্তির বলে এই আকাশের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছে এবং ঢেউগুলির আকারপ্রকার সম্বন্ধে বিবিধ গণনা সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে, এ স্থলে তাহার অবতারণা চলিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তুমি মাপকাঠি দিয়া কাপড় মাপিয়া আমাকে বলিলে সেই মাপে আমি যেমন আস্থা, করি, আকাশের ঢেউ গুলির দৈর্ঘ্য মাপিয়া বিজ্ঞানবিৎ যে মাপ করিয়া দেন, তাহাতে আমার সেইরূপই আস্থা: তবে তোমার কাপড়ের মাপ চেয়ে বৈজ্ঞানিকের ঢেউ মাপ সূক্ষ্ম।

পদার্থবিজ্ঞান শাদা আলো ও রঙিন আলোর সম্বন্ধে কি স্থির করিয়াছে, দেখা যাউক। সূর্য্যের আলো শাদা দেখায়: উহা আকাশে নানাবিধ ঢেউয়ের খেলা। নানাবিধ কি অর্থে?—না, কোন ঢেউ একটু বড়, কোনটা বা একটু ছোট। একই

জলাশয়ের পৃষ্ঠে লম্বা লম্বা বড় বড় তরঙ্গ উঠিতে পারে, আবার খাটো খাটো ছোট ছোট উর্ম্মিও উঠিয়া থাকে; কতকটা সেই রূপ। এই ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ আসিয়া চক্ষুর ভিতরের একখানা স্নায়বীয় পর্দায় ধাক্কা দেয় ও সেই ধাক্কা ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের মধ্যে পৌছিয়া নানাবিধ—কেমন, তাহা ঠিক বলা যায় না—নানাবিধ আণবিক গতির উৎপাদন করে। এই এক এক রকম আণবিক গতির সঙ্গে সঙ্গে এক এক রকম বর্ণের অনুভূতি জন্মে। রঙটা হইল মানসিক ব্যাপার; ঘাস হইতে রঙ আসে না, ঘাস হইতে আসে ধাক্কা—বর্ণহীন ত্রাণহীন নীরব ধাক্কা—পিঠে কিল দিলে যেমন বর্ণহীন ত্রাণহীন ধাক্কা হয়, ঠিক তেমনই ধাক্কা। এই ধাক্কা শেষ পর্য্যন্ত মস্তিকে যায়, সেখানেও সেই ধাক্কাই থাকে; কিন্তু ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সেই বিকার—সেই অনুভূতি—রঙের অনুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার হস্তপ্রযুক্ত কিলরূপী ধাক্কা তোমার পৃষ্ঠ হইতে মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেদনারূপী মনোবিকার বা অনুভূতির উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনই। ফলে রঙটা আছে মনে; উহা ঘাসে নাই, ঘাস হইতে যে ধাক্কা আসে, তাহাতেও নাই অর্থাৎ ঢেউগুলিতেও নাই। কোনটা বড় ঢেউ, কোনটা ছোট ঢেউ; কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত দ্রুত পড়িতেছে, কোনটায় পর পর ধাক্কা অপেক্ষাকৃত ধীরে পড়িতেছে। এই সকল ছোট বড় নানা আকারের ঢেউয়ের মধ্যে কোনটার সঙ্গে রক্তানুভূতির, কোনটার সঙ্গে পীতানুভূতির, কোনটার সঙ্গে নীলানুভূতির সম্পর্ক রহিয়াছে। কোন ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলে রক্তবর্ণের জ্ঞান জন্মায়; আর কোন ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলে নীলের জ্ঞান জন্মায়; ইত্যাদি।

সূর্য্যের আলো আসিতেছে বলিলে বুঝিবে—আকাশ বহিয়া নানাবিধ ছোট বড় ঢেউ আসিতেছে। সকল ঢেউ চলে একই বেগে;—সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ ক্রোশ বেগে। কিন্তু কোনটা একটু দীর্ঘ, কোনটা একটু খাটো। তাহাদের দৈর্ঘ্য মাপিবার সময় গজ ফুট ইঞ্চির মাপকাঠির ব্যবহার চলে না; ঢেউগুলি এত ক্ষুদ্র যে, ইঞ্চিকে দশ লক্ষ ভাগ করিয়া তাহারই মাপকাঠি তৈয়ার করিতে হয়। এরই মধ্যে আবার যে একটু দীর্ঘ, সে রক্তজ্ঞান জন্মায়। যে আরও ছোট, সে পীতজ্ঞান জন্মায়; আরও ছোটতে হরিৎ; আরও ছোটতে নীল। আবার কতকগুলি ঢেউ এত বড় বা এত ছোট যে, চক্ষুযন্ত্রের দোষে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌছিতেই পারে না; অথবা পৌছিলেও কোনরূপ বর্ণজ্ঞান জন্মায় না।

আর একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। অসংখ্য বর্ণের মধ্যে কতকগুলাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছি,—এইগুলি সূর্য্যের আলোকে নিউটনের উদ্ভাবিত প্রক্রিয়া দ্বারা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। আর কতকগুলোকে অবিশুদ্ধ বা মিশ্র বলিয়াছি,—ইহারা সূর্য্যের আলোকে বিদ্যমান থাকে না, তবে বিবিধ রঙিন দ্রব্যের পিঠ হইতে যে আলো আসে, তাহাতে থাকে। বিশুদ্ধ বর্ণগুলির এক-একটির সহিত এক-একটি নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যযুক্ত আকাশের ঢেউয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে;—যখন সেই সেই ঢেউ একা আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখন সেই সেই বিশুদ্ধ বর্ণ অনুভূত হয়।

যখন পাঁচ রকমের ঢেউ একযোগে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনই অশুদ্ধ বা মিশ্র বর্ণ অনুভূত হয়।

আকাশের ছোট বড় ঢেউগুলি একাএক আসিয়া বিশুদ্ধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায়; কোন ঢেউ লোহিত, কোনটা পীত, কোনটা নীলের জ্ঞান জন্মায়; আর ছোট বড় ঢেউ মিলিয়া একত্র আসিলে অবিশুদ্ধ পাটল পিঙ্গলাদির জ্ঞান দেয়। এ পর্য্যন্ত ঠিক। কিন্তু আর একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। পীত বর্ণ সূর্য্যালোকে আছে, উহা বিশুদ্ধ বর্ণ; নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যযুক্ত ঢেউ ঐ পীত বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু সেই পীত বর্ণের জ্ঞান আবার অন্যরূপেও জন্মিতে পারে। লালের ঢেউ ও সবুজের ঢেউ যদি এক-সঙ্গে একযোগে ধাক্কা দেয়, তাহাতেও পীত বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। এখানে সেই পীতকে বিশুদ্ধ বলিব, কি অবিশুদ্ধ বলিব? পীতের ঢেউ একা আসিয়া যে জ্ঞান জন্মায়, লালের ঢেউ ও সবুজর ঢেউ যুগপৎ আসিয়াও ঠিক সেই পীতের জ্ঞান জন্মায়; কাজেই কোন আলো পীত বর্ণের বলিয়া বোধ হইলে তাহা খাঁটি পীত না হইতেও পারে; উহা লাল আলো ও সবুজ আলো মিশিয়া উৎপন্ন হইতে পারে। কাচের কলম দিয়া বিশ্লেষণ না করিলে ঠিক বলা যাইবে না, উহা খাঁটি পীত, কি ঝুটা পীত।

এক রকমেরই জ্ঞান, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হেতু। এক রকমের ঢেউ ধাক্কা দিয়া যে জ্ঞান জন্মায়, পাঁচ রকমের ঢেউ একসঙ্গে ধাক্কা দিয়াও ঠিক সেই জ্ঞান জন্মাইতে পারে।

ফলে বিশুদ্ধ বর্ণের সংখ্যা অগণ্য, কিন্তু বিশুদ্ধ মূল বর্ণজ্ঞানেও সংখ্যা তিনটি মাত্র। মৌলিক বর্ণজ্ঞান কেবল তিনটি—রক্ত, হরিৎ ও নীল;—বিশিষ্ট রক্ত, বিশিষ্ট হরিৎ, বিশিষ্ট নীল। মৌলিক জ্ঞান তিন রকম; এই তিনটা জ্ঞান বিবিধ ভাগে মিশিয়া বিবিধ যৌগিক জ্ঞানের উৎপাদন করে। যেমন, রক্ত জ্ঞানে ও হরিতের জ্ঞানে মিলিয়া পীতের জ্ঞান হয়।

এই তিন মূল বর্ণ দেওয়া থাকিলে তাহাদিগকে নানা রকম ভাগে মিশাইয়া আর সমুদয় বর্ণ তৈয়ার করা চলে। দুই ভাগ রক্তের সহিত পাঁচ ভাগ হরিৎ মিশাইলে কোন একটা যৌগিক বর্ণ হয়, সাত ভাগ নীল মিশাইলে আর একটা যৌগিক বর্ণ হয়। আবার রক্ত, হরিৎ ও নীল যথাভাগে মিশাইলে শাদা হয়। মৌলিক বর্ণ অসংখ্য নহে, তিনটা মাত্র। তিনটা মাত্র মৌলিক বর্ণের বিবিধ ভাগে মিশ্রণে সূর্য্যের আলোতে বর্ত্তমান সমুদয় বিশুদ্ধ বর্ণ তৈয়ার করিতে পারা যায়; এবং এই সকল বিশুদ্ধ বর্ণ বিবিধ ভাগে মিশাইয়া যাবতীয় পাটল কপিশাদি বর্ণের উৎপাদন চলে। এখানে বর্ণ না বলিয়া বর্ণজ্ঞান বলা ভাল। ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণের মিশ্রণে নানাবিধ বর্ণ জন্মে, না বলিয়া, ত্রিবিধ মৌলিক বর্ণজ্ঞান মিশিয়া নানাবিধ বর্ণের জ্ঞান জন্মায়, বলা ভাল।

একটা বিশিষ্ট ঢেউ অর্থাৎ যে ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিলে একটা বিশিষ্ট বর্ণ হয়, সে ঢেউ দ্বারা অন্য বর্ণের অনুভূতি হইবে না, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু সেই বর্ণের অনুভূতি জন্মিলেই যেন মনে করিও না যে, সেই ঢেউ আসিয়াই ধাক্কা

দিতেছে। অন্য পাঁচ রকমের ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিয়াও সেই একই অনুভূতি জন্মাইতে পারে।

চোখের গঠনে এমন কি আছে, যাহাতে এই অপরূপ ব্যাপার ঘটে? নানাবিধ ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দেয়, অথচ তিন রকম মাত্র মৌলিক বর্ণের বোধ জন্মে; ও সেই তিন বর্ণবুদ্ধি নানা ভাগে মিলিয়া সংখ্যাতীত বর্ণবুদ্ধির উৎপাদন করে? ইহা শারীর-বিদ্যার বিষয়। এ স্থলে এই প্রশ্নের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

সূর্য্যের আলো শাদা। ইহাতে নানাবিধ ঢেউ আছে; কোন ঢেউ মূল লোহিতের, কেহ মূল হরিতের, কেহ মূল নীলের বোধ জন্মায়। কেহ বা লোহিত ও হরিৎ উভয় উৎপাদন করিয়া উভয় মিশাইয়া পীতবুদ্ধি জন্মায়; ইত্যাদি। এবং সকলে আসিয়া একত্রে চোখে ধাক্কা দিয়া লোহিত হরিৎ ও নীল তিন মিশাইয়া শুভ্র বর্ণের বুদ্ধি জন্মায়। এই তিন মূল বর্ণ যথাভাগে একত্র করিলে শাদা হয়। একটার ভাগ কিছু কম হইলেই আলো রঙিল হইয়া যায়। কাজেই শাদা আলোতে যে সকল ঢেউ বর্ত্তমান, সেই ঢেউগুলার মধ্যে কোন কোনটাকে বাছিয়া লইলেই রঙিল আলো হয়; বা কোন কোনটা কোনরূপে সরাইয়া ফেলিলেও রঙিল আলো পাওয়া যায়। রঙিল আলো তৈয়ার করিতে চাও ত সূর্য্যালোকের অন্তর্গত বিবিধ ঢেউয়ের মধ্যে কতকগুলিকে বাছিয়া লও; অথবা কতকগুলিকে কোনরূপে সরাইয়া ফেল। আলোর শুভ্রত্ব বজায় রাখিবার জন্য তিনটা মূল বর্ণের যে যে ভাগ প্রয়োজন, তাহার একটা ভাগ কম পড়িয়া যাইবে, আলোকও রঙিল হইয়া পড়িবে।

এই বাছিয়া লওয়া বা নির্ব্বাচন ও সরাইয়া ফেলা বা অপসারণ কয়েকটি উপায়ে সম্পাদিত হয়। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম উপায়। সূর্য্যের আলো বায়ুর মধ্য হইতে জল বা তেল বা কাচের মত কোন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর গেলে তাহার পথ ঘুরিবা যায়। কেন যায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সকল ঢেউ সমান ঘুরিয়া যায় না। লোহিতজনক ঢেউ যত ঘুরে, পীতজনক তার চেয়ে বেশী ঘুরে, হরিৎজনক তার চেয়ে বেশী, নীলজনক আরও বেশী; এইরূপ। কাজেই শাদা আলোর অন্তর্গত ঢেউগুলি এইরূপ সংহত স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিয়াই পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতে আরম্ভ করে, এবং আবার যখন সেই স্বচ্ছ পদার্থ হইতে বাহির হইয়া বায়ুমধ্যে আসে, তখন আর মিশিবার অবকাশ না পাইলে ভিন্ন পথে চলিতে থাকে। এক এক রকমের ঢেউ এক এক পথে চলিতে থাকে; পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তখন তাহাদের মধ্যে কোন একটিকে বা কতকগুলাকে বাছিয়া লওয়ার সুবিধা হয়। কতকগুলি চোখে প্রবেশ করিয়া ধাক্কা দিলেই রঙিল আলো পাওয়া যায়। এইরূপে ঢেউগুলিকে পরস্পর ছাড়াছাড়ি করিয়া তাহাদিগকে বাছিয়া ফেলাকে আলোক-বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বর্ণ উৎপাদনের এই একটা উপায়। নিউটন এই উপায়েই সূর্য্যালোকের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় উপায়। ঢেউগুলা যতক্ষণ আকাশ-পথে চলে, তত ক্ষণ কেহ তাহাদের গতি রোধ করে না। কিন্তু চলিতে চলিতে কোন জড় পদার্থের বাধা পাইলেই তাহাদের

গতিবিধির ব্যতিক্রম ঘটে। সেই জড় পদার্থের পিঠে প্রতিহত হইয়া কতকতগুলা ঢেউ ফিরিয়া আসে, কতকগুলা হয়ত ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে ভেদ করিয়া যাইবার সময় তাহার পথ বাঁকিয়া যাইতে পারে, তাহা উপরে বলিয়াছি। আবার কতকগুলা ঢেউ হয়ত প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে না, পথ কাটিয়া চলিয়া যাইতেও পারে না; তাহারা সেই জড় দ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলির মধ্যে আটকা পড়িয়া পথিমধ্যেই নষ্ট হয়। যে সকল ঢেউ ফিরিয়া আসে বা প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, তাহাদের সহিত জড় পদার্থের অণুগুলির বড় গোলযোগ ঘটে না। অণুরাও তাদের বাধা দেয় না, তাহারাও অণুগুলিকে কোনরূপ বিচলিত করে না। কিন্তু কতকগুলি ঢেউ অণুগুলিরই গায়ে ধাক্কা দিয়া অণুগুলিকে চঞ্চল করিয়া দোলাইয়া দিয়া যায়। অণুগুলি ধাক্কার পর ধাক্কা খাইয়া চঞ্চল হয় ও কাঁপিতে থাকে; কিন্তু আকাশের ঢেউ সেই চাঞ্চল্য উৎপাদনে থামিয়া যায় ও নষ্ট হয়। অণুগুলি ঐরূপ কাঁপিতে থাকিলে আমরা বলি—তাপের উৎপত্তি হইল, দ্রব্যটা তপ্ত হইল, আলোক নষ্ট তাপের উৎপাদন করিল। এই ঢেউগুলার অদৃষ্ট খারাপ, ইহারা অণুর সহিত লড়াই করিতে গিয়া নিজেরাই নষ্ট হয় ও বস্তুতই পথে মারা যায়।

জড় দ্রব্যের অণুগুলি এইরূপে আকাশের ঢেউগুলিকে নষ্ট করিয়া নিজে কাঁপিতে লাগে; ঢেউগুলিকে আহার করে ও নিজে পুষ্ট হয়; এই ব্যাপারকে আমরা আলোকের শোষণ বলিব। আর ঢেউগুলির জড় পদার্থের গায়ে প্রতিহত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন ব্যাপারকে পরাবর্ত্তন বলিব। এইখানে একটু রহস্য আছে। কোন কোন দ্রব্য সূর্য্যালোকের অন্তর্গত সকল ঢেউকেই ফিরাইয়া দেয় বা পরিবর্ত্তিত করে; যেমন পালিশকরা রূপা, অথবা পারা-মাখান আরশি। শাদা কাগজ, শাদা কাপড়, শাদা খড়ি, শাদা দুধ প্রভৃতি সমস্ত শাদা জিনিষই বাছ বিচার না করিয়া সকল ঢেউকেই ফিরাইয়া দেয়; এবং সকলকেই এইরূপে ফিরায় বলিয়াই তাহারা শাদা। আবার কাল কালি, কাল কাপড়, কাল কাগজ, কাল কয়লা প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় সকল ঢেউকেই বাছাই না করিয়া অপক্ষপাতে শোষণ করিয়া লয়; এবং এইরূপে শুষিয়া লয় বলিয়াই তাহারা কাল। আবার জল বায়ু কাচের মত স্বচ্ছ পদার্থ কোন ঢেউকেই প্রায় ফিরায় না; শোসণেও কোন পক্ষপাত দেখায় না; প্রায় সকলকেই পথ ছাড়িয়া দেয়; তাহারা এই জন্যই স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। এতদ্ব্যতীত রঙিন কাচ, রঙিল কাগজ, রঙিল কাপড়, ইহাদের বর্ণ রঙিল এইজন্য যে, ইহারা পক্ষপাতপরায়ণ; সকল ঢেউয়ের উপর ইহাদের সমান বিচার নাই; ফিরাইবার সময় কোন কোন ঢেউকে বাছাই করিয়া ফিরাইয়া দেয়; শোষণের সময় কোন কোন ঢেউকে বাছিয়া শুষিয়া লয়; সকলের প্রতি সমান বিচার করে না। ফলে কোন কোন ঢেউ আটক পড়িয়া শোষিত হয়: আবার কেহ বা ফিরিয়া আসে, কেহ বা পথ ভেদ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। এই নির্ব্বাচনের ফলে শুভ্র আলো আমরা ফেরত পাই না। যে আলো ফিরিয়া আসে বা পথ ভেদ করিয়া চলিতে পায়, সে আলো রঙিন দেখায়। এই নির্ব্বাচন-ক্রিয়া প্রাকৃতিক বর্ণ-বৈচিত্র্যের একটা প্রধান হেতু।

তৃতীয় উপায়। এই তৃতীয় উপায় বুঝিবার পূর্ব্বে ঢেউ-তত্ত্বের আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ঢেউ, ঊর্ম্মি, তরঙ্গ, হিল্লোল, যাহাই বল, এই সকলের একটু বিশিষ্টত্ব আছে। জলের ঢেউ মনে কর। জলাশয়ের পিঠে তরঙ্গের পর তরঙ্গ চলে দেখা যায়; কোন দ্রব্য যদি সে সময়ে জলে ভাসে, সে দ্রব্য সেই তরঙ্গের ভঙ্গীতে একবার উঠে, একবার নামে। এই উঠা-নামা তরঙ্গ মাত্রেরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম। তরঙ্গের পর তরঙ্গ যখন চলিয়া যায়, তখন দেখা যাইবে, জল একবার উঠিতেছে, একবার নামিতেছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গের সারি চলিয়াছে; তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, উঁচু নীচু উঁচু নীচু উঁচু নীচু; এইরূপ ক্রমান্বয়ে পর পর ঊর্ম্মিগুলি চলিয়াছে। একটা গোটা ঊর্ম্মির অর্দ্ধেক ভাগ উঁচু, সেই ভাগকে আমরা ঊর্ম্মির মাথা বলিব; আর অর্দ্ধেক ভাগ নীচু, সেই ভাগকে পেট বলিব। মাথা আর পেট, এই শব্দ দুইটা সভ্যসমাজের অনুমোদিত হইবে না; কিন্তু এক্ষণে পরিভাষা-সঙ্কলন-শ্রমের অবসর নাই। প্রত্যেক তরঙ্গের এক ভাগ মাথা, এক ভাগ পেট। এখন মনে কর, দুইটা স্থান হইতে তরঙ্গশ্রেণী জন্মিয়া চলিতেছে। পুকুরের জলে একটি ঢিল ছুড়িলে সেখান হইতে এক সারি তরঙ্গ জন্মিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে; আবার এক জায়গায় ঢিল ফেলিলে সেখান হইতেও আর এক সারি তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চারি দিকে বিস্তৃত হয়। এইরূপ দুইটা স্থান হইতে সারি সারি ঢেউ আসিতে থাকিলে এমন হয়, এ-সারির ঢেউয়ের উপর ও-সারি আসিয়া পড়ে। ইহার মাথার উপর উহার মাথা পড়ে, ইহার পেটের উপর উহার পেট পড়ে; আবার কোথাও বা এক সারির মাথার উপর আর এক সারির পেট পড়ে। এইরূপ ঘটনা জলাশয়ের পৃষ্ঠে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দেখা যায়; এখন একটার মাথার উপর আর একটার পেট পড়িলে উভয়ে কাটাকাটি হইয়া সেখানে মাথাও থাকে না, পেটও থাকে না। সেখানে জল উঁচুও হয় না, নীচুও হয় না, ঠিক সমতল থাকিয়া যায়; ঢেউয়ের উপর ঢেউ পড়িয়া পরস্পরকে নষ্ট করিয়া ফেলে। জলের ঢেউয়ের মধ্যে যেমন কাটাকাটি হয়, তেমনই আকাশের ঢেউয়ের মধ্যেও কাটাকাটি হইয়া ঢেউ নষ্ট হইবে। ফলে, আমরা যাহাকে ছায়া বলি ক্রমে পড়িলেই কাটাকাটি হইয়া ঢেউ নষ্ট হইবে। ফলে, আমরা যাহাকে ছায়া বলি ও অন্ধকার বলি, তাহা এইরূপ কাটাকাটিরই ফল। আঁধারের মধ্যে আকাশের ঢেউ একবারে নাই, এরূপ মনে করিও না; সেখানে এত অসংখ্য ঢেউ এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে যে, পরস্পর কাটাকাটিতে সকলেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আলোতে আলোতে মিলিয়া একেবারে আঁধার হইয়া গিয়াছে। এইরূপে আলোর উপর আলো চড়িয়া আঁধার হইয়া যায়। কিন্তু কখনও বা সম্পূর্ণ আঁধার না হইয়া আলোটা রঙিল হইয়া যায়। সূর্য্যের আলোকের মধ্যে লাল আলো লাল আলোর সঙ্গে মিলিয়া লালকেই বিলুপ্ত করে; নীল নীলের সঙ্গে মিলিলে নীলই বিলুপ্ত হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা রঙিল দেখায়। শাদা হইতে তাহার একটা রঙিল অংশ নষ্ট হইলে বা অপসারিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা রঙিল দেখায়।

এইরূপে বর্ণোৎপত্তির দৃষ্টান্ত বিস্তর পাওয়া যায়। জলে এক ফোঁটা তেল ফেলিলে

সেই তেলের ফোঁটা অনেকটা বিস্তীর্ণ জায়গায় তখনই ছড়াইয়া পড়ে। তখন তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বিকাশ দেখা যায়। জলের উপর তেলের একখানি সূক্ষ্ম পর্দ্দা বা আস্তরণ পড়িয়া যায়। তাহার স্থূলতা মাপিতে হইলে আর ইঞ্চির মাপকাঠিতে চলে না; ইঞ্চিকে লক্ষ ভাগ, কি দশ লক্ষ ভাগ করিতে হয়। আকাশবাহী আলোকোৎপাদক ঢেউগুলি যে কাঠিতে মাপা যায়, এই পর্দ্দার স্থূলতাও সেই মাপকাঠিতে মাপিতে হইবে। এখন মনে কর, তেলের ঐ সূক্ষ্ম পর্দ্দার পিঠে লাল আলোর ঢেউ পড়িল। কতকগুলা ঢেউ সেই পিঠে লাগিয়াই প্রতিহত ও প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। কতকগুলা তেলের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়া নিম্নস্থ জলের পিঠে ঠেকিয়া পরাবর্ত্তিত হইবে ও ফিরিয়া চলিয়া আসিবে। তেলের পিঠ হইতে যাহারা ফিরে, তাহারা একটু আগিয়া থাকে; যাহারা জলের পিঠ হইতে ফিরে, তাহারা একটু পিছাইয়া পড়ে। একটু পিছাইয়া পড়ায় এমন ঘটে যে, ইহাদের মাথার উপর উহাদের পেট আসিয়া পড়ে; ফলে উভয়েরই লোপাপত্তি ঘটে, কেহই আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে না; পথমধ্যেই তাহাদের ঢেউ-লীলার সমাপ্তি হয়। এইরূপে লাল আলোর লোপ হয়; নীল আলো পড়িলে তাহার ভাগ্য ততটা মন্দ হয় না। কেন না, লাল আলোর ঢেউগুলা একটু লম্বা লম্বা; নীল আলোর ঢেউ তাহার চেয়ে একটু খাটো খাটো; নীলের যে সকল ঢেউ তেলের পর্দ্দায় প্রবেশ করিয়া ফিরিয়া আসে, তাহারা পিছু পড়ে, এমন কি, তাহারা খাটো বলিয়া একটু অধিকই পিছাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহাতেই তাহারা আবার বাঁচিয়া যায়। পিছাইয়া পড়ে বলিয়া তাহাদের পক্ষে মাথায় পেটে ঠোকাঠুকি ঘটে না ও ফলে তাহারা বাঁচিয়া যায়। লাল রঙের লোপ হইলে নীল রঙ নিষ্কৃতি পায়। শাদা আলো পড়িলে তাহার মধ্যে লাল রঙ মাত্র লোপ পায়; বাকী রঙগুলা তেলের পিঠ হইতে রঙদার হইয়া ফিরিয়া আসে। দল বাঁধিয়া সকলেই যায়—তখন আলো থাকে শাদা; যখন সঙ্গী-হারা হইয়া ফিরিয়া আসে, তখন আলো হয় রঙিল।

আর এক রকমে বর্ণবিশেষের লোপ ঘটে। আলোকের অনেকগুলা সরু সরু পথ বা উৎপত্তিস্থান সারি সারি কাছাকাছি থাকিলে সকল স্থান হইতে ঢেউ আসে। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে একসঙ্গে পৌঁছিতে পারে না; কেহ বা একটু আগে পৌঁছে, কেহ একটু পরে পৌঁছে; কাজেই ইহার পেট উহার মাথায় ও ইহার মাথা উহার পেটে লাগিয়া আলোর লোপ ঘটিয়া আঁধার ঘটে, অথবা বর্ণবিশেষের লোপ ঘটিয়া শাদা আলো রঙিল আলোতে পরিণত হয়। হাতের দুই আঙ্গুল সংলগ্ন করিলে তাহার মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ দীর্ঘাকার ফাঁক থাকে, অথবা কাগজে ছুঁচ দিয়া ফুটা করিলে আলোর যে ছোট পথ হয়, সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র ফাঁকে বা পথে চোখ রাখিলে দেখা যায়, পথ দিয়া আলো আসিতেছে বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে কাল কাল রেখা পড়িয়া গিয়াছে। একখানা পালিশ-করা ধাতুফলকের গায়ে বা একখানা কাঁচের গায়ে খুব কাছাকাছি করিয়া, এক ইঞ্চি স্থানের ভিতর দু-দশ হাজার করিয়া সামন্তরাল রেখা টানিলে, দুই দুই রেখার মধ্যগত স্থান হইতে আলো আসে, এবং সেই বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত আলো পরস্পর কাটাকাটি করিয়া রঙিল আলোর উৎপাদন করিয়া

থাকে। মশা মাঝি ফড়িঙ প্রভৃতি যখন সূর্য্যালোকে উড়িয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের পাখায় নানাবিধ রঙের আবির্ভাব দেখা যায়। সেই সকল রঙ এই কারণেই উৎপন্ন হয়। তাহাদের পাখার গায়ে লম্বা লম্বা সরু সরু অনেক রেখা আছে। সেই সকল রেখার মধ্যস্থিত নানা স্থান হইতে প্রতিফলিত ঢেউ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া রঙিল আলো সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক দ্রব্যে বিবিধ বর্ণের বিকাশের এই কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করিলাম। এখন গোটাকতক উদাহরণ দিলেই পাঠক পরিত্রাণ পান।

শাদা আলো ভাঙ্গিয়া বিশিষ্ট হইয়া রঙ জন্মে। স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর আলো ঢুকিয়া ঢেউগুলির পথ ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। রামধনুর বিচিত্র বর্ণ এই কারণে জন্মে। সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল ঘেরিয়া সময়ে সময়ে যে মণ্ডল বা পরিবেশ দেখা যায়, সেও এইরূপে রঞ্জিত দেখায়। মেঘের অন্তর্গত জলকণা বা তুষারকণা শুভ্র আলোককে ভাঙ্গিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ছড়াইয়া দেয়। ঝাড়ের কলমের রঙ, দূর্ব্বা-দলে শিশিরবিন্দুর রঙ, হীরকখণ্ডে রঙ, এ সকলের একই হেতু। একই হেতু—আলোকের বিশ্লেষণ।

রঙিল কাচের রঙ, রঙিল জলের রঙ অন্য কারণে উৎপন্ন। শাদা আলো ভিতরে প্রবেশ করিল; কোন কোন রঙ আটকাইয়া শোষিত হইয়া গেল; বাকীগুলা ফিরিয়া আসিল। কোন কোন বায়বীয় পদার্থ রঙিল দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে কোন একটা রঙ আটকান যায়; বাকীগুলা চলিয়া আসে। রঙিল কাগজে ও রঙিল কাপড়ে যে সকল রঙ মাখান হয়, কাঠের গায়ে দেওয়ালের গায়ে যে সব রঙ মাখান দেখা যায়, ছবি আঁকিতে চিত্রকর যে সমুদয় রঙ ব্যবহার করে, সোনা তামা পিতল প্রভৃতি ধাতুদ্রব্যে যে যে রঙ দেখা যায়, এ সমস্তই এইরূপে উৎ-পন্ন। শাদা আলো গিয়া পিঠে পড়িল। তাহার মধ্যে কোন কোন রঙের আলো একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আটক পড়িল। কোন কোন রঙের আলো ফিরিয়া আসিল।

সাগরে জলের বর্ণ গাঢ় নীল; শুভ্র সূর্য্যালোকের সহস্রবিধ ঢেউ সমুদ্রবক্ষে পড়ে; সকলে ফিরিয়া আসে না; সমুদ্রের জলরাশি বাছিয়া বাছিয়া কাহাকে টানিয়া লয় ও শোষণ করে; কাহাকেও বা ফিরাইয়া দেয়।

আকাশের বর্ণ নীল কেন? বায়ুমধ্যে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা সর্ব্বদা ভাসিতেছে। কণা এত সূক্ষ্ম যে, চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। আজকাল তাহাদের সংখ্যা গণিবার উপায় স্থির হইয়াছে। একটা কুঠরির মধ্যে বায়ুতে কত কোটি ধূলি-কণা আছে, তাহা গণিতে আজিকালি অধিক আয়াস পাইতে হয় না। এই ধূলিকণা আকাশের নীল বর্ণের হেতু। আকাশ বাহিয়া ছোট বড় নানাবিধ ঢেউ চলে। ধূলিকণাগুলি এত ছোট যে, লাল আলোর ঢেউ বা পীত আলোর ঢেউ তাহাদের পক্ষে বৃহৎ ঢেউ; উহারা ধূলিকণা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। নীল আলোর ঢেউ ছোট; তাই তাহারা ধূলিকণাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যেমন ক্ষুদ্র উপলখণ্ড জলের বড় বড় তরঙ্গকে প্রতিহত করে না; কিন্তু ছোট ছোট

মৃদু হিল্লোলকে ফিরাইয়া দেয়; কতকটা সেইরূপ। সূর্য্যের শুভ্র আলোক বায়ুরাশিতে প্রবেশ করে। রক্ত পীত অবাধে চলিয়া যায়। নীল ফিরিয়া আসিয়া চোখে লাগে।

সূর্য্য অস্তগমনের সময় ও উদয়ের সময় দিগ্বলয় অরুণ রাগে রঞ্জিত হয়। সূর্য্যের আলো তখন গভীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আসে। ধূলিকণায় ঠেকিয়া নীল আলোর ভাগ প্রতিহত হয় ও সূর্য্যের অভিমুখেই ফিরিয়া যায়। রক্তের ভাগ ও অরুণের ভাগ বায়ু ভেদ করিয়া চলিয়া আসে। সেই অরুণরাগরঞ্জিত আলো আবার মেঘের গায়ে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র অরুণ বর্ণের বিকাশ করে।

শোণিতের বর্ণ লোহিত। তরল শোণিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভাসে; তাহারা নীলের ভাগ হরণ করিয়া ও শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষ লতা তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদের সাধারণ বর্ণ হরিৎ; তাহাদের পাতার গায়ে এক প্রকার প্রলেপ থাকে, উহা লোহিতের ভাগ হরণ করে ও শোষণ করে; যে সকল ঢেউ প্রতিফলিত করে, তাহারা একত্র মিশিয়া হরিতের আবিষ্কার করে।

হরিতালের পীত, সিন্দুরের লোহিত, তুঁতের নীল, শীরাকষের সবুজ একই কারণে উৎপন্ন। শাদা আলোর মধ্যে কেহ কোন রঙের ঢেউ বাছিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা আর কোন রঙের ঢেউ বাছিয়া গ্রহণ করে; যে সকল ঢেউ ফিরিয়া আসে, তাহারা একত্র মিশিয়া পীত বা লোহিত, নীল বা সবুজের অনুভূতি জন্মায়।

অমুক দ্রব্যের রঙ পীত দেখিয়া যেন মনে করিও না যে, উহা বিশুদ্ধ পীত। হয়ত, পীতজনক ঢেউ একবারেই বিদ্যমান নাই;—অন্য পাঁচ রঙের ঢেউ একত্র মিলিয়া পীতের অনুভূতি জন্মাইতেছে মাত্র।

পদার্থ মাত্রই পরমাণুর বিবিধ বিধানে সন্নিবেশে গঠিত। পরমাণুর গঠনের সহিত ও তাহাদের সন্নিবেশের সহিত বর্ণোৎপাদনের কি সম্পর্ক আছে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে কিছু সম্পর্ক আছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি ধাতুপদার্থ আছে,—তামা, লোহা, ক্রোম, মঙ্গন, নিকেল, কোবাল্ট,—এই সকল ধাতব পদার্থ যে সকল দ্রব্যে বর্ত্তমান, তাহারা প্রায়ই নানা বর্ণের বিকাশ করে। রঙিল কাচের রঙ ও বিবিধ মণিরত্নাদির রঙ এই কয়েকটি ধাতু দ্রব্যের অস্তিত্বসূত্রে জন্মে। আবার আলকাতরা হইতে ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি এক শ্রেণীর পদার্থের উৎপাদন হইতেছে, বিভিন্ন পরমাণুর সন্নিবেশ হেতু তাহারাও বিচিত্র বর্ণের উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ।

জলে তেলের ফোঁটা ফেলিলে তাহা বিস্তার লাভ করিয়া সূক্ষ্ম আস্তরণের মত হইয়া যায় ও বর্ণের বিকাশ করে। কিরূপে করে, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঢেউগুলির মধ্যে কাটাকাটি হইয়া যায়। এইরূপে বর্ণবিকাশের বিস্তর উদাহরণ আছে। সাবানের ফেনার গায়ে রঙ, জলবুদ্বুদের পিঠে রোদ পড়িলে তাহার রঙ, মসৃণ ধাতুপৃষ্ঠে ময়লা জমিলে বা মরিচা জমিলে তাহার রঙ, ঝিনুকের পিঠের রঙ, শঙ্খশম্বুকের রঙ এই কারণে উৎপন্ন হয়। মাছির পাখায়, ফড়িঙের পাখায়, পাখীর পালকে, প্রজাপতির গায়ে রঙও অনেক সময় এই কারণেই উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিদের একটা সাধারণ বর্ণ আছে, হরিৎ; কিন্তু ফুলের কোন বাঁধাবাঁধি রঙ নাই। আবার জীবশরীরের কোন সাধারণ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট নাই। এক এক ফুলের এক এক রঙ। এই বিচিত্র বর্ণের বিকাশ নানা কারণে ঘটে। কখনও বা গায়ের উপর এমন কোন প্রলেপ থাকে, যাহাতে কোন কোন ঢেউ বাছিয়া শুষিয়া লয়; অন্য অন্য ঢেউ ফিরাইয়া দেয়। কোথাও বা গায়ের উপর সরু পর্দ্দা থাকায় কোন একটা ঢেউ কাটাকাটি হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। আবার কখনও বা গায়ের উপর সরু সরু ঘনসন্নিবিষ্ট রেখা থাকে; তজ্জন্য এক ঢেউ অন্য ঢেউকে কাটে। জীব-শরীরে ও পুষ্প-শরীরে বর্ণবিকাশের উদ্দেশ্য জানিতে হইলে ডারুইনের নিকট যাইতে হইবে। জীবনযাত্রায় লাভ লক্ষ্য করিয়া জীবের দেহে বর্ণ বিকাশ ঘটে। এ স্থলে আমরা সেই ইতিহাসের অবতারণা করিব না।

উপসংহারে একটা তত্ত্বকথা আসিয়া পড়ে। জগতে এই বিচিত্র বর্ণ-বিকাশে কাহারও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে কি না? ইহার সহিত কোনরূপ শুভাশুভের সম্পর্ক রহিয়াছে কি না? যাঁহারা প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে বিধাতার একটা নিগূঢ় শুভ উদ্দেশ্য আবিষ্কার না করিলে তৃপ্তিলাভ করেন না, তাঁহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য এই তত্ত্বকথাটার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম কথা, বিবিধ বর্ণবিকাশে আমাদের একটা মোটা লাভ চোখের উপরেই দেখা যাইতেছে। নানাবিধ দ্রব্য নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখাতে বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের কারবারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। বর্ণের ভেদ দেখিয়া আমরা বিবিধ দ্রব্যের সহিত সহজে পরিচিত হইতে পারি; তাহাদিগকে চিহ্নিত করিয়া চিনিয়া লইবার সুবিধা হয়। সুতরাং বিবিধ বর্ণের বিকাশ আমাদের জীবনযাত্রার অনুকূল। আবার বর্ণবৈচিত্র্যে জীবন-যাত্রায় যেমন এইরূপ সুবিধা হইয়াছে, তেমনই কতকটা আনন্দ পাইবারও বেশ ব্যবস্থা হইয়াছে। সকল দ্রব্য এক রঙের হইলে বাহ্য জগৎ নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া পড়িত। বর্ত্তমান বিচিত্র বর্ণবহুল নানারাগরঞ্জিত জগতে যিনি কিছু দিন বাস করিয়াছেন, কোন একরঙা জগতে বাস করিতে তিনি কখনই আনন্দ পাইবেন না।

বর্ণ বৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার সুবিধা হয়; আর তা ছাড়া কতকটা আনন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিলে তৃপ্তি হইবে না। আরও সূক্ষ্ম হিসাবে আসিতে হইবে।

আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা কি? আকাশ নীল হওয়াতে কিছু লাভ হইয়াছে কি? নীলাকাশ দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হয় জানি; কিন্তু নীল না হইয়া আকাশ যদি লোহিত হইত, তবে তেমন প্রফুল্লতা জন্মিত কি না, সহজে বলিতে পারি না। সিন্দূরের রক্ত রাগে, হরিতালের পীত রাগে এমন শুভ উদ্দেশ্য কিছু আছে কি? সুন্দরীর সীমন্তরঞ্জনের জন্য সিন্দূর সৃষ্ট হইয়া স্রষ্টার মঙ্গলোদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেছে বলিতে পারি; কিন্তু যখন সুন্দরীর ক্রোড়স্থিত শিশু সিন্দূরের উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া উহা গলাধঃকরণ করে, তখন সেই মঙ্গলোদ্দেশ্য কোথায় থাকে? নীলাম্বুধির নীলিমা নয়নের তৃপ্তিসাধন করে সত্য; কিন্তু প্রাকৃতিক নীলাম্বুধি পৌরাণিক ক্ষীরাম্বুধিতে পরিণত হইলে

কি আরও উপাদেও হইত না। তমালতালীবনরাজিনীলা সাগরবেলা নয়নরঞ্জিনী সন্দেহ নাই ; কিন্তু নীলার বদলে পীতা বিশেষণে বিশিষ্ট হইলে নয়ন কি একেবারেই ঝলসিয়া যাইত ?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর আমার এখন নাই। তত্ত্বান্বেষীদের উপর এই সকল তত্ত্বের মীমাংসার ভার দিয়া আমরা জগতের বর্ত্তমান বর্ণবৈচিত্র্যে যে আনন্দটুকু পাইয়া থাকি, তাহাই উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হইব। আকাশ নীল না হইয়া পীত হইলে কি ক্ষতি হইত, তত্ত্বান্বেষীরা স্থির করিয়া বলিয়া দিবেন। আমরা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল রূপে বিশ্বসৌন্দর্য্যের রূপ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দসুধা পান করিতে থাকিব। এই আমাদিগের পরম লাভ।

প্রতীত্যসমুৎপাদ

দুঃখব্যাধি-নিপীড়িত চিরাতুর জীবলোকের ব্যাধি-প্রমোচনের জন্য ভগবান্ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বৈদ্যরাজের স্বরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, মানবজাতির তৃতীয়াংশের অদ্যাপি এইরূপ বিশ্বাস। চিকিৎসকেরা নিদানশাস্ত্রে রোগোৎপত্তির হেতু নির্ণয় করেন। ভব-ব্যাধি-প্রমোচক জ্ঞানদয়াসিন্ধু বৈদ্যরাজ বোধিদ্রুমমূলে সম্বোধি লাভের সময় জীব-ব্যাধির হেতুস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; সেই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই ;—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ।

এই নিদানতত্ত্বের বা প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য্য লইয়া নানা মতভেদ আছে। বৌদ্ধ আচার্য্যেরা সকলে একমতে ইহার ব্যাখ্যা করেন না। হীনযানী আচার্য্যদের ব্যাখ্যা মহাযানীদের সহিত ঠিক মিলে না ; মহাযানীদের মধ্যেও সর্ব্ববাদীসম্মত ব্যাখ্যা আছে, এরূপ বোধ হয় না। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের বাহিরে অন্যান্য দার্শনিকেরাও ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরাও একটা চরম মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের পক্ষে এটা প্রথা। এই প্রচলিত প্রথার সমালোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। তবে পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র শিরোধার্য্য না করিলে বে-আইনি কাজ হইবে না, এই ভরসায় বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

বৌদ্ধ নিদানতত্ত্বের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে দ্বাদশটি নিদানের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, নাম কয়টি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য্য ঠিক না বুঝিলে বিচারমোহ ঘটে। এক একটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বাঙ্গলা শব্দের অর্থ অপেক্ষা ইংরেজী শব্দের অর্থ ভাল বুঝি। সেই জন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। পাঠক-

বর্গ এই রুচিবিরুদ্ধ আচরণ মার্জ্জনা করিবেন।

১। অবিদ্যা—এই শব্দটি আমাদের দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রচলিত। উহা কেবল বৌদ্ধগণের একচেটিয়া নহে। বিদ্যা অর্থে জ্ঞান; জ্ঞানের অভাবই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান। আপাততঃ বেশ স্পষ্ট হইল। কিন্তু অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞানের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য, স্থির করা দুষ্কর। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বোধ হয় বলিতে চাহেন, জগতের বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা স্বরূপ-জ্ঞান নহে; তাহা একটা ভ্রম। উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, উহা ভ্রান্ত জ্ঞান। একালের অজ্ঞেয়বাদী অথবা আগ্নষ্টিক পণ্ডিতেরা বলেন, জগতের স্বরূপ আমরা জানি না, আমাদের জানিবার উপায় নাই, জানিবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার একটু মতভেদ আছে। আগ্নষ্টিকদের মধ্যেও আবার দলভেদ আছে। আচার্য্য হক্সলি আগ্নষ্টিক উপাধির স্রষ্টিকর্ত্তা; তিনি ঐ নামে আপনার পরিচয় দিতেন। লোকে হার্বার্ট স্পেন্সারকেও আগ্নষ্টিক বলিয়া জানে। কিন্তু উভয়ে ঠিক একই রকম অজ্ঞেয়বাদী নহেন। স্পেন্সার বলেন, জগতের মূল রহস্য, মূল তথ্য আমাদের চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে। হক্সলি কোন জাগতিক তথ্যকে একেবারে অজ্ঞেয় বলিতে চাহিতেন না; তবে এই তথ্যটি আমি সম্প্রতি জানি না, ঐ তথ্যটি আমি সম্প্রতি জানি না, এই পর্যন্ত বলিতে প্রস্তুত ছিলেন। কোনও দুর্ভাগ্য ব্যক্তি অজ্ঞানবিষয়ে জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলে, তাহার স্পর্দ্ধা হক্সলির প্রেরিত মুদ্গরাঘাতে পিষ্ট ও বিদীর্ণ হইয়া যাইত। প্রকৃতপক্ষে স্পেন্সারকে অজ্ঞেয়বাদী আর হক্সলিকে অজ্ঞানবাদী বলা যাইতে পারে। ভ্রান্তিবাদের ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে প্রভেদ স্থাপন কঠিন কাজ। বৌদ্ধ এবং বেদান্তিকের অবিদ্যা-বাদকে ভ্রান্তিবাদ বলা যাইতে পারে। জগতের স্বরূপ আমি জানি না, ইহা অজ্ঞান-বাদ; জগতের সম্পর্কে আমার যে জ্ঞানটুকু আছে, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান, ইহা ভ্রান্তিবাদ। এই দুই মতের মধ্যে কতটুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বিসংবাদ বাধাইবার সম্প্রতি কোন প্রয়োজন নাই।

ফলে উভয়ের মধ্যে কোনও রেখা টানা কঠিন। প্রকৃত তথ্য জানি না—বলিলেই বুঝায় যে, যে-তথ্য জানি, তাহা মিথ্যা; কাজেই অবিদ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়া পড়ে। সে যাই হউক, বৌদ্ধদর্শনের অবিদ্যা অর্থে ভ্রান্তি মনে করিলে অধিক দোষ ঘটিবে না।

২। সংস্কার—এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থগ্রহ দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা নানা জনে নানা অর্থ করিয়াছেন। বৌদ্ধ-দর্শনে সংস্কার শব্দের আর এক স্থানে প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধ-দর্শনোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় স্কন্ধের নামও সংস্কার। এই পাঁচ স্কন্ধের বিষয়ে পরে বলা যাইবে। নিদান-মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্কন্ধ-মধ্যে গৃহীত সংস্কার, উভয় সংস্কারের তাৎপর্য্যগত প্রভেদ আছে বোধ হয় না। সেই সংস্কার শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গোটাকতক দৃষ্টান্ত লওয়া যাক।

বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে সংস্কারসমূহের মধ্যে বাহান্নরূপ প্রকারভেদ বর্তমান। বাহান্নটা সংস্কারের উল্লেখে প্রয়োজন নাই। কতকগুলির নাম উল্লেখ করিলেই, সংস্কার শব্দের

তাৎপর্য্য কি, তাহা কতক বুঝা যাইবে। একটা সংস্কারের নাম স্পর্শ--বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ; আর একটার নাম বেদনা,—স্পর্শ-ফলে উৎপন্ন রূপরসাদির অনুভূতি বা sensation; আর একটার নাম চেতনা—নানাবিধ রূপরসাদি অনুভূতির বোধ; ইংরেজীতে perception। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংস্কার যথা,—স্মৃতি, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, মোহ, লজ্জা, করুণা, ঈর্ষা ইত্যাদি। ফলে মানসিক ব্যাপার মাত্রই,—মনুষ্যের যত কিছু চিত্তবৃত্তি বর্ত্তমান,—ইংরেজিতে বলিলে sensation, emotions, cognitions, volitions, এ সমস্তই সংস্কার। মনে কর, সহসা আমার সম্মুখে একটা সাপ উপস্থিত। এ স্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার ঘটে? একটা দীর্ঘাকার বক্রগতি দ্রব্যের সহিত দর্শনেন্দ্রিয়ের স্পর্শ ঘটে; তৎফলে তাহার রূপের বেদনা বা অনুভব ঘটে; সেই অনুভব পূর্ব্বলব্ধ অনুভবের স্মৃতির উদ্রেক করে; পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেকে চেতনা উহাকে সর্প বলিয়া চিনিয়া লয়,—তার পর উপস্থিত বিপদের মোহ অর্থাৎ শঙ্কা; এবং সেই সঙ্গে কর্ত্তব্য নিরূপণে বিতর্ক ও বিচার উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পলায়নে প্রবৃত্তি জন্মে।

এখন এই স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া পলায়নে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত যত কিছু মানসিক ব্যাপার, যত কিছু চিত্তবৃত্তি, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত। ইংরাজীতে আজকাল psychosis নামে একটি শব্দের ব্যবহার হইতেছে, সেই psychosisমাত্রাকে সংস্কারের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। রূপ একটা সংস্কার; রস সংস্কার; শব্দ সংস্কার; অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কার; ভয়, মোহ প্রভৃতিও সংস্কার। এই সকল সংস্কার একত্রে যোগে আমার অন্তঃ-শরীর। অন্তঃ-শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যে সকল টুকরা পাওয়া যায়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। কেন না, রূপ রস গন্ধ, শীত গ্রীষ্ম, জ্বালা যাতনা, সুখ দুঃখ, বুদ্ধি স্মৃতি, ভয় হর্ষ লজ্জা, চেষ্টা প্রযত্ন প্রভৃতি সমস্তই সংস্কার।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই সমস্ত সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া সমষ্টি করিলেই আমার অন্তঃশরীর সম্পূর্ণ হয় কি? বোধ করি, হয় না। পূর্ণতা সাধনের জন্য আর একটার প্রয়োজন; সেটা সংস্কারের অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ; তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্তী তৃতীয় নিদান।

৩। বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের ইংরাজী নাম consciousness; এই বিজ্ঞানের সহিত সংস্কারগুলির সম্পর্ক কি? আমার মধ্যে যে সকল রূপরস-গন্ধ, প্রতীতি বুদ্ধি স্মৃতি শোক হর্ষ লজ্জা ভয় সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, তাহারা যদি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধশূন্য স্বস্বপ্রধান হইয়া বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে আমার বলিয়া জানিতে পারিতাম না। ঐ সকল ছাড়া আর একটা চিদ্‌বৃত্তি বর্ত্তমান আছে, যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, সকলকে একত্র টানিয়া আনে, জড়াইয়া রাখে, সকলকে যথাস্থানে সন্নিবেশ করে, সকলকে সাজাইয়া গোছাইয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমার অন্তঃশরীর নির্ম্মাণ করে। নাপিত যখন ক্ষুরপ্রয়োগে আমার কেশগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক কখন তাঁহার ছুরিকাপ্রয়োগে

আমার অঙ্গুলি কয়েকটি কাটিয়া লয়েন, তখন সেই কেশ, সেই অঙ্গুলি আর আমার থাকে না। তাহাদের প্রতি যতই মমতার সহিত চাহিয়া দেখি না কেন, তাহারা তখন আর আমার নয়। এমন কি, আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন করিতে পারি না, তখন সেই অবয়ব সম্পূর্ণ ভাবে আমার থাকে না। সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার অন্তঃশরীরের অঙ্গস্বরূপ হইলেও, তাহারা যতক্ষণ যথাস্থানে বিন্যস্ত ও আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা আমার হয় না। এই বিন্যাসের, সন্নিবেশের ও যথাযোগ্য কর্মে বিনিয়োগের ভার যাহার উপর, তাহারই নাম বিজ্ঞান। সাপের উদ্যত ফণা দেখিলাম ও সাপের ফোঁস শব্দ শুনিলাম, এই দুই অসম্বদ্ধ প্রত্যয় মাত্রে আমার সর্পবুদ্ধি জন্মে না। সেই রূপের সহিত সেই শব্দের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক; পূর্ব্বদৃষ্ট তাদৃশ রূপের ও পূর্ব্বশ্রুত তাদৃশ শব্দের স্মৃতি তাহার সহিত যুক্ত হইলে সর্পবুদ্ধির উদ্বোধন হইবে। তবে আমি জানিব যে, আমি একটা সাপ দেখিতেছি। এই সর্পবুদ্ধি উৎপাদন ব্যাপারের অঘটন-ঘটনা-পটু কর্ত্তার নাম বিজ্ঞান।

৪। নাম রূপ—এই পারিভাষিক শব্দটির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা জগৎকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি, একটার নাম বাহ্য জগৎ, আর একটার নাম অন্তর্জগৎ। আমার জড় দেহটা আমার অন্তঃশরীরের বাহিরে; প্রকৃত পক্ষে ইহা বাহ্য জগতের অন্তর্গত। আর আমার বেদনা তৃষ্ণা, লজ্জাভয়, সুখদুঃখ আমার অন্তঃশরীরের অন্তর্গত। সমস্ত জগতের এই দুই ভাগ,—চলিত ভাষায় একটাকে মনোজগৎ, একটাকে জড় জগৎ বলিলে দোষ হইবে না। এই দুইটা জগৎ আমার জ্ঞানগম্য; ইহাদিগকে লইয়াই আমার কারবার; এই দুইকে ছাড়িয়ে আর তৃতীয় জগৎ নাই। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে সমস্ত জগতের দুই ভাগ; একটা নাম—স্থূল কথায় অন্তর্জগৎ বা মনো-জগৎ; আর একটা রূপ—স্থূল কথায় বাহ্য জগৎ বা জড় জগৎ। নাম ও রূপ উভয় লইয়া সমস্ত জ্ঞানগম্য জগৎ—বৌদ্ধ মতে এই উভয় ছাড়িয়া আর তৃতীয় জগতের অস্তিত্ব নাই। নাম এবং রূপ একত্র যোগে নাম-রূপ বা সমস্ত জগৎ। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় এই নামরূপ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি স্কন্ধ একত্র যোগে নাম। আর ক্ষিতি অপ্ তেজ ও মরুৎ, এই চারটি মহাভূতের সমষ্টি পঞ্চম স্কন্ধ অথবা রূপ। বেদনা অর্থে সমুদয় sensation অর্থাৎ অনুভূতি বুঝিতে হইবে। সংজ্ঞা বলিলে সমুদয় বোধ বা প্রতীতি অর্থাৎ perception বুঝিতে হইবে। তৃতীয় স্কন্ধ সংস্কারের তাৎপর্য্য উপরেই বলা গিয়াছে। এ স্থলে সংস্কার অর্থে বেদনা ও সংজ্ঞা ছাড়া অপর সমস্ত চিদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ শোক হর্ষ, লজ্জা ভয়, স্মৃতি, বিচার বিতর্ক, প্রযত্ন চেষ্টা ইত্যাদি সমস্ত বুঝিতে হইবে। সত্য বটে, উপরে সংস্কার শব্দ আরও একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদনা ও সংজ্ঞা পর্য্যন্ত সংস্কারের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ স্থলে সংস্কারকে বেদনা ও সংজ্ঞা হইতে পৃথক্ করিয়া ধরায় একটু লজিকের দোষ ঘটে। কিন্তু

সে দোষটুকু অগ্রাহ্য করিলে, বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই তিনের উল্লেখে সমুদয় চিত্তবৃত্তির উল্লেখ হইল। ইহাদের সহিত বিজ্ঞান বা consciousness যোগ করিলে অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু এই প্রকাণ্ড মনোজগৎ, যাহা লইয়া আমাদের এত কারবার, নিদ্রার সময়েও আমরা যে জগতের অধীনতা এড়াইতে পারি না, স্বপ্নরূপে যাহা আমাদের সুখদুঃখ জন্মায়, বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নাম-মাত্র। কেবল একটা নাম ; ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেমন, তাহা জিজ্ঞাসা করিও না।

অন্তর্জগৎ ত একটা নাম মাত্রে পরিণত হইল। বাহ্য জগৎ বা জড় জগৎটাই বা আবার কি? ক্ষিত্যাদি মহাভূতের সমষ্টিরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যাহার মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য তারকাচয় বালুকাসমান, যাহা মহাকাল ও মহাকাশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, যাহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় আমাদের রসনাপ্রান্তে বাগ্দেবীর আবির্ভাব হয়, সেই প্রকাণ্ড জড় জগৎ বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা রূপমাত্র—একটা প্রত্যয় মাত্র,—ইংরেজীতে বলিলে mere appearance বা phenomenon মাত্র। বৌদ্ধাচার্য্যকে যাহা ইচ্ছা গালি দিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না। আরও বলিয়া রাখা উচিত, বৌদ্ধগণ আত্মবাদীও নহেন। বেদান্তবিদ্যা নাম-রূপ হইতে স্বতন্ত্র, নামরূপের অনধীন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু বৌদ্ধ সেই আত্মার অস্তিত্বও মানেন না। বৌদ্ধগণের মতে নাম-রূপই সব, নাম-রূপ ছাড়া আর কিছুই নাই ; জড়ও নাই, আত্মাও নাই। এ বিষয়ে বৌদ্ধের সঙ্গে একালের হিউম প্রভৃতি দার্শনিকের মিল আছে।

৫। ষড়ায়তন—ষড়ায়তন শব্দের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয়। অন্তঃকরণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ; দর্শনেন্দ্রিয়াদি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের উপর এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। চলিত ভাষায় ইন্দ্রিয় অর্থে দেহগত যন্ত্র বা অবয়ব-বিশেষ বুঝায়, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে রূপ-রসাদির জ্ঞান সংগ্রহের শক্তির নাম ইন্দ্রিয়।

৬। স্পর্শ—অর্থাৎ ষড়ায়তন বা ছয় ইন্দ্রিয়ের সহিত ভৌতিক বাহ্য জগতের স্পর্শ।

৭। বেদনা—বেদনা শব্দের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই কয়েক বার উল্লিখিত হইয়াছে ; বেদনা অর্থে উক্ত স্পর্শ জাত অনুভূতি—রূপরস-গন্ধাদির অনুভূতি, বাহ্য জগতের অনুভূতি।

৮। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা অর্থে বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের স্পর্শ ও সম্বন্ধ বজায় রাখিবার লালসা ও প্রবৃত্তি। ইংরাজীতে desire, appetite প্রভৃতি তৃষ্ণার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

৯। উপাদান—উপ অর্থে সমীপে, আদান অর্থে গ্রহণ ; বহির্জগৎকে আপনার সমীপে টানিয়া ধরিবার যে প্রবৃত্তি, তাহাকে উপাদান বলা যাইতে পারে।

১০। ভব—ইংরেজীতে being, becoming, existence ; বাঙ্গালায় বলিলে সত্তা, অস্তিত্ব।

১১। জাতি—জন্ম, উৎপত্তি।

১২। জরা-মরণ—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

নিদান কয়টির অর্থ স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিলাম। শাস্ত্রসম্মত অর্থ দিবারও চেষ্টা করিয়াছি। পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে তেমন মতভেদও বর্ত্তমান নাই। কিন্তু এই নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া প্রচুর মতভেদ ও বিসংবাদ রহিয়াছে। এইখানেই নানা মুনির নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি মোচনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

একটা বিষয়ে সকলেই একমত। দ্বাদশ নিদানের শৃঙ্খলা বা সূত্র কোনরূপ অভি-ব্যক্তির প্রকার মাত্র, ইহা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। অভিব্যক্তি শব্দ ইংরেজী evolution অর্থে প্রয়োগ করিলাম। অভিব্যক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

অভিব্যক্তি জরা-মরণের। নিদান-শৃঙ্খলার চরম প্রান্তে জরা-মরণ; উহারই অভি-ব্যক্তি। জরা-মরণ আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মানবজাতি চিরদিন ব্যাকুল। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে জরা-মরণের উৎপত্তি অর্থাৎ origin of evil একটা প্রধান সমস্যা। খ্রীষ্টানেরা একটা প্রাচীন উপকথার সাহায্যে এই তত্ত্বের এক নিঃশ্বাসে মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যা তত সহজে মীমাংসা করিতে পারে না। বোধিদ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসা করিয়া ছিলেন, আমার বোধ হয়, তেমন মীমাংসা সর্ব্বত্র দুর্লভ। জরা-মরণের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি; সংস্কার হইতে বিজ্ঞান; বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত জরা-মরণ উৎপন্ন। শিকলের এক প্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরা-মরণ; মধ্যস্থলে অন্য অন্য নিদান। এখন এই সূত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে। আচার্য্যেরা ও পণ্ডিতেরা কিরূপে অগ্রসর হয়েন, দেখা যাউক।

কোন কোন আচার্য্যের মতে নিদানশৃঙ্খলা মানব-জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণমধ্যে মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ। তখন সে সম্পূর্ণভাবে 'অবিদ্যা' দ্বারা আচ্ছন্ন বা অজ্ঞানাবৃত থাকে। ক্রমশঃ তাহাতে স্পর্শ-বেদনাদি 'সংস্কার' উৎপন্ন হয়। মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির সহিত নানাবিধ চিত্তবৃত্তিই ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠে। সকল চিত্তবৃত্তিই ক্রমে ফুটিয়া উঠে; কিন্তু বিজ্ঞানের অভাবে ভ্রূণ তাহা জানিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিস্ফুট হইয়া আসিলে 'বিজ্ঞান' উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ পূর্ব্বে স্পর্শ সুখ দুঃখ ছিল, শঙ্কা চেষ্টা প্রবৃত্তি প্রভৃতিও হয়ত বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু ভ্রূণ যেন বিজ্ঞানের অভাবে তাহা জানিতে পারিত না, এখন বিজ্ঞানের উদয়ে ঐ সকল কতকটা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে ভ্রূণ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, মনে করা যাইতে পারে। তখন তাহার মধ্যে 'নাম-রূপ' বিকাশ লাভ করে, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ শিশু তাহার অন্তঃশরীরকে ও জড়

শরীরকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে পায়। তখন 'ষড়ায়তন' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য আরম্ভ হয়। তার পর সেই ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য জগতের সহিত 'স্পর্শ' ঘটে, বাহ্য জগতের সহিত তাহাদের আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহ্য জগতের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে যথোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়; সেই বাহ্য জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার 'বেদনা' বা নব নব রূপ রস গন্ধের অনুভব ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে 'তৃষ্ণা' অর্থাৎ সুখ উপভোগের ও দুঃখ পরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' অর্থাৎ জগতের প্রতি আসক্তি এবং সুখলাভের ও দুঃখপরিহারের জন্য প্রযত্ন, চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব'; এত ক্ষণে জ্রূণের মনুষ্যত্ব অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে; এই সময়েই সে 'জাতি' লাভ করে অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে তাহার মনুষ্যজন্ম পূর্ণতা লাভ করে। তাহার এই জাতিলাভের অর্থাৎ পূর্ণ মনুষ্যত্বপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী ও অবশ্যম্ভাবী ফল 'জরা-মরণ'।

এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিয়লজির বা জীবনবিদ্যার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক এম্ব্রায়োলজির বা জ্রূণবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত জীবনতত্ত্ব স্বীকার করিবে কি না, জানি না; কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে মার মহাশয়ের তত দূর ভয় পাইবার দরকার ছিল না। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্য্যেরা সকলে স্বীকার করেন না। মহাযানী সম্প্রদায় মধ্যে অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ইউরোপের ওল্‌ডেনবর্গ, রিস্ ডেবিড্‌স, চাইল্‌ডার্স প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও সেই সকল মত অবলম্বনে নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতার ডাক্তার ওয়াডেল অজণ্ট গ্রামে গুম্ফামধ্যে বৌদ্ধগণের অঙ্কিত ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ছবিতে বারটি নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। ওয়াডেল সাহেব তিব্বত হইতেও ভবচক্রের ছবি আনিয়াছেন। ওয়াডেলের মতে এই ভবচক্রের চিত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদের খাঁটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই ছবির একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

ভবচক্র বা সংসারচক্রের প্রতিকৃতি একখানি চাকা; চাকার কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত, সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ অঙ্কিত আছে। এই তিনকে কেন্দ্রে রাখিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। চক্রের নেমির বা পরিধির গায়ে বারটি ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশটি মূর্ত্তি মনুষ্য জীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে এক ব্যক্তি অন্ধ উষ্ট্রকে চালিত করিতেছে। অন্ধ উষ্ট্র অবিদ্যান্ধ মানবের প্রতিকৃতি; চালক স্বয়ং কর্ম্ম। ইহজন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নতুন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কাররূপ মশলায় বা কর্দ্দমে মনুষ্যের অন্তঃশরীররূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে। তৃতীয় ঘরে বানর-মূর্ত্তি মানুষের বিজ্ঞানের অপূর্ণতার ও অপকর্ষের পরিচয় দিতেছে। চতুর্থ ঘরে বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্যত্ব নাম-রূপ বা জগতের সহিত

স্পর্শ লাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চোখ উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ ষড়ায়তনরূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির দ্বার দিয়া মনুষ্যত্ব বাহ্য জগতের প্রতি চাহিতেছে।

এই অবস্থায় মানব-শিশুর সহিত বাহ্য জগতের কারবার রীতিমত আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে অলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতি মনুষ্যের সহিত জগতের, অথবা অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের সংযোগ বা স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা বা দুঃখাদির অনুভূতির আরম্ভ; সাতের চিত্রে বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই দুঃখানুভবের পরিচয় দিতেছে। আটের ঘরে সুরাপানরত মনুষ্য-মূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার প্রতিকৃতি। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে, সংসারের বৃক্ষ হইতে আগ্রহের সহিত ফল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সেই জন্য নয় ঘরে বৃক্ষের ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদানের বা বিষয়াসক্তির প্রতিকৃতিস্বরূপ। দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব' অর্থাৎ সংসারী মনুষ্যের গৃহস্থ রূপের পরিচায়ক; মানুষ এখন ঘরকন্না পাতিয়া গোটা মানুষ হইয়াছে। তার পর একাদশ চিত্রে নবপ্রসূতি শিশু সহ জননীর মূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতি'র তাৎপর্য্য বুঝাইতেছে। পুত্রোৎপত্তির পর মনুষ্যের জীবনে আর কোন কাজ থাকে না; তখন কেবল উপসংহারের অপেক্ষা। উপসংহার জরা-মরণ; কাজেই দ্বাদশ ঘরে বাঁশের দোলার উপরে শয়ান শবমূর্ত্তি। মানুষের দশ দশার কথা শুনা যায়। এই ভবচক্র মানুষের মাতৃগর্ভে আবির্ভাব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দ্বাদশ দশা দেখাইয়া নিরস্ত হইয়াছে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের এই ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন। অজন্ট গুহাস্থিত ভাস্কর শিল্প বার তের শত বৎসরের বা তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তিব্বতে প্রসিদ্ধ আছে যে, মহাযানী সম্প্রদায়ের অন্যতর স্থাপয়িতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই ব্যাখার বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর দাঁড়ায়। একে প্রাচীন, তাহাতে সেকালের ও একালের অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনুমোদিত; কাজেই এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অধিক কথা বলিতে শঙ্কা হয়। ব্যাখ্যাটা মোটের উপর দাঁড়ায় এই। আমরা কথায় কথায় মানুষের দশ দশার উল্লেখ করিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা দশের উপর দুই বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, মানুষের দ্বাদশ দশা; প্রতীত্যসমুৎপাদ মানুষের সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক বিবরণ। সেক্সপীয়ার মনুষ্য-জীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত উপমিত করিয়াছেন। মানব-শিশুর "mewling and puking in the nurse's arms"—ধাই-মার কোলে কেঁউ-মেউ করে—এই অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ এবং বার্দ্ধক্যে "sans eyes, sans teeth" - কাণা-চোখ, পড়া-দাঁত অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; এই বৃত্তান্ত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য সেক্সপীয়ারকে বুদ্ধদেবের অনেক উচ্চে বসাইবেন।

আমার বিবেচনায় প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটা অভিব্যক্তি বুঝাইতেছে বটে, কিন্তু সেই অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

উহা মানবের শারীরিক ও মানসিক পরিণামের বিবরণ নহে বা সংসারী মানুষের দশ দশার বিবরণও নহে। মনুষ্য-দেহ বা মনুষ্যের অন্তঃশরীর কিরূপে গঠিত, বর্দ্ধিত ও পরিণত হয় বা মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়া কিরূপ ধারাবাহিক দশাবিপর্য্যয় লাভ করে, তাহা বুঝান প্রতীত্যসমুৎপাদের উদ্দেশ্য নহে; কেবল বৌদ্ধদর্শন কেন, আমাদের সাংখ্যদর্শনের ও বেদান্তদর্শনের সৃষ্টিব্যাখ্যার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্যার সৃষ্টিব্যাখ্যা মিলাইতে যাওয়াই ভ্রম। অনেক পণ্ডিতে সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সহিত মিলাইবার চেষ্টা করেন। জাগতিক ব্যাপার মাত্রেই অভিব্যক্তির নিরূপণ আজকাল বিজ্ঞানবিদ্যার প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌরজগতের অভিব্যক্তি বুঝান আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদদের প্রধান কার্য্য হইয়াছে। পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে ভূবিদ্যা ব্যস্ত। জীবকুলে অভিব্যক্তি ধারার আবিষ্কার করিয়া ডারুইন কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। চিত্তের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য মনোবিজ্ঞান ব্যাকুল। মানব সমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত নিযুক্ত। এই সকল অভিব্যক্তি বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বা ব্যাবহারিক অভিব্যক্তি বলিতে পারা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক রকমের অভিব্যক্তি আছে, তাহাকে দার্শনিক বা পারমার্থিক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। সাংখ্যদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে যে অভিব্যক্তির বিবরণ আছে, তাহা এই দার্শনিক অভিব্যক্তি। আমার বোধ হয়, বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দার্শনিক অভিব্যক্তি মাত্র। সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে বিবিধ মতভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও একটা বিষয়ে মিল আছে। তাহা এই অভিব্যক্তি ব্যাপার লইয়া। তাঁহারা জগতের সৃষ্টি যে প্রণালীতে বুঝাইতে চাহেন, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা, উভয়ত্র বিচার্য্য বিষয় স্বতন্ত্র; উভয়ত্র বিচারের প্রণালী স্বতন্ত্র। কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের প্রণালীর সহিত প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিদ্যার প্রণালীকে মিলাইতে গেলে বিচার-বিভ্রাটেরই সম্ভাবনা। এই দার্শনিক অভিব্যক্তির ব্যাপারটা কি, বুঝিলেই প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আমরা লৌকিক বা ব্যবহারিক হিসাবে সমগ্র জগৎকে অন্তর্জগৎ বা mind ও বাহ্য জগৎ বা matter, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। জড় জগৎ দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরোভাগে বিস্তৃত ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অন্তর্জগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিয়া তাহার সহিত কারবার ও দেনা-লেনা করিতেছে। আমাদের জীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জগতের সহিত বাহ্য জগতের কারবার ও আদান-প্রদান চলে। বাহ্য জগৎ একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। জড় পদার্থের যে রূপ আমি দেখিতে পাই, সেই রূপেই জড় আমার নিকট পরিচিত। এতদ্ব্যতীত অন্তর্জগৎও তাহার সুখদুঃখ হর্ষশোক প্রভৃতি লইয়া আমার নিকট পরিচিত। এই উভয় জগতের স্বরূপ কি ও উহাদের সম্বন্ধ কি, কেন উহারা ওরূপ দেখায়, কেন উহাদের ওরূপ সম্বন্ধ হয়, বিজ্ঞানবিদ্যা ও দর্শনবিদ্যা উভয়েরই ইহাই বিচার্য্য। তবে বিজ্ঞানবিদ্যা যে চোখে দেখেন, দর্শনবিদ্যা ঠিক সে চোখে দেখেন না।

জগৎকে দুইটা ভাগ করা যায় এবং সেই দুয়ের মধ্যে কারবার দেখা যায়। জড় জগৎ যে রূপ লইয়া আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহা বিবিধ শব্দগন্ধস্পর্শরসাদির সমষ্টিমাত্র। বাহ্য জগতের এই গন্ধস্পর্শরসাদির সহিত আবার অন্তর্জগতের সুখদুঃখ ভয়ক্রোধাদির কতকগুলি বিশিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা যায়। আগুনের স্পর্শে আমাদের জ্বালা বোধ হয়; সূর্য্যালোকে আমাদের স্ফূর্ত্তি হয়। বাঘ দেখিলে আমাদের আতঙ্ক ঘটে; সঙ্গীত শ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়। রূপ-শব্দ-স্পর্শাদির সহিত এই স্থলে জ্বালা স্ফূর্ত্তি আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ আছে। অন্তর্জগতের সহিত বাহ্য জগতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে আমাদের জীবনযাত্রা চলিত না। আবার সেই বাহ্য জগতের রূপরসগন্ধাদির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে; তদুভয়ের সহিত আবার চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে; সূর্য্যচন্দ্রাদির সহিত, জল বায়ু আগুনের সহিত জীবজন্তুর সম্বন্ধ আছে। জীবজন্তুর আবার পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলা যায়, যে সকল নিয়মের অনুসারে জড় জগতের ক্রিয়াপরম্পরা চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম এই সকল সম্বন্ধেরই নামান্তর।

কিন্তু প্রশ্ন, এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কে? এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখা যায় কেন? এ সম্বন্ধ না থাকিলে মনুষ্যের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু মানুষের অস্তিত্বই বা কিসের জন্য। বিজ্ঞানবিদ্যা ও দর্শনবিদ্যা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না।

বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই জাগতিক রহস্যঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হইতে দার্শনিক অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র। দার্শনিক সৃষ্টিকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির সহিত মিলাইতে গেলে চলিবে না।

বিজ্ঞানবিদ্যা বাহ্য জগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ব গোড়াতেই মানিয়া লয়। বাহ্য জগতের পারমার্থিক স্বরূপ যেমনই হউক, আমাদের বাহিরে আমাদের স্বতন্ত্র, আমাদের নিরপেক্ষ একটা জগৎ বহুকাল হইতে বিদ্যমান আছে, ইহা আমাদিগকে মানিতেই হয়। আমরা, অর্থাৎ জ্ঞানবান্ জীবেরা যখন ছিলাম না, তখন হইতে এই বাহ্য জগৎ বিদ্যমান আছে ও আমরা যখন থাকিব না, তখনও উহা বিদ্যমান থাকিবে, ইহা মানিয়া লইতে হয়। না মানিলে জীবনের পথে এক পদ অগ্রসর হওয়া যায় না। যে মানে না, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। কেন না, আমাদের জীবন এই বাহ্য জগতের সর্ব্বতোভাবে অধীন। বাহ্য জগৎ আমাদের অধীন নহে; উহা আপন নির্দিষ্ট বিধানক্রমে চলে। আমরা চেষ্টা দ্বারা সেই বিধানগুলির সহিত পরিচয় স্থাপন করিয়া আমাদের জীবন-প্রণালীকে জগৎপ্রণালীর সহিত সমঞ্জস করিয়া লই মাত্র। জগৎপ্রণালীকে আমাদের জীবনযাত্রার অনুকূল করিয়া লই মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য আমরা মানিয়া লই, বাহ্য জগৎ আমার পূর্ব্বেও ছিল ও পরেও থাকিবে, তবে যেমন ছিল, তেমনই থাকিবে না। বাহ্য জগৎ কেবল পরিবর্ত্তনপরম্পরা মাত্র; সেই পরিবর্ত্তন-

পরম্পরায় যাহা অব্যক্ত ছিল, অব্যাকৃত ছিল, অস্পষ্ট ছিল, নিরবয়ব ছিল, তাহা ব্যক্ত ব্যাকৃত স্পষ্ট সাবয়ব হয়। ইহার নাম জগতের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি; ইহা সমস্ত জগতে ও জগতের প্রত্যেক অংশে চিরকাল ধরিয়া চলিতেছে। বিজ্ঞানবিদ্যা এই অবিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তির শিকলের গ্রন্থিগুলি পর পর আবিষ্কারের চেষ্টা করে। কিন্তু দার্শনিক অভিব্যক্তি অন্যরূপ। দর্শনবিদ্যা জগতের ব্যাবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব সমন্ধে নানা বিতণ্ডা উপস্থিত করে। কেহ বলেন, বাহ্য জগতে যখন রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ ভিন্ন আর কিছুই আমাদের উপলব্ধির বা জ্ঞানের বিষয় হয় না, তখন ঐ রূপরসাদি ছাড়িয়া বাহ্য জগতে আর কিছুই নাই; এবং রূপরসাদি যখন জ্ঞানেরই নানাবিধ আকার মাত্র, এবং জ্ঞাতার অভাবে যখন জ্ঞানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তখন জ্ঞাতার অভাবে বাহ্য জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য। যাহা জ্ঞানের অগোচর, তাহা অস্তিত্বহীন। আমি যখন ছিলাম না, তখন জগৎ ছিল না; আমি না থাকিলে জগৎও থকিবে না। সকলে কিন্তু এ কথা বলেন না। কেহ কেহ বলেন, একটা কিছু বাহিরে আছে, তাহা রূপরসগন্ধ নহে, তবে তাহা জ্ঞাতার সম্মুখে রূপরসাদি স্বরূপে প্রকাশ পায় মাত্র। সেই অনির্ব্বাচ্য কোন কিছুকে ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই; কেন না, বুঝাইতে গেলেই উহাতে জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম অর্পণ করিতে হইবে। সাংখ্যেরা ঐ অনির্ব্বাচ্য একটা কিছুর প্রকৃতি নাম দেন; স্পেন্সারের ভাষায় উহা অজ্ঞেয় তত্ত্ব। বৌদ্ধ এই অনির্ব্বাচ্য কোন-একটা-কিছুর অস্তিত্ব আদৌ মানেন না এবং বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে তিনি একাকী নহেন। বৌদ্ধ বলেন, প্রতীয়মান রূপরসাদির অন্তরালে কিছুই নাই। ঐ রূপরসাদির সমষ্টিকেই আমরা বাহ্য জগৎ বলিয়া মনে করি। এই মনে করাকে বিদ্যা না বলিয়া অবিদ্যা বলাই সঙ্গত। কেন না, কেন ঐরূপ মনে করি, তাহার কোন সঙ্গত হেতু দেখাইতে পারি না। ঐরূপ মনে না করিয়া অন্যরূপ মনে করিলেও যখন সেই প্রশ্নই আবার উপস্থিত হইত, তখন ও কথাটা অবিদ্যা বা ভ্রান্তি বা জ্ঞানাভাব বলিয়া চাপা দেওয়াই ভাল।

বাহ্য জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে বৌদ্ধের এই কথা। তার পর অন্তর্জগতের স্বরূপ। অন্তর্জগতে যে স্মৃতি-উপলব্ধি, বিচার বিতর্ক, শোক-হর্ষ, সঙ্কল্প-চেষ্টা, সুখ-দুঃখ, এ সকলও আমাদের জ্ঞানের বিষয়। উহাদের জ্ঞানগম্য আকার ভিন্ন অন্য আকার আমরা অবগত নহি, কল্পনাতেও আনিতে পারি না; কল্পনা করিতে গেলে তাহাও জ্ঞানগম্যই হইবে। উহাদের অন্তরালে অজ্ঞেয় কোন একটা কিছু নাই। একটা অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছু আছে যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত।

বৌদ্ধমতে বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়েরই ব্যবহারিক অস্তিত্ব ভিন্ন পারমার্থিক অস্তিত্ব কিছুই নাই। যাহা দেখি, তাহাই আছে—তাহা কতিপয় ভিত্তিহীন ক্ষণিক জ্ঞানের সমষ্টি। মরীচিকা বা অন্তরিক্ষস্থিত গন্ধর্ব্বনগর যেমন অমূলক জ্ঞানের সমষ্টি মাত্র, বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎও ঠিক সেইরূপ। উভয়ই ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরা মাত্র। আর সেই পরম্পরামধ্যে একটি জ্ঞানের সহিত তৎপরবর্ত্তী

জ্ঞানের কোন সম্পর্কই নাই। বৌদ্ধ আচার্য্য অনির্ব্বাচ্য কি-একটা-কিছু স্বীকার করিতে একেবারে নারাজ। এ-কালের যে সকল দার্শনিক sensationalist বা প্রত্যয়বাদী ও phenomenalist বা প্রপঞ্চবাদী বলিয়া অভিহিত হন, বৌদ্ধ তাঁহাদের অগ্রগামী।

বাহ্য ও আন্তর উভয় জগৎ যদি কেবল ক্ষণিক জ্ঞানের পরম্পরা মাত্র বা সমষ্টি মাত্র হয়, যদি সেই সকল ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর কোন সম্পর্কই না থাকে, তবে সেই সকল ক্ষণিক জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ দেখি কেন? জ্ঞানগুলা যে অন্যোন্য সম্বন্ধে বিজড়িত, তাহা অস্বীকারের উপায় নাই; কেন না, প্রাকৃতিক নিয়ম না মানিলে জীবন চলে না এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ঐরূপ সম্বন্ধেই স্থাপিত। তাহাদের পরস্পর ঐ সম্বন্ধ কোথা হইতে আসে? আর আমি ঐ সকল জ্ঞান উপলব্ধি করিতেছি, ঐ সকল জ্ঞান আমার জ্ঞান,—আমিই দ্রষ্টা, আমিই শ্রোতা, আমিই কর্ত্তা,—এই ধারণাটাই বা আসে কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বেদান্ত একটা অনির্ব্বাচ্য কোন-কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উহা অনির্ব্বাচ্য বটে, কিন্তু উপলব্ধির অগম্য নহে। বেদান্তের নিকট উহার মত স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ আর কিছুই নহে—উহার নাম আত্মা বা আমি। এই আমি একমাত্র চেতন পদার্থ; আর অন্তর্জগতে বা বহির্জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আমার সমীপে জ্ঞানগম্য বলিয়া প্রকাশ পায়, যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা অচেতন জড়। জ্ঞানগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বেদান্ত বলেন—উহা আমারই মায়া। মায়া শব্দটার অর্থ লইয়া গোল উঠিতে পারে; আমার স্বভাব বলিলে হয়ত কতকটা সরল হয়। বাহ্য জগৎকে কেন এমন দেখায়, অন্তর্জগৎকে কেন এমন দেখায়, তাহার উত্তর—ঐরূপ দেখাই আমার স্বভাব। এই উত্তর সকলের সন্তোষজনক হইবে কি না জানি না; কিন্তু বেদান্ত বলেন, ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর নাই।

বৌদ্ধ কিন্তু উত্তর দেন অন্যরূপে। তিনি ঐ অনির্ব্বাচ্য আত্মার অস্তিত্ব মানেন না। যাহা বেদান্তের নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহা বৌদ্ধের নিকট একেবারে অসিদ্ধ। বৌদ্ধের নিকট নাম-রূপই সব অর্থাৎ যে জ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরা আমাদের প্রতীয়মান হয়, তাহাই সব। জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই। এই পরস্পরসম্পর্করহিত বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক জ্ঞানগুলির পারিভাষিক নাম সংস্কার। তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই, তবে একটা সম্বন্ধের কল্পনা করা হয় বটে। জ্ঞানগুলির অর্থাৎ বৌদ্ধভাষায় সংস্কারগুলির মধ্যে প্রতীয়মান যে সকল সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ কল্পনা করিবার জন্য বিজ্ঞাননামক পদার্থ বৌদ্ধ স্বীকার করেন; এই বিজ্ঞান বাহ্য জগতের রূপরসাদির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সৃষ্টি করে, অন্তর্জগতের অঙ্গীভূত সুখদুঃখাদির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের আদান-প্রদান বিষয়েও নানা সম্পর্ক স্থাপন করে। কিন্তু সেই বিজ্ঞানও একপ্রকার ক্ষণিক জ্ঞান মাত্র। উহাও একটা অনির্ব্বাচ্য কোন-একটা-কিছু নহে। এই সংস্কারসমূহ ও সংস্কারসমূহের

প্রভু বিজ্ঞান, উভয়েরই সমষ্টি একত্র করিয়া একটা মিথ্যা "আত্মা" বা "আমি" কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু উহা অমূলক অনাবশ্যক কল্পনা। ঐ কল্পনাও বিজ্ঞানের কাজ। ইহার নাম অহংবিজ্ঞান বা বৌদ্ধ পরিভাষায় আলয়-বিজ্ঞান। উহাকে বেদান্তের চেতনস্বভাব আত্মা বলা যায় না। সংস্কার-সমূহ ও তাহাদের অধিপতি বিজ্ঞানকে বাদ দিলে আর আমি বলিয়া বা আত্মা বলিয়া কিছু থাকে না। উহাদের সমষ্টি করিলে যাহা হয়, তাহাই নাম রূপ। কিন্তু সেই নাম-রূপের সাক্ষী কেহ কোথাও নাই।

এই সংস্কারগুলি একত্র করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলেই নাম-রূপ অর্থাৎ বিশ্ব-জগৎ প্রস্তুত হয়। কয়েকখানি কাষ্ঠখণ্ডকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা তাহাদের নেমি, অর, নাভি প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি, এবং সন্নিবেশের পর যে দ্রব্য দাঁড়ায়, তাহা রথচক্র আখ্যা দিয়া থাকি। এক-একখানা কাষ্ঠখণ্ডকে রথচক্র বলা যায় না; কাষ্ঠ কয়েকখানা এক নির্দ্দিষ্ট বিধানে সাজাইলে তবে তাহার নাম রথচক্র হয় সেইরূপ সংস্কারগুলি অর্থাৎ বিচার-বিতর্ক, রাগদ্বেষ, সুখ-দুঃখাদি চিত্তবৃত্তিগুলি বিজ্ঞান-সহযোগে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে যাহা দাঁড়ায়, তাহাই জগৎ। ঐগুলি একে একে লোপ করিলে জগতের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, আত্মা নাই বা থাকিল? বিজ্ঞানই যেন বাহ্য জগৎকে ও অন্তর্জগৎকে এরূপ সম্বন্ধযুক্ত করিয়া এই জগতের সৃষ্টি করিল, এবং বিজ্ঞানই যেন অমূলক অহংপ্রত্যয়ের সৃষ্টি করিয়া আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি ভ্রম জন্মাইল; কিন্তু বিজ্ঞানই বা এরূপ করে কেন? ইহার উত্তর কি? বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে সজ্জিত করিয়া নাম রূপের নির্ম্মাণ করিল কেন? কাষ্ঠখণ্ডগুলি সজ্জিত হইয়া রথচক্রে পরিণত হইল কিরূপে? বৌদ্ধদর্শনের উত্তর—এই ব্যাপারের মূলে অবিদ্যা; ইহার কারণ অবিদ্যা। এই বাক্যের স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক বলিতে সাহস করিতেছি না। অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাব, অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধ-দর্শন বলেন, কেন হয় জানি না। উহা খাঁটি আগ্নষ্টিকের কথা। দ্বিতীয় অর্থ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, উহা একটা ভ্রান্তি মাত্র। সংস্কারগুলি সজ্জিত আছে তুমি দেখিতেছ; সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানযোগে নানা রূপের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও বোধ হইতেছে; কিন্তু সবই মিথ্যা, সবই স্বপ্নের মত বা মরীচিকার মত অলীক কল্পনা। বৈদান্তিক অন্যরূপে উত্তর দেন। তিনি বিজ্ঞানের অন্তরালে, বিজ্ঞানের উপরে, আত্মার অস্তিত্ব মানেন। আত্মা বিজ্ঞানদ্বারা ইহা করায়। কেন করায়? না, ঐরূপই আত্মার মায়া বা আত্মার খেলা বা আত্মার স্বভাব। যাহাই হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ দুরূহ।

এখন কতটা কিনারা পাওয়া গেল। দার্শনিক অভিব্যক্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝা গেল। জগৎ এমন দেখায় কেন, জগৎ এরূপ হইল কিরূপে, জগৎ অভিব্যক্ত

হইল কিরূপে, বৌদ্ধমতে তাহার উত্তর পাওয়া গেল। মূলে অবিদ্যা—জ্ঞানাভাব বা ভ্রম। অবিদ্যাবলে সংস্কারগুলি বিজ্ঞানকর্তৃক সজ্জিত ও যথাবিন্যস্ত হইয়া নাম-রূপে পরিণত হইয়াছে ও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নামের অর্থাৎ অন্তর্জগতের ও রূপের অর্থাৎ বহির্জগতের মিথ্যা মরীচিকা প্রস্তুত করিয়া উভয়ের সমন্বয়ে বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি করিয়াছে। নাম-রূপের বা জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ষড়ায়তন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চয় সৃষ্ট হয়। কেন না, ইন্দ্রিয়গুলিয় সাহায্যেই অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের কারবার চলে, ইন্দ্রিয়দ্বারাই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইন্দ্রিয় না থাকিলে অন্তর্জগৎ বর্জিগৎকে স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে রাখিয়া তাহার সহিত আদান-প্রদান করিতে পারিত না। কাজেই যখনই নাম হইতে রূপ পৃথকরূপে প্রতীত হইয়াছে, এবং যখনই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র জগৎ কল্পিত হইয়াছে, তখনই ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হইয়াছে। বলা উচিত, দর্শনশাস্ত্রে ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুকর্ণাদি দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবয়ব বুঝায় না; ইন্দ্রিয় শব্দে সেই শক্তি বুঝায়, যদ্দ্বারা রূপরসাদি উপলব্ধির বিষয় হয়। ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই অন্তঃশরীর বা অন্তর্জগৎ বাহ্য জগৎ বা জড় জগৎ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি বাস্তবিকই স্বতন্ত্র ? না। এই স্বতন্ত্ররূপ বোধের স্রষ্টা বিজ্ঞান; এই স্বাতন্ত্র্যবোধের হেতু অবিদ্যা। এক বার উভয় জগৎ স্বতন্ত্র বলিয়া কল্পিত হইলে ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাদের মধ্যে আদান-প্রদানের আরম্ভ হইলে বিজ্ঞানের এই সম্বন্ধ-স্থাপন-কার্য্য ক্রমেই চলিতে থাকে; স্বাধীনরূপে প্রতীয়মান বাহ্য জগতে বিবিধ সম্বন্ধের স্থাপনা ক্রমেই চলিতে থাকে; বিজ্ঞান বিবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার করে।

উহাদের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ লাভ করে। এই ব্যাপারটা স্পর্শ; স্পর্শ অর্থে বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ। তাহার ফল বেদনা, অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতির নূতন নূতন বিকাশ, জগতে রূপ রস গন্ধাদির নূতন নূতন আবির্ভাব। তাহার ফলে তৃষ্ণার উদ্গম; বাহ্য জগতের সহিত কারবার বজায় রাখিবার, আদান-প্রদান চালাইবার আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে উপাদান—বাহ্য জগতের প্রতি অন্তর্জগতের টান—বাহ্য জগৎকে টানিয়া ধরিবার প্রবৃত্তি—বাহ্য জগতে আসক্তি। এক্ষণে বাহ্য জগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে; উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; উভয়ের মধ্যে আসক্তি স্থাপিত হইয়াছে, এখন অহং প্রত্যয়ের বিকাশ হইয়াছে। আমিই এই জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া জগতের সহিত কারবার করিতেছি, এইরূপ একটা বুদ্ধির উদ্গম হইয়াছে। এখন আমি হইয়াছি; ইহার পূর্ব্বে আমি ছিলাম না। আমার এই উৎপত্তির নাম ভব। সেই আমার উৎপত্তির নামান্তর জাতি বা জীবরূপে জন্ম। জীব-জন্মের মুখ্য ফল ভগবান্ সিদ্ধার্থের মতে জরা-মরণ। জরা-মরণের সহকারী শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য।

প্রতীত্যসমুৎপাদের এইরূপ ব্যাখ্যাই আমার নিকট সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে ব্যাখ্যা করিলে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনোক্ত অভিব্যক্তি-তত্ত্বের

সহিত ইহার সঙ্গতি হয়। বিজ্ঞানে যে অভিব্যক্তির কথা বলে, জ্যোতিষে নীহারিকাবাদ হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে জীবকুলোৎপত্তি ও মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিণতি পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবিদ্যা যে অভিব্যক্তির কথা বলে, এই প্রতীত্যসমুৎপাদে সেরূপ অভিব্যক্তির কথা আদৌ বলে না। ঐ সকল বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বহু কাল ব্যাপিয়া ঘটে। সৌরজগৎ কোন্ কালে নীহারিকার অবস্থায় ছিল, কে জানে? ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের কত লক্ষ বা কত কোটি বৎসরে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা লইয়া বিতণ্ডা এখনও চলিতেছে। বনমানুষ বা বানর হইতে আরও নিম্ন পর্য্যায়ের জীব হইতে মানবের কিরূপে কত কালে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা লইয়া বিজ্ঞান এখনও বিতণ্ডা করিতেছেন। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের পরিণতিতে নয় মাস দশ দিন সময় লাগে; সেই ভ্রূণ আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া কত দিন ধরিয়া পরিণতি পায় ও পূর্ণ মনুষ্যে পরিণত হয়। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদ যে সৃষ্টির কথা বলিতেছে, তাহা কালব্যাপী নহে। এই বিশ্ব-মরীচিকা এখনই, এই ক্ষণেই, অবিদ্যাকল্পিত হইয়া ওরূপ দেখাইতেছে। বিশ্ব-জগৎই যেখানে কল্পনা, সেখানে উহার সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ—যে অতীতের ইতিহাস বিজ্ঞানবিদ্যা খুঁজিয়া বাহির করে ও যে ভবিষ্যতের কাহিনী আবিষ্কারের জন্য ব্যগ্র হয় সেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্পনা মাত্র। ভগবান্ তথাগত বোধিদ্রুমতলে সাধনার পর যে চারিটি আর্য্য-সত্য বাহির করিয়াছিলেন, তাহার একটির মর্ম্ম এই যে, এই বিশ্বজগতের স্বরূপ দুঃখাত্মক। যে নাম ও রূপ লইয়া বিশ্বজগৎ, যে অন্তর্জ্জগত ও বহির্জ্জগতে আমরা সমস্ত প্রতীয়মান বিশ্বকে ভাগ করি, তাহাদের পরস্পর আদান-প্রদানের এক মাত্র ফল দুঃখ। জরা-মরণ, শোক, পরিদেবন, দৌর্ম্মনস্য সেই দুঃখেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। এই দুঃখের হেতু তিনি দেখাইয়াছিলেন; প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্বে সেই হেতু নির্ণীত হইয়াছে। এই দুঃখ নিরোধের উপায়ও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। দুঃখনিরোধের উপায়ও তদাবিষ্কৃত চারিটি আর্য্য-সত্যের অন্যতম। দুঃখই ব্যাধি; প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই ব্যাধির নিদানতত্ত্ব; এবং আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন জন-সাধারণের পক্ষে সেই ব্যাধির মহৌষধি। তথাগত স্বয়ং সেই নিদানতত্ত্বের ও সেই মহৌষধির আবিষ্কর্ত্তা বৈদ্যরাজ। নাম ও রূপ উভয়ই পরমার্থতঃ অস্তিত্ব-হীন; উহাদের অন্তরালে অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞেয় কিছুই নাই; উহা কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি ও পরম্পরা মাত্র; উহারা ঐরূপ দেখায় মাত্র; কিন্তু উহাদের প্রকৃত স্বরূপ স্বপ্নের মত; এইটুকু বলাই প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য্য। নাম-রূপ অলীক হইলেও দুঃখও অলীক হয়, এবং দুঃখ অলীক বলিয়া জানিলেই দুঃখ আর থাকে না। কাজেই ঐ জ্ঞানের লাভই দুঃখনিরোধের একমাত্র উপায়। এই জ্ঞানলাভই সম্যক্ সম্বোধি;—আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে দুরূহ সাধনদ্বারা কালক্রমে এই সম্যক্-সম্বোধি লাভের আশা আছে। ইহা লাভ করিলেই নাম-রূপকে মিথ্যা ও দুঃখকে মিথ্যা বলিয়া জানা যায় এবং নির্ব্বাণ ও দুঃখবিমুক্তি ঘটে। ভগবান্ স্বয়ং সেই সম্বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছিলেন। সকলের পক্ষে এই নির্ব্বাণলাভ সাধ্য নহে; তবে সেই সাধনাই নির্ব্বাণলাভের বা

দুঃখনিরোধের একমাত্র পন্থা। ভগবান্ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রকে সেই পন্থা দেখাইয়া দিয়া মানবজাতির তৃতীয়াংশের নিকট জ্ঞানসিন্ধু ও করুণাসাগররূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন।

পঞ্চ ভূত

ভূত শব্দ ইংরেজী এলিমেণ্ট শব্দের বদলে সর্ব্বদা প্রযুক্ত হয়। গ্রীক পণ্ডিতেরা চারিটি এলিমেণ্টের কথা বলিতেন। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু, এই চারিটি এলিমেণ্ট। কেহ কেহ পঞ্চম এলিমেণ্ট ঈশ্বর বা আকাশের নামও করিয়া থাকিবেন। আমাদের শাস্ত্রে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পাঁচটি মহাভূতমধ্যে গণ্য। স্থূল জড় জগৎ এই পাঁচ মহাভূতে নির্ম্মিত।

আধুনিক রসায়ন-বিদ্যার এলিমেণ্ট শব্দের প্রয়োগ আছে; এলিমেণ্ট অর্থে জড় জগতের সেই মূল উপাদান বুঝায়, যাহা বিশ্লেষণ করিয়া এ পর্য্যন্ত অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় নাই। রাসায়নিকেরা এ পর্য্যন্ত প্রায় আশীটি মূল পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছেন। রসায়ন-বিদ্যার উন্নতির সহিত নূতন নূতন মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইতেছে এবং মূল পদার্থের সংখ্যা সেই জন্য ক্রমশঃ বাড়িতেছে। জড় জগতের অন্তর্ভূক্ত অন্য যাবতীয় পদার্থ এই আশীটি মূল পদার্থের পরস্পর যোগে নির্ম্মিত। রসায়ন-বিদ্যা ইহাই প্রতিপন্ন করেন।

রসায়ন-বিদ্যায় এলিমেণ্ট শব্দের যে অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়, ভূত শব্দকে সেই অর্থে প্রয়োগ করিতেই হইবে, এরূপ হেতু আছে কি? কোন হেতু পাওয়া যায় না। একালে যেরূপে রসায়ন-বিদ্যা আলোচিত হইতেছে, সেকালে সেরূপ হয় নাই। তজ্জন্য বাগ্‌বিতণ্ডার ফল নাই। তজ্জন্য দুঃখিত বা লজ্জিত হইবারও প্রয়োজন নাই। অনেকে এই জন্য প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণকে বিদ্রূপও করেন; এই বিদ্রূপও অযথা-প্রযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। বিধাতা সৃষ্টির দিনে মানুষকে সর্ব্ববিধ জাগতিক তথ্যের উপদেশ দেন নাই। মানুষ আপন চেষ্টায় কাল সহকারে ঐ সকল তথ্য নির্ণয় করিতেছে। কাজেই আমরা বহু বৎসর পরে জন্মিয়া সেকালের লোকের অপেক্ষা অধিক জানিয়া ও শিখিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে বিস্ময়ের বা স্পর্দ্ধার হেতু নাই।

কিন্তু প্রাচীন আচার্য্যেরা এই তথ্যটা জানিতেন না, এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের কষ্ট হয়। সেই জন্য তাঁহারা প্রাচীন কালের বিজ্ঞানের সহিত এ কালের বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক থাকেন। এ-কালে আমরা বলি ভূত আশীটি; সেকালে বলা হইত—ভূত পাঁচটি: ইহাতে প্রাচীনেরা রসায়ন-বিদ্যা জানিতেন না মনে করিও না; তাঁহারা ভূত শব্দে যাহা বুঝিতেন, তোমরা তাহা বুঝ না, কাজেই গণ্ডগোল করিতেছ;—এইরূপে প্রবোধ দিয়া মন ঠাণ্ডা রাখিতে হয়।

ভূত শব্দ সর্ব্বত্র এক অর্থেই প্রযুক্ত হইবে, এমনই কি কথা আছে? এরকম ভূত আছে, যাহা অতি ভয়ঙ্কর, তাহার নাম লইতে গা ছম-ছম করে, স্পিরিচুয়ালিষ্ট

ব্যতীত অন্যে যাহার ছায়া মাড়াইতে সাহস করে না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা পাঁচও নয়, আশীও নয়, অনেক বেশী। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, ভূত শব্দের বিবিধ অর্থ থাকিতে পারে।

অতএব পঞ্চ ভূত অর্থে জড় পদার্থের পাঁচটি মূল উপাদান বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সেকালের আচার্য্যেরা জড় পদার্থকে পাঁচটি শ্রেণীতে বা জাতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। এক এক জাতির নাম ভূত। ক্ষিতি শব্দের অর্থ কেবল মাটি নহে; ক্ষিতি শব্দে কঠিন পদার্থ মাত্রকেই বুঝায়। জল অর্থে তরল পদার্থ মাত্র। এইরূপে বায়ু শব্দ বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই প্রযোজ্য। আকাশ অর্থে ঈথর, যে ঈশ্বরের দ্বারা আলোর ঢেউ যাতায়াত করে। তেজ অর্থে উজ্জ্বল তেজোময় পদার্থ, যথা অগ্নি।

মীমাংসাটা মন্দ নয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত বিরোধ ইহাতেও একেবারে মিটে না। বিরোধের হেতু আছে। এ-কালের বিজ্ঞানে কঠিন, তরল, বায়বীয়, এমন কি, আকাশ পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু তেজঃ পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিছু দিন পূর্ব্বে কালরিক ফ্লজিস্তন তাড়িত প্রভৃতি কতকগুলি তেজঃ পদার্থের অস্তিত্ব বিজ্ঞান-বিদ্যায় স্বীকৃত হইত। কিন্তু তাহারা সকলেই এক্ষণে স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া বিজ্ঞানকর্তৃক অজ্ঞানের দেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এখন আর স্বতন্ত্র তেজঃ পদার্থ নাই। বিরোধের দ্বিতীয় হেতু এই যে, ক্ষিত্যাদি ভূতে যে সকল ধর্ম্ম আরোপিত হয়, কঠিন্যাদি ধর্ম্মের সহিত তাহাদের সমন্বয় ঘটে না। সাংখ্যদর্শনের মতে এক ক্ষিতিতেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পাঁচটি গুণ বর্ত্তমান। জলে কেবল চারিটি, তেজে কেবল তিনটি ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কঠিন ও তরল উভয় পদার্থে ই পাঁচ গুণই বিদ্যমান দেখা যায়। এইরূপে গোল বাধে। এইরূপ আরও বিরোধ ঘটে। আকাশ অর্থে যদি ঈথর হয়, তাহাতেও গোলযোগ ঘটে; কেন না, সেকালের মতে আকাশ শব্দ বহন করিত; এ-কালের মতে ঈথর আলোক বহন করে; উহার সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক নাই।

দর্শনশাস্ত্রে আমার অধিকার নাই; কাজেই পূরা সাহসে কোন কথা বলিতে পারি না এবং সম্প্রতি প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়া মত সমর্থনের অবকাশও আমার নাই।

আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সেকালের বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে গেলে পদে পদে এইরূপে গোল বাধে। ক্ষিতি, জল, বায়ু, এই তিন ভূতের অর্থ না হয় কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থ করিলাম; আধুনিক বিজ্ঞান তাহাতে অধিক আপত্তি করিবে না। কিন্তু তেজ ও আকাশের বেলায় সমন্বয় ঘটিবে না। আধুনিক বিজ্ঞান তেজকে জড় পদার্থ বলিয়া মানেন না; উহাকে বরং শক্তি পদার্থ বলিয়া গ্রহণ চলিতে পারে। কিন্তু শক্তিতে ও জড়ে আকাশ-পাতাল ভেদ; উভয় পদার্থ এক পর্য্যায়ে ফেলা চলিবে না।

এই সন্দর্ভ যখন 'পুণ্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন নবাবিষ্কৃত

ইলেকট্রনের নাম ততটা জাহির হয় নাই। এই ইলেকট্রনের সহিত তাড়িত উত্তাপ প্রভৃতির সম্পর্ক আছে। এই ইলেকট্রন না কি তাড়িত পদার্থ; অথচ এই ইলেকট্রন অতি সূক্ষ্ম কণিকা মাত্র; উহা কত বেগে ছুটিয়া চলে, তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহাকে জড় পদার্থ বলিতে হানি নাই; এমন কি, এখন অনেকে বলিতে চাহেন, যাবতীয় জড় পদার্থ, কঠিন তরল বায়বীয় যাবতীয় পদার্থ এই ইলেকট্রন কণিকাতেই নির্ম্মিত। যাঁহারা সেকালের বিজ্ঞানের সহিত একালের বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিপাদনের প্রয়াসী, তাঁহারা এখন দর্পের সহিত বলিতে পারেন,—ঐ দেখ, এই ইলেকট্রনই তেজ; এত দিন তোমাদের বিজ্ঞান ইলেকট্রনের অস্তিত্বই জানিত না; কিন্তু সেকালের পণ্ডিতেরা কত আগে ইহার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; একালের বিজ্ঞানই মূর্খ, নিজের মূর্খতা না জানিয়া সেকালের পণ্ডিত-দিগকে বিদ্রূপ করিত; বিজ্ঞান, সাবধান হও; এমন দিন আসিবে, যখন সেকালের সকল কথাই তোমাকে নত মস্তকে মানিতে হইবে। প্রাচীন মতের পক্ষপাতী অনেক বিজ্ঞ জনকে এইরূপে আস্ফালন করিতে দেখিয়াছি।

আমার বিবেচনায় যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচীন বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় করিতে যান, তাঁহারা একটা ভুল করেন। বিজ্ঞান বিদ্যাটাই পরিবর্ত্তনশীল; উন্নতিশীল বলিতে চাও ক্ষতি নাই। উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোন দিন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে সিদ্ধান্ত বদলাইয়া লইবে। ইহাতে সে লজ্জিত নহে; বরং বিজ্ঞান জানে যে, ইহাই তাহার মাহাত্ম্য। কাজেই আজি যদি প্রাচীন মতে ও আধুনিক মতে সমন্বয় কল্পনা করিয়া আনন্দ লাভ কর, কালি সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। তখন বিজ্ঞান নূতন কথা কহিতে আরম্ভ করিবে; তখন আর সমন্বয়-সাধন চলিবে না।

ফলে ও-পথে যাওয়াই ভুল। রসায়নবিৎ পণ্ডিতেরা এলিমেণ্ট বলিতে যাহা বুঝেন, ভূত শব্দে তাহা বুঝা যায় না, এ কথা ঠিক। প্রাচীন দর্শনের মতের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের মতের কোন বিরোধ নাই, এ কথাও ঠিক। কিন্তু প্রাচীন মতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে গেলে ওরূপে সমন্বয় করিতে গেলে চলিবে না।

আমি বলিতে চাহি যে, জগৎ পাঁচটা ভূতে নির্ম্মিত, ইহা দার্শনিক মত; আর জগৎ আশীটা এলিমেণ্টে নির্ম্মিত, উহা বৈজ্ঞানিক মত। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নাই; কিন্তু দর্শন যে চোখে দেখেন, যে পথে চলেন, বিজ্ঞান সে চোখে দেখেন না; সে পথে চলেন না। উভয়েই জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চাহেন যে, জগতের মূল উপাদান কি কি। কিন্তু দার্শনিক যে ভাবে, যে প্রণালীতে বিশ্লেষণ করেন, বৈজ্ঞানিক সে ভাবে, সে প্রণালীতে করেন না। একটাকে দার্শনিক বিশ্লেষণ, অন্যকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বলা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিককে কোন দ্রব্য বিশ্লেষণ করিতে দিলে, তিনি উহাকে থেঁতলাইবেন, গুঁড়া করিবেন, তপ্ত করিবেন, পোড়াইবেন, উহাতে নানা ক্ষারজল ঢালিবেন, নানা দ্রাবক ঢালিবেন;

দেখিবেন, উহার ভিতরে কি আছে, কি নাই। মিহিদানার মত উপাদেয় দ্রব্য তাঁহার হাতে পড়িলে তিনি নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে উহাকে খলে পিষিবেন, জলে গুলিবেন, কাচের শিশিতে পুরিয়া যত অকথ্য জিনিষ উহাতে ঢালিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত উহাকে একটা লম্বা নলে পুরিয়া পোড়াইয়া দেখিবেন যে, পুড়িয়া কত রকমের বায়ু বাহির হইল, কতটুকু ছাই পাওয়া গেল। তিনি হয়ত জানেন যে, উহাতে ছিল খানিকটা ছোলার বেশম, কিঞ্চিৎ ঘি, কিঞ্চিৎ চিনি ইত্যাদি। কিন্তু ঐগুলাও যৌগিক দ্রব্য; উহা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পাইবেন এতটা কয়লা, এতটা অক্সিজন, এতটা হাইড্রোজেন, এতটা নাইট্রোজেন ইত্যাদি। এই কয়লা, অক্সিজন প্রভৃতি পদার্থ এলিমেণ্ট; উহাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আর কিছু বাহির করিতে পারিবেন না; অন্তেও পারিবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইবে যে, ঐ কয়েকটি মূল উপাদানে মিহিদানাটি নির্ম্মিত হইয়াছে।

কিন্তু দার্শনিকের নিকট গেলে তিনি আদৌ সে পথ চলিবেন না। তিনি দেখিবেন, উহার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। বৈজ্ঞানিক যে রূপ রস গন্ধ দেখেন না, তাহা নয়। তিনি কাল বরণ দেখিয়া ঠিক করেন—এটা কয়লা, কাঁচা হলুদের বরণ দেখিয়া বলেন—এটা সোনা; রাঙা বরণ দেখিয়া বলেন—উহা সিন্দূর। কিন্তু দার্শনিক অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করেন। তিনি দেখেন, আহা, ঐ যে মনোমোহন মিহিদানা, উহা কেমন বর্ত্তুলাকার, তাহার পৃষ্ঠদেশে দানাগুলি কেমন সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছে; উহার বর্ণে চোখ জুড়ায়; উহার কিবা ভঙ্গী—কিবা রূপ; আর স্পর্শ—সেই বা কেমন কঠিনে কোমলে মিশ্রিত—ত্বগিন্দ্রিয়ের সান্নিধ্যে আসিলে বস্তুতই লোমহর্ষ হয়। উহার শব্দে বিশেষ মহিমা নাই, হয়ত উহা মাটিতে পড়িলে ধব্ করিয়া সাড়া দেয় মাত্র; কিন্তু উহার গন্ধ—তাহাতে রসনা আপনা হইতেই আর্দ্র হইয়া আসে—দূরে থাকিতেই লালা নিঃসারণ করে; সর্ব্বোপরি উহার রস—উহা বর্ণনাতীত—জ্ঞাতাস্বাদঃ কো বিহাতুং সমর্থঃ।

দার্শনিক উহার ভিতরে ছোলা আছে, কি চিনি আছে, কি ময়দার ভেজাল আছে, তাহা লইয়া উদ্বিগ্ন হইবেন না; তিনি দেখিবেন যে, উহা কতিপয় রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের সমষ্টি মাত্র। এই রূপ রসাদিই দার্শনিকের নিকট প্রত্যক্ষ পদার্থ—তিনি যব, গম, ছোলা কিংবা ঘি চিনির অস্তিত্ব আদৌ অবগত নহেন; রূপ-রসাদি লইয়াই তাঁহার কারবার। তিনি বলেন, ঐ মিহিদানা যে তোমার নিকট এত উপাদেয়, উহার-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শই ত উপাদেয়; এমন কি, উহা উদরগত হইলে তোমার যে আরাম হয়, সেই আরামটাই তোমার উপাদেয়। উহার ভিতরে ছাতু আছে, কি বালি আছে, উদজান আছে, কি অম্লজান আছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমার সম্বন্ধ নাই। উহার উপাদেয়ত্ব উহার রূপ-রসের জন্য—সেই জন্য উহার এত আদর। আচ্ছা, উহার রূপটা মনে মনে বাদ দাও; মনে কর, উহার রূপ নাই; উহার ঐ বর্ত্তুল আকৃতি নাই, উহার বর্ণ নাই, উহার উজ্জ্বলতা নাই। ফলে উহা অদৃশ্য হইল; উহা আর দৃষ্টির বিষয় থাকিল না। থাকিল কেবল রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ। আচ্ছা, এখন ঐ রসটাকে বাদ দাও; উহার আস্বাদনে আর কোন

রস পাইতেছ না। উহা আর রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় থাকিল না। পরে মনে কর, উহার কোন গন্ধ নাই, আর কোন ঘ্রাণ পাইতেছ না; ঘ্রাণেন্দ্রিয় উহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। বাদ দাও উহার শব্দ উৎপাদনের ক্ষমতা—তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় উহার সম্পর্কে বধির হইল। শেষ পর্য্যন্ত থাকিল কেবল স্পর্শ; এখনও ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শশক্তি থাকিলে উহার কঠিন কোমল স্পর্শ তোমার বোধের সঞ্চার করিবে; হাতে ধরিলে উহার গুরুত্ব তোমাকে নিপীড়িত করিবে। আচ্ছা, মনে কর, উহা স্পর্শমাত্রও জন্মাইতে পারে না; তখন তোমার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কোন ইন্দ্রিয়ই উহার সম্বন্ধে আর কোন তত্ত্বই আনিয়া দিবে না। উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞানই থাকিবে না। উহার রূপ রস গন্ধ শব্দ সকলই গিয়াছে—স্পর্শ ছিল, তাহাও গেল। তবে থাকিল কি? কেহ কেহ বলিবেন যে, তুমি জানিতেছ না বটে, কিন্তু উহার বস্তুটা, সত্ত্বটা, জিনিষটা ঠিকই আছে। দার্শনিক বলিবেন, জিনিষটা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আমি ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, ইহাই জানিতাম এবং এই রূপ-রসাদির সমষ্টিকেই ত মিছিদানা, এই নাম দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই রূপ-রসাদি সবই যখন গিয়াছে, তখন আর আছে কি? আমার জ্ঞাতসারে কিছুই নাই; আমার জ্ঞানগম্যও কিছুই নাই। অতএব আমি বলিব, কিছুই নাই। আমার জ্ঞানগম্য কিছু যদি না থাকে, তাহা হইলে আমার কাছে থাকা না থাকা সমান। যাহা জ্ঞানগম্য নহে, জ্ঞানগম্য হইবার আশাও নাই, তাহার অস্তিত্ব নির্দ্দেশ বাতুলের প্রলাপ; আমি বলিব কিছুই নাই।

কে ঠিক? বৈজ্ঞানিক ঠিক, না দার্শনিক ঠিক? উভয়েই ঠিক, তবে উভয়ের প্রণালী স্বতন্ত্র, পথ স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নাই, কাজেই বিসংবাদও নাই; যেখানে বিসংবাদ নাই, সেখানে মিটমাট করিবার চেষ্টা, সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা অনাবশ্যক পরিশ্রম। উভয়েই এক হিসাবে বৈজ্ঞানিক; —উভয়েই বিশ্লেষণপটু—একজন বিশ্লেষণ করিয়া দেখান—ঐ যে চিনি, উহাতে এতটা কয়লা, এতটা অক্সিজেন, এতটা হাইড্রোজেন আছে; আর একজন বিশেষণ করিয়া দেখান, উহার এই রূপ—শাদা ধপ্‌ধপে ছোট ছোট দানা—চোখে চমক দেয়, অণুবীক্ষণ লাগাইলে আরও স্পষ্ট দেখা যায়,—এই মধুর আস্বাদন, এই স্পর্শ—ইত্যাদি। এক জন বলেন, কয়লা আর হাইড্রোজন আর অক্সিজন এতটা করিয়া এইরূপে যোগ করিয়া ঐ চিনি আমি তৈয়ার করিয়া দিব; আর এক জন বলেন, ঐ রূপ, ঐ রস, ঐ স্পর্শ প্রভৃতি একত্র যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই হয় চিনি। এক জনের বিজ্ঞানের নাম জড়বিজ্ঞান—এই জড় শব্দটি হালের ভাষায় জড়। আর এক জনের বিজ্ঞান—মনোবিজ্ঞান। এক জন হাতে-হাতিয়ারে কাজ করেন; জল, আগুন, কাচের নল, অণুবীন, নিক্তি ইত্যাদি যন্ত্র তাঁহার সহায়,—তিনি সগর্ব্বে বলেন যে, এতটা চিনিতে এতটা কয়লা আছে, এতটা হাইড্রোজন আছে। আর এক জনের সেইরূপ যন্ত্র নাই; তাঁহার একমাত্র অস্ত্র তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় বা মন ও বুদ্ধি; তিনি কতটা রূপ, কতটা রস, কতটা স্পর্শ, ইহা মাত্রা দ্বারা নিরূপণ করিতে অদ্যাপি অক্ষম। শব্দ-স্পর্শাদি মাপিয়া তাহার মাত্রা পরিমাণের সুচারু উপায় তিনি

অদ্যাপি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার বিশ্লেষণ-প্রণালীতে মূলে গলদ নাই।

আমরা যাহাকে স্থূল জড় পদার্থ বলি,—সোনা রূপা, কাচ কয়লা, চন্দ্র সূর্য্য, এমন কি, মনুষ্যের এমন দেহটা,—এ সকলই এই হিসাবে রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির সমষ্টি মাত্র; উহাদেরই একত্র যোগে নির্ম্মিত। সাংখ্যদর্শনের ভাষায় এই রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির নাম তন্মাত্র। সাংখ্যদর্শন যখন বলেন, এই পাঁচটি তন্মাত্র হইতে ভূত-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সাংখ্যদর্শন ভৌতিক জড় পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া রূপ-রসাদি পাঁচটি তন্মাত্র ভিন্ন আর কিছুই পান না।

ফলে দার্শনিকের নিকট বাহ্য জগতের যাবতীয় স্থূল পদার্থ কতিপয় রূপ-রসাদির সমষ্টি মাত্র। এই রূপ-রসাদি বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাঁহারা বলেন, রূপ-রসাদি বর্জ্জন করিলেও একটা-না-একটা পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহাই খাঁটি জড় পদার্থ—তাহা জ্ঞানগোচর বা জ্ঞানগম্য না হইতে পারে, তথাপি তাহা আছে,—দার্শনিক তাঁহাদিগকে বলেন—থাকুক তোমার খাঁটি জড় পদার্থ—উহা লইয়া তুমি থাক;—উহা যখন আমার জ্ঞানগম্য নহে—উহার সম্বন্ধে যখন আমি কিছুই জানি না, কিছু জানিবার সম্ভাবনাও নাই, তখন তাহার অস্তিত্ব লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডায় অবকাশ আমার নাই—আমি যাহা জানি না, তাহা মানি না। তুমি সাক্ষী দিতে আসিলেও মানিব না, পূর্ব্বের মত বলিব—তুমি কে হে বাপু?

এখন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত দার্শনিক বিশ্লেষণের পার্থক্য বুঝা যাইবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, ইহার ভিতরে একটা কয়লা, এতটা হাইড্রোজন, এতটা সোনা, এতটা রূপা আছে। দার্শনিক সেই দ্রব্যকেই অনুরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, সে হউক, কিন্তু আমার নিকট উহার রূপ এই, রস এই, গন্ধ এই, শব্দ এই, স্পর্শ এই। এই রূপরসাদিকে মিলাইয়া মিশাইয়া ঐ দ্রব্য নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি রূপ-রসাদিই জানি ও তাহাই মানি।

প্রতিপক্ষ হয়ত আস্ফালন করিয়া বলিবেন, তোমার জ্ঞানগোচর না হয় কিছুই নাই, কিন্তু আমার জ্ঞানগোচর ত আছে। তুমি না হয় কাণা কালা, তুমি কিছুই জানিতেছ না; কিন্তু আমি ত স্পষ্ট দেখিতেছি, ঐ মিহিদানা উহার মনোহর রূপ, উহার রস, উহার গন্ধ লইয়া পূর্ব্বের মতই আমার সম্মুখে বিদ্যমান আছে এবং আমাকে ও আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ ও প্রেরণ করিতেছে। এখনই আমি উহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলিতে পারি; কিন্তু তাহা হইলে তোমার মত নাস্তিকের নিকট উহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা আরও কঠিন হইবে; অতএব সবুর করিলাম।

দার্শনিক হাসিয়া বলিবেন, তুমি কে হে বাপু? তুমি ত নিজেই আমার পক্ষে কতিপয় রূপ রস-গন্ধাদির সমষ্টি মাত্র; তুমি না হয় একটা চলন্ত মিহিদানা—দুঃখের বিষয়, মিহিদানার মত উপাদেয় নহে, বরং আমার পক্ষে হেয়। তোমার রূপ রস গন্ধ বাদ দিলে তুমিই বা থাক কোথায়? তোমার স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করে কে, যে তুমি আমার নিকট বাক্‌চাতুরী করিতেছ? যাক, তোমার বাক্‌পটুতা তোমা হইতে বাদ দিলাম—তোমার বাক্য আর আমার শ্রুতিগোচর নহে; তোমার কথায়

আমি বিচলিত হইব কেন?

যাঁহারা দার্শনিক তথ্যগুলিকে এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতদের গাঁজাখুরির বা আফিম-খুরির পরিচয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এই কথাটা বলিয়া রাখা আবশ্যক, এদেশের দার্শনিকেরাও যেরূপ ভৌতিক পদার্থের বিশ্লেষণে পাঁচটি মাত্র প্রত্যয় বই আর কিছু পান না, বিলাতি দার্শনিকেরাও ঠিক সেইরূপ পান না; বার্কলি হিউম হইতে আরম্ভ করিয়া বেইন ও মিল এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা সকলেই এ বিষয়ে একমত। আর যাঁহারা দেশী বিলাতি সকল দার্শনিককেই প্রচ্ছন্ন অফিমখোর বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগকেও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বিলাতি খাঁটি বৈজ্ঞানিকেরাও এ বিষয়ে দার্শনিকদের সহিত বিবাদ করেন না; তাঁহারা যখনই হাত হইতে টেষ্টটিউব নামাইয়া চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়া মানস চক্ষুর দ্বারা ভৌতিক পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন, তখনই সেই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ছাড়া আর কিছু পান না। কতকগুলা নাম দিয়া লাভ নাই; নিতান্তই নাম চাও ত বলিব, আচার্য্য হক্সলি আর অধ্যাপক ক্লিফোর্ড—প্রাণিবিদ্যা ও গণিতবিদ্যা হইতে দুইটা বড় বড় নাম দিলাম। পদার্থবিদ্যা হইতে চাও ত একটা নাম দিতেছি—এত বড় নাম, যাহা আইজাক নিউটনের পরেই বসিতে পারে—এই নাম জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল—যিনি না জন্মিলে আজ হয়ত সমুদ্রের এ-পার হইতে ও পার পর্য্যন্ত বিনা তারে টেলিগ্রাফ চলিত না। যাক—নামে কিছু যায় আসে না; ইহা কেবল অবোধকে প্রবোধ দিবার জন্য।

এখন ভূতের কথা আরম্ভ করা যাউক—প্রথমে সাংখ্যদর্শনের ভাষা আশ্রয় করিব: সাংখ্যের ভাষায় ভূত—কেহ বলেন মহাভূত—পাঁচটি—ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুৎ আর ব্যোম বা আকাশ। আকাশ অর্থে কি? আকাশ বিজ্ঞানের ঈথর নহে—আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাচ্য দর্শনকে মিলাইতে গেলে এখানে ঠকিতে হইবে—কেন না, আধুনিক বিজ্ঞান ঈথরের সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না। কেহ কেহ মনকে বুঝান যে, আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার না করুক, কিন্তু কিছু দিন পরে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করিবেন যে, ঈথরের সহিত শব্দের সম্পর্ক আছে, এবং তখন বুঝিবেন যে, ঋষিবাক্যই ঠিক। আমি সে কথা বলিতে প্রস্তুত নাহি। আমিও বলি যে, ঋষিবাক্য ঠিক; কিন্তু আকাশ অর্থে ঈথর নহে। শব্দতন্মাত্র যাহার গুণ, তাহাই আকাশ। আচ্ছা, যদি একটা বাহ্য ভৌতিক পদার্থ কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে একটা পদার্থ কল্পনা কর, যাহা কেবল শব্দ মাত্র জনন করে, কিন্তু যাহার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আদৌ নাই। তাহারই নাম দাও আকাশ। বস্তুতঃ এরূপ কোন ভৌতিক পদার্থ আছে কি না সন্দেহ—কেবল শব্দগুণ আছে, অন্য গুণ নাই, এমন কোন পদার্থ কখনও আবিষ্কৃত হইবে কি না, বলা যায় না। হউক আর নাই হউক, সাংখ্য-মতে আকাশের সংজ্ঞা হইল এই যে, যাহার কেবল শব্দ-গুণ আছে, অন্য গুণ নাই, তাহাই আকাশ। উহা একটা পারিভাষিক নাম মাত্র; ইংরেজীতে বলিলে একটা concept মাত্র: একটা কাল্পনিক পদার্থ মাত্র। শব্দতন্মাত্রই

উহার স্বরূপ—শব্দের সহিতই উহার সম্পর্ক ;—শব্দজ্ঞান হইতেই উহার উৎপত্তি বা কল্পনা।

তার পর বায়ু—সাংখ্যমতে যাহাতে শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই গুণ মাত্র বিদ্যমান, আর তৃতীয় গুণ নাই, সেই কাল্পনিক পদার্থের নাম বায়ু। বিজ্ঞানে অন্য পদার্থকে বায়ু বলে—যে বায়ু পৃথিবী আবরণ করিয়া আছে, যাহাতে আমরা শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, ইহাকেই বায়ু কহে। সেই বায়ুর শব্দবহনক্ষমতা আছে, স্পর্শ-ক্ষমতা আছে, আবার গন্ধও আছে ; বায়ুর নামান্তরই গন্ধবহ। কাজেই এই বায়ু সাংখ্যের বায়ু নহে। যদি বল, বায়ুতে যে গন্ধ বহন করে, উহা বায়ুর নিজের গন্ধ নহে, ফুলের গন্ধ বা কর্পূরের গন্ধ বা অন্য দ্রব্যের গন্ধ, কঠিন পদার্থের অর্থাৎ ক্ষিতিজ পদার্থের কণিকা আনিয়া বায়ু সেই ক্ষিতির গন্ধ বহন করে ; তাহার উত্তরে আধুনিক বিজ্ঞান বলিবেন, তা বলিলে চলিবে কেন ; যাহাকে আমরা বায়ু বলি, তাহা কতিপয় বাষ্পীয় পদার্থের মিশ্রণজাত ; উহাতে অক্সিজন আছে, নাইট্রোজন আছে, জলীয় বাষ্প আছে, কয়লাপোড়া বায়ু আছে, তাহাদের গন্ধ না হয় আমরা টের পাই ; কিন্তু অতি সামান্য একটু আমোনিয়া আছে, তাহার ত তীব্র গন্ধ ; যদিও খুব সামান্য মাত্রায় আছে বলিয়া আমরা টের পাই না, কিন্তু আছে ত, আমাদের বিজ্ঞান তাহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে উহা ধরিতেছে, তোমার দর্শনবিদ্যা স্থূল বিশ্লেষণে তাহা ধরিতে পারে নাই। অতএব ভৌম বায়ুর গন্ধ নাই বলিলে মানিব কেন ? আবার যদি বলা হয় যে দর্শনের বায়ু অর্থাৎ মহাভূত বায়ু বায়বীয় পদার্থ মাত্রকেই বুঝায়, তখনও ঐ আপত্তি আসিবে। আজকাল কলেজের ছেলেরা দার্শনিক পণ্ডিতকে তাহাদের লাবরেটারিতে লইয়া যাওয়া এমন অপ্রস্তুত করিয়া ফেলিবে যে, তিনি বায়বীয় পদার্থের গন্ধে তিষ্ঠিতেই পারিবেন না। তাহারা ক্লোরিন তৈয়ার করিয়া দেখাইবে—এই দেখ, ইহা ত বায়ু ; ইহাতে ক্ষিতির বা জলের কণিকা মাত্র নাই ; অথচ ইহার কেমন বিকট গন্ধ, আবার কেমন ঈষৎ হরিদাভ বর্ণ। এরূপে অপ্রতিভ হওয়ার চেয়ে বিজ্ঞানের সহিত সন্ধি-বন্ধনের চেষ্টা না করাই ভাল। আমরা সেরূপ চেষ্টা করিব না। আমি বলিব যে, দর্শনের বায়ু একটা কল্পিত পদার্থ ; একটা concept মাত্র ; উহার শব্দবহন শক্তি আছে, আর স্পর্শ-জননশক্তি আছে, অন্য কোন শক্তি নাই। দর্শনের বায়ু শব্দের এই সংজ্ঞা ধরিয়া বসিলে কাহারও সাধ্য নাই যে, আমার সহিত বিবাদ করে। আমি পরিভাষা তৈয়ার করিতে বসিয়াছি—আমার ইচ্ছামত শব্দ গড়িব ও তাহার যাহা ইচ্ছা নাম দিব—ইহাতে কাহারও আপত্তি ঘটিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর।

তার পর তৃতীয় মহাভূত তেজ। সাংখ্যের মতে ইহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ, এই তিন গুণ বিদ্যমান—উহা এই তিনের সমষ্টি ; এই তিন তন্মাত্র লইয়া উহা নির্ম্মিত—এই তিন লইয়া উহার উৎপত্তি বা উহার কল্পনা—উহাতে চতুর্থ আর কিছু নাই। উহা আগুন নহে, অন্য কোন তৈজস পদার্থ নহে, আধুনিক

বিজ্ঞানে ইলেকট্রন বা সেকালের বিজ্ঞানের কালরিক ফ্লজিস্তন, ইলেক্‌ট্রিসিটি বা ম্যাগ্নেটিসম, কাহারও মুখ চাহিয়া থাকা আবশ্যক নহে। উহা একটা concept মাত্র - নাম মাত্র—কাল্পনিক পদার্থ মাত্র। সাংখ্যের পরিভাষা মতে উহা শব্দ স্পর্শ রূপ, এই তিনের সমষ্টি মাত্র।

এইরূপ চতুর্থ মহাভূত অপ্‌ বা জলের সাংখ্যমতে অর্থ সেই কাল্পনিক পদার্থ, যাহাতে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস বিদ্যমান। এই চারিটি তন্মাত্রের সমষ্টির পারিভাষিক নাম অপ্‌। উহা আমাদের পানীয় জলও নহে, যে-কোন তরল পদার্থও নহে।

পঞ্চম মহাভূত ক্ষিতি পঞ্চ তন্মাত্রের সমষ্টি; অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, পাঁচটিই যাহাতে বিদ্যমান, তাহার পারিভাষিক নাম ক্ষিতি। ক্ষিতি অর্থে মাটি নহে, অথবা সাধারণ কঠিন পদার্থ নহে।

দেখা গেল—ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম, এই পাঁচটি নামে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচিত জগতের কোন দ্রব্যকেই বুঝায় না। ঐগুলি কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র—ইংরেজীতে যাহাকে concept বলে, মনঃকল্পিত নাম বলে, তাহাই;—যাহাকে percept বলে—যাহা প্রত্যয়লব্ধ—তাহা নহে। এই সমস্ত concept মনঃকল্পিত পদার্থ, বস্তুজগতে উহাদের অস্তিত্ব নাই। এইরূপ পারিভাষিক কল্পিত পদার্থ লইয়া কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, সকলকেই কারবার করিতে হয়, নহিলে ভৌতিক জগতের কোনরূপ বিবরণ দেওয়া, কোনরূপ তাৎপর্য্য বুঝা চলে না। পদার্থবিজ্ঞান বস্তুজগতের—স্থূল জড় জগতের তত্ত্বনিরূপণে ব্যাপৃত আছেন। আপাততঃ মনে হইতে পারে—বৈজ্ঞানিক কেবলই সত্য লইয়া ব্যাপৃত, কল্পনার ছায়া মাড়ান না—কিন্তু এই সকল মনঃকল্পিত concept নহিলে তাঁহারও এক পা অগ্রসর হওয়া চলে না। তিনি সর্ব্বদাই perfect solid, perfect fluid, frictionless surface perfect rigid, inextensible string প্রভৃতি লইয়া কারবার করেন; ঐ সকল পদার্থ দুনিয়ায় দুর্লভ। বৈজ্ঞানিকের মানসিক জগতে উহারা বিদ্যমান—জড় জগতের কুত্রাপি উহাদিগকে খুঁজিয়া মেলে না। Statics বা স্থিতিবিজ্ঞান নামক বিদ্যার উপর যত ইঞ্জিনিয়ারের সমস্ত বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত; ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যার মত বস্তুগত বিজ্ঞান নাই; রেলওয়ের সাঁকো নির্ম্মাণে উহার একটু ভুল-চুক হইলে আরোহী সমেত ট্রেন নদীমধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্য তখন বাহির হইয়া পড়ে। কল্পনার খেলা খেলিবার অবসর তাঁহার আদৌ নাই। কিন্তু উপরে যে কয়েকটি ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিলাম, তাহার অধিকাংশই পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত Statics বা স্থিতিবিজ্ঞান হইতে গৃহীত। একখানি Statics এর বহিতে দেখিতেছিলাম, আঁক দেওয়া হইতেছে—Suppose that an weightless elephant is sliding down a perfectly smooth hill surface—মনে কর, একটা ওজনহীন হাতী একটা তেলচুকচুকে মসৃণ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই ওজনহীন হাতী আর তেলচুকচুকে গিরিগাত্র—বিধাতার সৃষ্টিতে কুত্রাপি মিলিবে

না ; ইহা বৈজ্ঞানিকরূপ বিশ্বামিত্রের মানস সৃষ্টিতে বিদ্যমান।

এখন সাংখ্যদর্শনের পঞ্চ মহাভূতও বিধাতার সৃষ্টিতে নাই ; উহা কপিল মুনি বা অন্য কোন মুনির মনে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই মুনি কামনা করিলেন, 'তাহারা হউক' —অমনি তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে 'হইল' এবং মুনি চাহিয়া দেখিলেন, 'তাহারা উত্তম হইয়াছে'। উত্তম হইয়াছে, কেন না, ঐ কয়টি মশলা লইয়া তিনি স্থূল ভৌতিক জগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছিলেন এবং তাহাতে সফল হইয়াছেন। স্থূল জগৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দেরই সমষ্টি। এই পাঁচটি তন্মাত্র ভিন্ন আর কোন সামগ্রী জড় জগতে নাই ; থাকিলেও তাহা জ্ঞানগম্য নহে, এবং যাহা জ্ঞানগম্য নহে, তাহা নাস্তি। আর ক্ষিত্যাদি কল্পিত মহাভূতও তন্মাত্রের সমষ্টি ; তবে কোন মহাভূতে একটি, কোন মহাভূতে দুইটি, কোনটায় তিনটি, কোনটায় চারিটি, কোনটায় বা পাঁচটি তন্মাত্র বিদ্যমান। অতএব এই পাঁচটি মহাভূতকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বিবিধ পরিমাণে মিলাইয়া মিশাইয়া যাবতীয় ভৌতিক পদার্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অত্র সন্দেহো নাস্তি।

ধরিয়া লও আমাদের পরিচিত মাটি—যে মাটিতে ঘাস গজায়। ইহার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সবই আছে— উহাতে ক্ষিতি ত আছেই, অন্যান্য মহাভূতও যে নাই, তাহা নহে। আবার লও এক টুকরা হীরা বা চুণি ; উহার উজ্জ্বল রূপ আছে, কঠিন স্পর্শ আছে, শব্দ আছে, কিন্তু রস বা গন্ধ উহাতে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অতএব সাংখ্যের মতে উহাতে তেজের ভাগই অধিক ; উহাকে তৈজস পদার্থ বলিলে বিশেষ হানি হইবে না—যদি উহাতে যৎকিঞ্চিত রস বা গন্ধ বাহির করিতে পার তাহা হইলে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষিতিও আছে মনে করিলে চলিবে। আবার সেই ক্লোরিন বায়ু—উহাতে পারিভাষিক বায়ু ত আছেই ; কিন্তু উহার যখন বিকট গন্ধ ও হরিদাভ বর্ণ দেখা যাইতেছে, তখন উহাতে সাংখ্যদর্শনের পরিভাষিক ক্ষিতি ও পরিভাষিক তেজের অস্তিত্বও মানিতে হইবে—মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষিতি মাটি নহে, কোন কঠিন পদার্থও নহে, এবং এই তেজ জ্বলন্ত অগ্নিকণাও নহে।

এখন বুঝা যাইবে যে, স্থূল জড় জগৎ—পাঞ্চভৌতিক জগৎ—মাটি কাঠ সোনা রূপা চন্দ্র সূর্য্য—সকলেই কিরূপে পঞ্চভূতে নির্ম্মিত মনে করা যাইতে পারে। ইহা দার্শনিক বিশ্লেষণের ফল—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নহে। ইহা বিশ্লেষণের দোষ এই এবং ত্রুটি এই যে, কোন প্রত্যক্ষ দ্রব্যে কতটা ক্ষিতি, কতটা তেজ, কতটা বায়ু বর্ত্তমান, তাহা পরিমাণের উপায় বাহির হয় নাই। দার্শনিক বিশ্লেষণে নিক্তির ওজনের সূক্ষ্মতা নাই। রূপ রস শব্দ প্রভৃতির মাত্রা-পরিমাণের উপায় আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই মোটা বিশ্লেষণেই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে। দার্শনিক বিশ্লেষণের মাত্রা নিরূপণ (quantitative analysis) না চলিলেও গুণগত বিষেণ (qualitative analysis) চলিতে পারে। রূপ কেমন, নীল কি পীত, শুভ্র কি কৃষ্ণ ; রস কেমন—অম্ল কি মধুর, তিক্ত কষায়—স্পর্শ কেমন—বন্ধুর কি মসৃণ, কঠোর কি কোমল, শীত কি উষ্ণ, এরূপ নিরূপণ চলিতে পারে। উহা মনোবিজ্ঞানের কাজ। এ-কালে যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের সহিত পদার্থবিজ্ঞানের সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা করিতেছেন,

তাঁহারা যন্ত্রের সাহায্যে রূপ-রসাদির মাত্রানিরূপণেও চেষ্টা করিতেছেন। ঘর্ম্মমান (থার্ম্মোমিটার), দীপ্তিমান (ফটোমিটার), বর্ণ-চক্র (colour disc) প্রভৃতি যন্ত্র তাহার দৃষ্টান্ত। জীবনবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরাও নানা উপায়ে রূপ-রসাদির মাত্রা পরিমাণ করিয়া জড়বিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে সকল কথা থাক্।

বেদান্তের পরিভাষায় ভূত শব্দের তাৎপর্য্য একটু পৃথক্। বেদান্ত আর একটু সূক্ষ্ম হিসাবের চেষ্টা করেন। গোড়ার কথা একই। বাহ্য জগৎ রূপ-রসাদি পঞ্চ তন্মাত্রে বা পঞ্চ প্রত্যয়ে নির্ম্মিত। সাংখ্য বেদান্ত উভয়েই ইহা মানিয়া লয়েন। ভূতে আসিয়া উভয়ে একটু ভিন্ন পরিভাষা প্রয়োগ করেন।

বেদান্ত সূক্ষ্ম ভূত আর স্থূল ভূত, এই দ্বিবিধ ভূতের কথা কহেন। এই দ্বিবিধ ভূতই পারিভাষিক, অতএব কাল্পনিক।

বেদান্ত-মতে সূক্ষ্ম আকাশ অর্থে সেই কাল্পনিক বস্তু, যাহার কেবল শব্দ-গুণ আছে, অন্য কোন গুণ নাই; সূক্ষ্ম মরুৎ অর্থে যাহার কেবল স্পর্শগুণ আছে, অন্য কোন গুণ নাই; সূক্ষ্ম তেজ অর্থে যাহার কেবল রূপ আছে; সূক্ষ্ম জলের রস মাত্র আছে। বলা বাহুল্য, কেবল একটি মাত্র গুণবিশিষ্ট পদার্থ ভৌতিক জগতে অস্তিত্বহীন—ঐ পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূতই কল্পনা মাত্র। এক একটি তন্মাত্র লইয়া এক একটি সূক্ষ্ম ভূত; এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত করিলে যাহা ঘটে, তাহা স্থূল ভূত। বেদান্তের পরিভাষা অনুসারে প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূতের চারি ভাগে অন্য চারিটি সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেকের এক ভাগ করিয়া যোগ করিলে স্থূল ভূত হয়। যে কোন স্থূল ভূতকে বিশ্লেষণ করিলে একটা সূক্ষ্ম ভূত বহু পরিমাণে, অন্যগুলি অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইবে। বেদান্তের কল্পনায় স্থূল ভূতের ষোল আনা বিশ্লেষণ করিলে একটা সূক্ষ্ম ভূতের আট আনা, অন্য চারিটার প্রত্যেকের দুই আনা, মোটের উপর এই ষোল আনা পাওয়া যাইবে। যথা, স্থূল আকাশের ষোল আনার ভিতরে সূক্ষ্ম আকাশ আট আনা আছে; তদ্ব্যতীত সূক্ষ্ম ক্ষিতি, সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম মরুৎ, দুই আনা করিয়া মোটের উপর আট আনা আছে। এইরূপ স্থূল ক্ষিতির ষোল আনার ভিতর সূক্ষ্ম ক্ষিতি আট আনা আছে, আর সূক্ষ্ম জল, সূক্ষ্ম তেজ, সূক্ষ্ম মরুৎ, সূক্ষ্ম আকাশ দুই আনা করিয়া আছে। এইরূপ অন্যান্য স্থূল ভূতেও।

ফলে বেদান্তের পরিভাষায় সূক্ষ্ম ক্ষিতি বিশুদ্ধ ঘ্রাণগুণযুক্ত; উহাতে অন্য গুণ নাই; কিন্তু যাহাকে স্থূল ক্ষিতি বলা যাইবে, তাহাতে ঘ্রাণটাই প্রবল, কিন্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শও কিয়ৎ পরিমাণে আছে। এইরূপ স্থূল জলের রসগুণটাই প্রবল, অন্যান্য গুণ দুর্ব্বল। প্রত্যেক স্থূল ভূতেই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, এই পাঁচ গুণ বিদ্যমান, তবে একটা প্রবল, অন্যগুলি দুর্ব্বল। কাজেই ঘুরাইয়া বলা হয়, পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত বিভিন্ন মাত্রায় মিশাইয়া পাঁচ স্থূল ভূত নির্ম্মিত হয়। এইরূপে পাঁচ গুণ মিশাইয়া বা পাঁচ সূক্ষ্ম ভূত মিশাইয়া স্থূল ভূত নির্ম্মাণের নাম পঞ্চীকরণ।

বলা বাহুল্য, এই পাঁচটি স্থূল ভূতও সংজ্ঞা মাত্র, নাম মাত্র বা concept মাত্র; কেন না, ভৌতিক জগতে এমন কোন সামগ্রী পাওয়া যাইবে না, মাটি কাঠই বল, আর

সোনা রূপাই বল, কোন সামগ্রী পাওয়া যাইবে না, যাহার সম্বন্ধে জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে ঘ্রাণগুণ ঠিক আনা, আর অন্যান্য গুণ ঠিক দুই আনা করিয়া আছে। তন্মাত্রগুলির মাত্রাপরিমাণ যখন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য, তখন কে বলিতে পারিবে যে, দুধের ভিতর এতটা রূপ, এতট রস, এতটা গন্ধ, এতটা স্পর্শ, এতটা শব্দ রহিয়াছে। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, পাঁচটা গুণই হয়ত কিছু কিছু আছে, তবে কোনটা অধিক, কোনটা অল্প। যেমন এক টুকরা সোনার রূপটা প্রবল, স্পর্শ টাও প্রবল, শব্দও কিছু আছে; কিন্তু গন্ধ বা রস নাই বলিলেই হয়। হাইড্রোজেন নামক বায়ু অদৃশ্য ও ঘ্রাণহীন ও স্বাদহীন, কাজেই উহার রূপ রস গন্ধ তিনই নিতান্ত দুর্ব্বল; স্পর্শ ও শব্দবশতই মুখ্যতঃ উহা জ্ঞানগম্য। কাজেই কোন জাগতিক সামগ্রীকেই স্থূল ভূত মনে করা যাইতে পারে না। সূক্ষ্ম ভূতগুলি যেমন কাল্পনিক, স্থূল ভূতও তেমনই কাল্পনিক; তবে স্থূল ভূতগুলিকে আবার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিলাইয়া যে কোন জাগতিক পদার্থ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। অতএব দাঁড়াইল এই যে, জাগতিক পদার্থ মাত্রই স্থূল ভূত নির্ম্মিত—স্থূল ভূতগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় মিলাইয়া মিশাইয়া যাবতীয় জাগতিক পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থূল ভূতগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূতই পাওয়া যাইবে, একটা অধিক পরিমাণে, অন্যগুলি অল্প পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

সাংখ্যের ও বেদান্তের পরিভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইলেও উভয়েই এক রীতি আশ্রয় করিয়া জগদ্ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উভয়েরই এক মত। উভয়েই বাহ্য জড় জগৎকে পঞ্চ ভূতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; সাংখ্যের মহাভূত ও বেদান্তের স্থূল ভূত, উভয়ই তন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র। জগদ্ব্যাপার বা দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিবার পক্ষে উভয়েই প্রায় তুল্যমূল্য। মনে রাখিতে হইবে যে, এই জগদ্বিশ্লেষণ-প্রণালী বৈজ্ঞানিকের অর্থাৎ রসায়নবিদের বিশ্লেষণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দার্শনিক বিশ্লেষণের সহিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সমন্বয় ঘটাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ঘটানও অসাধ্য। উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—উভয়ের রীতি স্বতন্ত্র। বৈজ্ঞানিকের এলিমেণ্ট আর দার্শনিকের ভূত, উভয় শব্দের এক অর্থ, এক তাৎপর্য্য নহে। অতএব এ-কালের পণ্ডিতেরা আশীটা এলিমেণ্ট আবিষ্কার করিয়াছেন ও আরও করিতেছেন, আর সেকালের পণ্ডিতেরা পাঁচটা ভূতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, ষষ্ঠ ভূত কল্পনার চেষ্টা মাত্র করেন নাই, ইহাতে বিস্মিত ক্ষুব্ধ, পরিতপ্ত বা শোকগ্রস্ত হইবার কোনই হেতু নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, দার্শনিক পণ্ডিতগণের এই কল্পনায় কাহার কি লাভ? তাঁহাদের এই ব্যর্থ পরিশ্রম কেন? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাবতীয় জড় পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া যে সব তত্ত্ব পাইতেছেন, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। লাবোয়াশিয়ার পর হইতে তাঁহারা সকলে মিলিয়া রসায়নবিজ্ঞানের যে অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে চোখ জুড়ায়; উহার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইলে মানুষ একটা অবলম্বন পায়। রসায়নবিজ্ঞান মানুষের কাজে লাগে—মানুষ রসায়নবিজ্ঞানের বলে জগতের উপর কত ক্ষমতা, কত প্রভুত্ব উপার্জ্জন করিয়াছে;—পেটুকের জন্য চিনি ও মাতালের জন্য মদ তৈয়ার করিতেছে; আলকাতরার ভিতর হইতে কত

রঙ-বেরঙ বাহির করিতেছে ;—সে দূরে যাক, সূর্য্যমণ্ডলের তারকামণ্ডলে লোহা আছে, না দস্তা আছে, তাহাও অবলীলাক্রমে বলিয়া দিতেছে। আর দার্শনিকের গন্ধ স্পর্শ রূপ রসের আবিষ্কারে কাহার কি লাভ? মরুভূমিতে লাঙ্গল চষিয়া তিনি কি ফশল উৎপাদন করিবেন? হাওয়ার উপর বাড়ী গাঁথিয়া তিনি কাহাকে সেখানে বাস করিতে বলিবেন? তাঁহার ব্যোমের উপর তিনি যে বুদ্বুদের পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার দশা বিশ্বামিত্রের পুরীর মত হইবে না কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার এখন সময় নাই। পাঠককে যদি পঞ্চ ভূতের তাৎপর্য্য বুঝাইতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলেই যথেষ্ট।

উত্তাপের অপচয়

সেকালে ও একালে অনেকে ভূত দেখিয়াছেন ভূতের আবিষ্কার করিয়াছেন। স্পিরিচুয়ালিষ্টরা ভূতের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু কেহ ভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা না কি ভূত মানেন না; কিন্তু তাঁহারা ভূতের সৃষ্টি করিতে পারেন। পূর্ব্বপ্রসঙ্গে পঞ্চ ভূতের কথা বলিয়াছি ; ঐ পঞ্চ ভূত দার্শনিক পণ্ডিতের সৃষ্টি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গেও ভূতের কথা পাড়িতে হইবে ; উহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সৃষ্টি। জেম্‌স্ ক্লার্ক মাক্সওয়েল গত শতাব্দীতে কেম্ব্রিজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এরকম ভূতের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন ; সেই ভূতের কথা এই প্রসঙ্গে উঠিবে।

প্রদীপ জ্বালিয়া আমরা রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া থাকি, এবং তজ্জন্য কাঠ তেল চর্ব্বি পোড়াইয়া আলো জ্বালি। একালের লোকে গ্যাস পোড়ায়, অথবা কয়লা পোড়াইয়া বা দস্তা পোড়াইয়া বিজুলি বাতি জ্বালায়। মানুষে মনে করে, এ একটা প্রকাণ্ড বাহাদুরি ; অগ্নির আবিষ্কারের মত এত প্রকাণ্ড আবিষ্কারই বুঝি আর কখনও হয় নাই। সূর্য্যদেব সন্ধ্যার পর সরিয়া পড়িয়া আমাদিগকে আলোকে বঞ্চিত করেন ; কিন্তু আমরা কেমন সহজ উপায়ে ঘোর অন্ধকারেও আমাদের কাজ সারিয়া লই। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া সহজ কথা নহে। সূর্য্যদেব আমাদিগকে ফাঁকি দিতে চান ; আমরা কিন্তু দিয়াশলাই ঠুকিয়া আলো জ্বালি, এবং হাজার হাজার মশাল ও প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর ও নগর আলোকিত করিয়া তাহার পাল্টা দিই।

প্রকৃতিকে এইরূপে ফাঁকি দিয়া আমরা উৎফুল্ল হই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী, যাঁহাদের নাম বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা সম্প্রতি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমরা ফাঁকি দিতেছি, না ফাঁকি পড়িতেছি ?

প্রত্যেক দীপশিখা প্রতি মুহূর্ত্তে বৈজ্ঞানিককে স্মরণ করাইয়া দেয়, তুমি বড় নির্ব্বোধ, অথবা তোমার ভবিষ্যতের চিন্তা আদৌ নাই ; তোমার চোখের উপর এত বড় সর্ব্বনাশটা ঘটিতেছে ; তাহার নিবারণে তোমার আজ পর্য্যন্ত ক্ষমতা জন্মিল না ; ধিক্ তোমার জ্ঞানগর্ব্বকে, ধিক্ তোমার বৈজ্ঞানিকতাকে। দীপশিখার এই নীরব বাণী বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে তীব্র শেলের ন্যায় বিদ্ধ হয়।

কথাটা হেঁয়ালির মত হইল। কিন্তু এই হেঁয়ালি ভাঙিতে গেলেই কবিত্ব ছাড়িয়া হঠাৎ বিকট গদ্যে অবতরণ করিতে হইবে।

কথাটা এই। একটা গরম জিনিষের পাশে একটা ঠাণ্ডা জিনিষ রাখিলে সেই ঠাণ্ডা জিনিষটা একটু গরম হয়, আর সেই গরম জিনিষটা একটু ঠাণ্ডা হয়; বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে, খানিকটা তাপ গরম জিনিষ হইতে বাহির হইয়া ঠাণ্ডা জিনিষে যায়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। ইহাকে তাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা প্রবণতা বলিলেও চলিতে পারে। জল যেমন উঁচু জায়গা হইতে স্বভাবতই নীচে নামে, তাপও সেইরূপ স্বভাবতঃ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়। ইহা অত্যন্ত পুরাতন ও পরিচিত ঘটনা; ইহাতে কোনই নূতনত্ব নাই। জল যেমন স্বভাবতঃ উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামে, আপনা আপনি কখনও নীচে হইতে উচ্চে যায় না, তাপও সেইরূপ কখনও আপনা হইতে ঠাণ্ডা জিনিষ হইতে গরম জিনিষে যায় না। পাঠক কখন যাইতে দেখিয়াছেন কি? যদি দেখিয়াছি বলেন, তাহা হইলে আপনাকে জল-উঁচুর দলে ফেলিব।

কিন্তু ইহা সম্ভবপর হইলে মন্দ হইত না। মনে কর, কয়লা'র উনানের উপর এক ঘটি জল রাখিয়াছি। প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে, তপ্ত কয়লা হইতে তাপ নির্গত হইয়া ঠাণ্ডা জলে যায় ও ঠাণ্ডা জলকে ক্রমশঃ তপ্ত করিয়া তোলে। যদি ইহার বিপরীত ঘটনা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে ঠাণ্ডা জল হইতে তাপ বাহির হইয়া গরম কয়লায় ক্রমে প্রবেশ করিত ও জলটা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বরফে পরিণত হইত। দারুণ গ্রীষ্মে আমরা মফস্বলে বসিয়া কয়লার জ্বালে জল ঠাণ্ডা করিয়া বরফ তৈয়ার করিতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগতের বর্ত্তমান নিয়মে ইহা সাধ্য হয় না।

পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই নিয়মটা বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আপনার মস্তিষ্কের এক কোণে পুরিয়া রখিবেন।

আর একটা কথা। তাপ নামক নিরাকার বা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থটা অত্যন্ত কাজের জিনিষ, এই ষ্টিম এঞ্জিনের যুগে ইহা বলা বাহুল্য। কলিকাতায় তাড়িতপ্রবাহ-যোগে ট্রামগাড়ী চলিতেছে। কিন্তু তাড়িতপ্রবাহের মূল কোথায়? কতকটা কয়লা পোড়াইয়া, তদুৎপন্ন তাপকে তাড়িতপ্রবাহের শক্তিতে পরিণত করিয়া, পরে তদ্দ্বারা ট্রামগাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাপেরই কিয়দংশ হইতে সহরের রাজপথগুলি রাত্রিকালে আলোক পায়, গৃহস্থেরা আপন আপন ঘরে দীপ জ্বালে ও রান্না করে, আফিস-ঘরের টানা-পাখা চলে, ময়দা ও শুরকির কল পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। অতএব তাপ পদার্থটা কাজের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাপ হইতে আমরা কাজ পাই কিরূপে? একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

একটা উদাহরণ লও। মনে কর, বর্ত্তমান কালের ষ্টিম এঞ্জিন বা বাষ্পীয় যন্ত্র। এই যন্ত্র তাপকে কাজে পরিণত করিয়া তদ্দ্বারা জল তোলে, গাড়ী টানে, জাহাজ চালায়, ময়দা পিষে ইত্যাদি। কিন্তু প্রণালীটা কিরূপ? কয়লা পোড়াইয়া তাপ জন্মান হয়। সেই তাপের কিয়দংশ জল গরম করিতে যায়। গরম জল বাষ্প হয়; সেই বাষ্প এঞ্জিনে ঠেলা দিয়া এঞ্জিন চালায় ও কাজ করে এবং কাজ করিয়া ঠাণ্ডা জলে

মেশে। খানিকটা তাপও সেই বাষ্পের সঙ্গে গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে যায়। এই গরম জায়গা হইতে ঠাণ্ডা জায়গায় যাইবার সময় সেই তাপের কিয়দংশ মাত্র কাজে পরিণত হয়। এখন এই কথা দুইটি মনে রাখিতে হইবে—(১) তাপ গরম জল হইতে ঠাণ্ডা জলে যাইবার সময় তাহা হইতে কাজ পাওয়া যায়। গরম জল যত গরম হইবে, আর ঠাণ্ডা জল যত ঠাণ্ডা হইবে, তত বেশী কাজ পাওয়া যাইবে। গরম জল যদি বেশী গরম না হয় আর ঠাণ্ডা জলও যদি বেশী ঠাণ্ডা না হয়, অথবা উভয় জলই যদি সমান গরম বা সমান ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলে কোন কাজই পাওয়া যায় না। (২) তাপের কিয়দংশ মাত্র কাজে লাগে—সমস্ত তাপটা কোন রকমেই কাজে লাগে না; যেমনই যন্ত্র তৈয়ার কর না কেন, সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগাইতে কোন মতেই পারা যায় না। গরম জল যদি ফুটন্ত জলের মত গরম হয়, আর ঠাণ্ডা জল যদি বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, তাহা হইলেও গরম জল হইতে যে তাপ আসে, অত্যুৎকৃষ্ট এঞ্জিন যোগেও তাহার সিকি ভাগও কাজে লাগে না। যে সকল এঞ্জিন লইয়া আমরা কারবার করি, তাহাতে সিকি দূরের কথা, সিকির সিকি কাজে লাগিলেই যথেষ্ট। বাকী সমস্ত তাপটার অপব্যয় হয় মাত্র।

কাজেই তাপ থাকিলেই কাজ পাওয়া যায়, এমন নহে; সেই তাপ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যাইবার সময় তাহাকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু তখনও আবার সমস্ত তাপটাকে কাজে লাগান চলে না; তার কিয়দংশ মাত্র, অতি সামান্য অংশ মাত্র কাজে লাগে। বাকী সমস্তটা গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে চলিয়া যায়। এখন বোঝা গেল, কয়লা পোড়াইয়া তাপ খানিকটা জন্মাইতে পারিলেই বিশেষ লাভ হয় না; সেই তাপটা আবার গরম জিনিষে সঞ্চিত থাকা চাই; যত গরম দ্রব্য থাকিবে, ততই কার্য্যকরী ক্ষমতা অধিক হইবে; আর যত ঠাণ্ডা আধারে থাকিবে, ততই তাহার কাজ করিবার ক্ষমতা অল্প হইবে। মনে কর, এক সের ফুটন্ত জল আছে, আর এক সের বরফের মত ঠাণ্ডা জল আছে; এখন ছোট্ট একটি এঞ্জিন লাগাইয়া ফুটন্ত জলের তাপ ঠাণ্ডা জলে যাইবার সময় উহার কিয়দংশ,—দুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক,—কাজে পরিণত করিতে পারিবে। বাকী চৌদ্দ আনা, কি পনর আনা ঐ ঠাণ্ডা জলে গিয়া ঠাণ্ডা জলকে গরম করিয়া দিবে। দুই আনাই হউক আর এক আনাই হউক, কিছু কাজ এইরূপে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেই এক সের ফুটন্ত জল ও এক সের ঠাণ্ডা জল, স্বতন্ত্র না রাখিয়া একত্র মিশিয়া ফেল; দুই সের মাঝামাঝি রকম গরম—না গরম, না ঠাণ্ডা—জল পাইবে; এ ক্ষেত্রে জলেরও এক কণা নষ্ট হইবে না, তাপেরও এক কণা নষ্ট হইবে না; কিন্তু কাজ এক আনা দূরের কথা, এক ক্রান্তিও পাইবার আশা থাকিবে না।

এক কথায় এইরূপ দাঁড়ায়। কোন দ্রব্যের যদি একাংশ উষ্ণ থাকে, অন্য অংশ শীতল থাকে, তাহা হইলে উষ্ণাংশ হইতে শীতলাংশে তাপ চলিবার সময় তাহা হইতে কতক কাজ মিলিতে পারে। কিন্তু সেই দ্রব্যের সকল অংশই যদি সমান উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে তাপ এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইতেও চাহে না, তাহা হইতে কাজ পাইবার আশাও থাকে না।

ক্ষুদ্র বাষ্পীয় যন্ত্রটাকে ত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড বিশ্বযন্ত্রটার বিষয় এক বার ভাবিয়া দেখ। বিশ্বযন্ত্রের পক্ষেও এই নিয়ম। সে নিয়মে বাষ্প-যন্ত্র চলে, এখানেও সেই নিয়মেই তাপ হইতে কাজ হয়। বিশ্বযন্ত্রের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সকল স্থল সমান উষ্ণ নহে। দৃষ্টান্ত সংগ্রহে কষ্ট পাইতে হইবে না। ঐ সূর্য্য কি ভয়ানক গরম, আর এই পৃথিবী তাহার তুলনায় কত ঠাণ্ডা; আর তাপ সর্ব্বদাই গরম সূর্য্য হইতে ঠাণ্ডা পৃথিবীতে আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবী প্রতিদিন সূর্য্য হইতে যে তাপ পায়, তাহার কতটুকু কাজে লাগে? কতকটা কাজে লাগে বটে; কেন না, সেই কতকটার জোরেই আমাদের অশ্বো ধাবতি, বায়ুর্বাতি, জলং পততি, গৌঃ শব্দায়তে; এমন কি, এই জীবধাত্রী ধরিত্রীর প্রায় সকল কার্য্যই তাহারই বলে নির্ব্বাহিত হইতেছে; কিন্তু বাকী যে তাপটা কোন কাজেই লাগে না, কেবল সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে যায় ও পৃথিবী হইতে আকাশে ছড়াইয়া পড়ে, কাহারও কোন কাজে লাগে না, কেবল অপচয়ে, ও অপব্যয়ে যায়, তাহার তুলনায় উহার পরিমাণ কত সামান্য!

যাহা যায়, তাহা আর আসে না। কত কবি ও কত দার্শনিক কালস্রোতের ও জীবন-স্রোতের অপচয় দেখিয়া হা-হতাশ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই তাপস্রোতের ভীষণ অপচয় দেখিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ এক ছত্র কবিতাও লিখিল না, কোন পণ্ডিতও একটা তত্ত্বকথার উপদেশ দিল না।

এই সংসারের নিয়মই এই যে, যাহা যায়, তাহা আর ফিরে না। যে তাপ গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে যায়, তারা আর ফিরে না। কেন না, তাপের স্বভাবই এই। জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্নপ্রবণ, তাপ তেমনই স্বভাবতঃ শৈত্যপ্রবণ,—ইহার স্বাভাবিক গতিই উষ্ণ স্থল হইতে শীতল স্থানে; একবার শীতল পদার্থে স্থান পাইলে আর উষ্ণ পদার্থে সহজে আসিতে চায়-না। মানুষে চেষ্টা করিয়া, আপনার শক্তি ব্যয় করিয়া জলকে উচ্চে ঠেলিয়া তোলে; সেইরূপ শক্তি ব্যয় করিয়া খানিকটা তাপকেও ঠাণ্ডা হইতে গরমে তুলিতে পারে বটে; কিন্তু প্রকৃতির এমনই বিধান যে, একগুণ তাপকে উষ্ণ স্থলে তুলিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দশগুণ তাপ অন্যত্র শীতল স্থল হইতে শীতলতর স্থলে নামিয়া যায়।

ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাপ ক্রমেই উষ্ণ হইতে শীতল দ্রব্যে চলিতেছে; ক্রমেই তাপের কার্য্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে; যাহা ছিল গরম, তাহা শীতল হইতেছে; যাহা ছিল শীতল, তাহাও গরম হয়ত হইতেছে। কিন্তু ভবিতব্য অবশ্যম্ভাবী; শেষ পর্য্যন্ত জগতে বর্ত্তমান সমস্ত তাপ একাকার উষ্ণতা প্রাপ্ত হইবে। জগতের এখানটা গরম, ওখানটা ঠাণ্ডা, এরূপ শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে না; সর্ব্বত্রই সমান গরম বা সমান শীতল হইয়া যাইবে। তখন তাপ থাকিবে বটে, কিন্তু সেই তাপকে কেহ কাজে লাগাইতে পারিবে না; সেই তাপ হইতে কোন কাজ উৎপাদন করিবার কোন উপায় থাকিবে না। জগদ্যন্ত্র তখন নিশ্চল হইবে; বিশ্ব-ঘটিকার পেণ্ডুলম তখন স্পন্দহীন হইবে; চাকাগুলি আর নড়িবে না; কাঁটাগুলি থামিয়া যাইবে। সেই দিন বিজ্ঞানমতে জগতের মহাপ্রলয়। সেই মহাপ্রলয় নিবারণে মনুষ্যের কোন ক্ষমতা নাই। তবে তাপের অপচয় যথাসাধ্য নিবারণ করিয়া শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন যৎকিঞ্চিৎ বিলম্বিত

করিবার ক্ষমতা মানুষের হস্তে কিয়ৎপরিমাণে আছে বটে। কিন্তু মানুষ কি সেই অপচয়ের নিবারণে চেষ্টা করে? এ-কালের উন্নত স্পর্দ্ধিত বিজ্ঞানবিদ্যা এই তাপের অপচয় প্রতিবিধান করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছে কি? বরং তাহার বিপরীত কাণ্ডই দেখা যাইতেছে। প্রকৃতিদেবী কতকটা যেন দয়াবশ হইয়া যে মৃদঙ্গাররাশি ও কেরোসিন তৈলের রাশি অপরিণামদর্শী মনুষ্যের চক্ষুর অন্তরালে ভূগর্ভমধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ মনুষ্য তাহার সন্ধান পাইয়া সেই যুগান্তসঞ্চিত সম্পত্তি তুলিয়া অনিতেছে ও আপনার তাৎকালিক সুবিধার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে পঞ্চিত করিয়া তাহাকে পোড়াইয়া শীতল বায়ুতে পরিণত করিতেছে। পৃথিবী যুড়িয়া কলকারখানার এঞ্জিনে এই নৈসর্গিক শক্তিসমষ্টি মুহূর্ত্তে অপচিত হইয়া যাইতেছে; তজ্জন্য কেহ পরিতাপ করে না, কেহ আক্ষেপও করে না। কেবল দুই-এক জন বৈজ্ঞানিক তাপের এই অপচয় দেখিয়া বিহ্বল হন ও সেই সঙ্গে জগতের পরিণাম ভাবিয়া আতঙ্কিত হন।

এত ক্ষণে বোধ হয় হেঁয়ালি ভাঙিল; আঁধারে আলো জ্বালিয়া প্রকৃতিদেবীকে ফাঁকি দিতে গিয়া আমরা নিজেই ফাঁকি পড়িতেছি, এই হেঁয়ালির তাৎপর্য্য পাওয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার দূর করিতে আমরা চাই কিঞ্চিৎ আলোক, যৎকিঞ্চিৎ শক্তি। আকাশ বা ঈথরমধ্যে কিয়ৎকাল ধরিয়া গোটাকতক কম্পনতরঙ্গ উৎপাদন করিলেই আমাদের কাজ চলে। কিন্তু তজ্জন্য আমরা তেল পোড়াইয়া, বাতি পোড়াইয়া, গ্যাস পোড়াইয়া, দস্তা পোড়াইয়া, সহস্রগুণ পরিমাণ শক্তিকে অপচয় করিয়া তাহার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিয়া ফেলি। চাই আমরা একখানা হাত-পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করিতে, আমাদের উদ্ভাবিত উপায় একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলে। শক্তির এই অপচয় দেখিলে বুদ্ধিমান্ লোকে ব্যথা পায়, দূরদর্শী লোকে ব্যাকুল হয়। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর। আচমনে এক গণ্ডূষ জল আবশ্যক; আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি, এবং তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি। বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আমরা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রহসন; কিন্তু এই প্রহসনের পরিণাম যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে হাস্যরসের অপেক্ষা করুণরসের সঞ্চার হওয়াই উচিত।

ভরসা করি, এখনও কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-জাতিকে সমস্ত কলকারখানা, এঞ্জিন বন্ধ করিতে উপদেশ দিবেন; রাত্রিতে অন্ধকারে কারবার করিতে বলিবেন, এবং পাকশালার উনানগুলির অপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া মনুষ্য-জাতিকে সত্যযুগোচিত আমান্ন ভোজনে প্রবৃত্তি দিবেন। এইরূপ করিলে অন্ততঃ শেষের সে দিন কিছু কাল বিলম্বিত হইতে পারিবে।

বিলম্বিত হইতে পারিবে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। প্রকৃতি সর্ব্বদা বিলাসী ধনিসন্তানের মত সঞ্চিত শক্তি-সম্পত্তি দুই হাতে অজস্র অপব্যয় ও অপচয় করিতেছেন, তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখা যায় না। প্রকৃতিকে এই অপব্যয়ে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিবে, এমন লোক কোথায়? মনুষ্যের পক্ষে ইহার প্রতিবিধান আপাততঃ অসাধ্য।

মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মাক্সওয়েলের কল্পিত ভূতের অসাধ্য নহে। যদি আমরা কোনরূপে সেই উপদেবতাটিকে কোনরূপে বশীভূত করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বযন্ত্রটা আরও কিছুদিন টিকিলেও পারে; এমন কি, ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতাও হয়ত তাঁহার নির্ম্মিত বিশ্বযন্ত্রটিকে অকালে অচল হইতে দেখার ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

সেই ভূতের কাজ কি? জগতের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, খানিকটা গরম জল ও খানিকটা ঠাণ্ডা জল একত্র মিশাইলে দুই সমান গরম হইয়া পড়ে; গরম জলটা একটু ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা জলটা একটু গরম হয়। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। জগৎটাকে ভবিষ্যৎ মহাপ্রলয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে ঠিক ইহার বিপরীত কার্য্যের দরকার। খানিকটা না-গরম, না-ঠাণ্ডা, নাতিশীতোষ্ণ' জল একটা পাত্রে রাখিলাম; একটু পরে গিয়া যেন দেখিতে পাই যে, পাত্রের অর্দ্ধেক জল ফুটিতেছে; বাকী অর্দ্ধেক বরফ হইয়া রহিয়াছে। তাপ আপনা হইতে সরিয়া গিয়া জলের একাংশ হইতে অন্য অংশে গিয়াছে। এইরূপ ঘটনা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অসম্ভব—এই ব্যাপারটা সাধ্যে পরিণত করিতে হইবে। মাক্সওয়েল নিজে ইহা পরিতেন না; কিন্তু তাঁহার কল্পিত ভূতে ইহা পারে; কিরূপে পারে, বলিতেছি।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। মনে কর, দুইটা ঠিক সমান আয়তনের কুঠরির মাঝে একটা দেওয়ালের ব্যবধান আছে ও সেই দেওয়ালে একটা ক্ষুদ্র জানালা আছে। জানালাটা অতি ছোট; এত ছোট যে, বিনা আয়াসে কেবল ইচ্ছামাত্রে খোলা যায় বা বন্ধ করা যায়। কুঠরি দুইটার অন্য কোথাও জানালা দরজা বা কোন ফাঁক পর্য্যন্ত নাই। একটা কুঠরিতে বাতাস পুরিয়া রাখিয়াছি; আর একটা কুঠরিতে বায়ু পর্য্যন্ত নাই; উহা একেবারে শূন্য। প্রথম কুঠরিতে যে বায়ুটা আছে, মনে কর—তাহা বৈশাখ মাসের বায়ুর মত তপ্ত বায়ু। এখন মাঝের দেওয়ালের জানলা খুলিয়া দিবা মাত্র খানিকটা হাওয়া এ-কুঠরি হইতে ও-কুঠরিতে যাইবে। কিছু ক্ষণ পরে দেখিবে, উভয় কুঠরি বায়ুপূর্ণ হইয়াছে। যে বায়ু একটা ঘরে আবদ্ধ ছিল, তাহা এখন দুইটা ঘর অধিকার করায় তাহার চাপ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু উষ্ণতার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্ব্বে একটা ঘরে বায়ু যেমন গরম ছিল, এখন সেই বায়ু দুই ঘরে আসিয়াও তেমনই গরমই রহিয়াছে। এইরূপে এক ঘরের বায়ু অন্য শূন্য ঘরে চালাইয়া দিলে তাহার উষ্ণতার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। জগদ্বিখ্যাত জূল সাহেব তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম;

বায়ুর উষ্ণতার কারণ কি? বায়ুর অণুগুলি অনবরত এ-দিকে ও-দিকে ছুটাছুটি করে। যাহার গায়ে লাগে, তাহাকেই ধাক্কা দেয়; যত জোরে ধাক্কা দেয়, ততই বায়ু গরম বোধ হয়। একটা ছোটখাট কুঠরিতে কত কোটি কোটি বায়ুর অণু আছে। প্রত্যেক অণুই ইতস্ততঃ বেগে ছুটিতেছে; সে বেগই বা আবার কি ভয়ঙ্কর! যে বায়ুতে আমাদের গৃহ পূর্ণ, তাহার অণুগুলির বেগ প্রতি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল। রেলের গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল হিসাবে চলে; আর এই বায়ুকণিকাগুলি মিনিটে প্রায় কুড়ি মাইল, অর্থাৎ ঘণ্টায় প্রায় বার-শ মাইল বেগে ছুটাছুটি করে। আবার

বায়ুর উষ্ণতা যত বাড়ে, এই অণুগুলির বেগও ততই বাড়ে।

মনে করিও না যে, সকল অণু ঠিক একই বেগে চলে। উপরে যে মিনিটে বিশ মাইল বেগের কথা বলিলাম, তাহা এক গড় হিসাবে। কোন অণু হয়ত বিশ মাইলের অনেক অধিক বেগে ছুটিতেছে, কোনটা হয়ত বিশ মাইলের অনেক কম বেগে ছুটিতেছে। তবে সকলের বেগ গড়ে বিশ মাইল। উষ্ণতাবৃদ্ধি সহকারে বেগের এই গড়টা বাড়িয়া যায় ও উষ্ণতা কমিলে গড়টা কমিয়া যায় মাত্র।

এখন মনে কর, এই বায়ু একটা কুঠরিতে আবদ্ধ আছে; তাহার কোটি কোটি অণু গড়ে বিশ মাইল হিসাবে প্রতি মিনিটে এদিক্-ওদিক্ ছুটিতেছে, কুঠরির দেওয়ালে ধাক্কা দিতেছে ও ধাক্কা পাইয়া আবার অন্য মুখে ছুটিতেছে। বেগ গড়ে বিশ মাইল; কাহারও বা বিশ মাইলের বেশী, কাহারও বিশ মাইলের কম,—গড়ে বিশ মাইল। এখন মনে কর, সেই ভূতটি সেই জানালার কাছে বসিয়া আছেন এবং ইচ্ছামত জানালা খুলিতেছেন বা বন্ধ করিতেছেন। তাঁহার দেহখানি অতি সূক্ষ্ম; দেবযোনি কি না! তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয়ও তদ্রূপ সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তিবিশিষ্ট। আমাদের কি সাধ্য যে, বায়ুর অণু পরমাণু লইয়া কারবার করি! কিন্তু সেই সূক্ষ্মদেহ উপদেবতা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেক অণুর গতায়াত পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণুকে তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিতে পারেন এখন মনে কর, তিনি জানালার পাশে বসিয়া নিবিষ্টমনে বায়ুর অণুগুলির গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেছেন; যে অণু বিশ মাইলের অধিক বেগে জানালায় আসিয়া পৌছিতেছে, তাহাকে সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া পাশের কুঠরিতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন; আর যে অণুটা মন্দ গতিতে অর্থাৎ বিশ মাইলের কম বেগে আসিতেছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ "প্রবেশ নিষেধ" বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কি দেখিবে? পাশের ঘরে ক্রমাগত দ্রুতগামী অণুগুলি জমিতে থাকিবে; তাহাদের সকলেরই বেগ বিশ মাইলের অধিক: কাজেই তাহাদের গড়ে বেগ বিশ মাইলের অধিক হইবে। আর অন্য গৃহে দ্রুতগামী অণুর সংখ্যা ক্রমেই কমিবে ও মন্দগতি অণুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িবে; সেখানে অণুগুলির গড় বেগ ক্রমেই কমিয়া যাইবে। আবার বেগের বৃদ্ধির ফল বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি; আর বেগের হ্রাসের ফল বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস। কাজেই কিছু ক্ষণ পরে দেখিবে, একটি কুঠরির বায়ু ক্রমেই শীতল হইতেছে ও অন্য কুঠরি ক্রমেই উষ্ণতর বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। দুটি ঘরের বায়ুর উষ্ণতা এইরূপে ভিন্ন হইয়া গেল, অথচ সেই দৈত্য মহাশয়কে এক কণিকা শক্তি খরচ করিতে হইল না; কেন না, তাঁহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির সঞ্চালনে ক্ষুদ্র গবাক্ষের ক্ষুদ্র কপাটখানির নাড়াচাড়ায় শক্তি ব্যয়ের অপেক্ষাই রাখে না, তাঁহার দেহখানি যেমন ইচ্ছা সূক্ষ্ম মনে করিতে পার। যে কপাটখানি তিনি নাড়িতেছেন, তাহাও যত ইচ্ছা হালকা মনে করিতে পার। অত হালকা কপাট খুলিতে বা বন্ধ করিতে আর শক্তি খরচ কোথায়? কিন্তু ফলে হইল কি? ছিল একটা কুঠরিতে সর্ব্বত্র সমান গরম খানিকটা হাওয়া; এখন পাওয়া গেল দুইটা কুঠরির একটায় গরম হাওয়া, আর একটায় ঠাণ্ডা হাওয়া। এখন তুমি স্বচ্ছন্দে একটা ছোট্ট এঞ্জিন-যোগে উষ্ণ বায়ুর তাপকে শীতল বায়ুতে চলিতে

দিয়া সেই তাপের কিয়দংশ কাজে লাগাইতে পার। আমাদের যাহা অসাধ্য, ঐ ভূতের তাহা সাধ্য। তিনি মনে করিলে যে-কোন দ্রব্যের দ্রুতগামী অণুগুলিকে এক ধারে ও মন্দগামী অণুগুলিকে অন্য ধারে গোছাইয়া রাখিয়া এক ধার তপ্ত ও অন্য ধার ঠাণ্ডা করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে শক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া জগদ্‌যন্ত্রের বর্ত্তমান ব্যবস্থাটাই বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু যথেচ্ছ পরিমাণে বাড়াইয়া দিতে পারেন।

এই দেবতাটি ক্লার্ক মাক্সওয়েলের মানস-পুত্র। ব্রহ্মার মানস-পুত্র হইতে জগতে অনেক সময় অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিকের মানস-পুত্র, ব্রহ্মা আমাদের যে উপকারটুকু করেন নাই, তাহা সম্পাদনে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই দেব-যোনিটির সহিত সাক্ষাৎকারের ও তাঁহার বশীকরণের উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই; আবিষ্কারের সম্ভাবনাও দেখা যায় না। অতএব আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া গেলাম।

বিশ্ব-জগতের কোন-না-কোনখানে এইরূপ দেবযোনিগণ বসিয়া অণুগুলিকে লইয়া বাছাই করিতেছেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কাজেই জগদ্‌যন্ত্রের কাঁটা হয়ত এক দিন অচল হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা রহিয়া গেল। তবে সমস্ত বাতি নিবাইয়া, উনান নিবাইয়া আমরা সেই দিন কতকটা বিলম্বিত করিতে পারি। তাহা করিব কি?

ফলিত জ্যোতিষ

পুরাতন কথার পুনরুক্তি সকল সময়ে প্রীতিকর হয় না; অথচ পুনঃ পুনঃ না বলিলেও সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিব কি না, এই একটা পুরাতন কথা। উভয় পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার ছিল, তাহা বহু কাল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; আর নূতন কিছু বলিবার আছে, তাহা বোধ হয় না। অথচ এক পক্ষ হঠাৎ এমন বেগে অপর পক্ষকে আক্রমণ করেন যে, তখন তাড়াতাড়ি পুরাতন মরিচা-ধরা অস্ত্রগুলি বাহির করিয়া কোনরূপে শাণ দিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতে হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহার মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হইল না; অথচ আমার বোধ হয়, এক কথায় ইহার মীমাংসা হওয়া উচিত। একটা উত্তর দিলেই যেন গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে।

উত্তরটা এই। মহাশয় ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন; মহাশয় যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে আপনার তৃপ্তি হইয়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই প্রমাণগুলি আমার নিকট উপস্থিত করুন; আমার তৃপ্তি জন্মে, বিশ্বাস করিব, নতুবা করিব না। আপনার সংগৃহীত প্রমাণে যদি আমার তৃপ্তি না জন্মে, তজ্জন্য আমাকে নির্ব্বোধ বা ভাগ্যহীন মনে করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া গালি দিবেন না। কেন না, এই শেষোক্ত অধিকার আপনারও যেমন আছে, আমারও তেমনই আছে। পাল্টা

গালি দিতে আমাকে বাধ্য করিবেন না।

এ-কালে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করেন, তাঁহাদের একটা ভয়ানক দুর্নাম আছে যে, তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা এ জন্য যথেষ্ট তিরস্কারের ভাগী হইয়া থাকেন। সম্যক্ প্রমাণ পাইয়া তাঁহারা যদি তৃপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গালি দিলে বিশেষ পরিতাপের হেতু ঘটিত না; কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহারা গালি দিবার সময়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করেন, প্রমাণ উপস্থিত করিবার সময় তাঁহাদিগকে একেবারে নিশ্চেষ্ট দেখা যায়; এবং যখনই তাঁহাদিগকে প্রমাণ আনিতে বলা যায়, তখনই তাঁহারা প্রমাণের বদলে তত্ত্বকথা ও নীতিকথা শোনাইতে প্রবৃত্ত হন;

তাঁহারা তর্ক করিতে বসিবেন, রামচন্দ্র খাঁয়ের পুত্রের জন্মকালে বুধ গ্রহ যখন কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিয়াছে, তখন সেই পুত্র ভাবী কালে ফিলিপাইনপুঞ্জের রাজা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি? ইহা অসম্ভব কিরূপে? বিশেষতঃ যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইয়া মাত্র পাখী সব রব করিতে থাকে, কাননে কুসুম-কলি ফুটিয়া উঠে, এবং গোপাল গরুর পাল লইয়া মাঠে যায়। আমরা বৎসর বৎসর দেখিয়া আসিতেছি যে, সূর্য্যদেব বিষুবসংক্রমণ করিবা মাত্র দিনরাত্রি অমনই সমান হইয়া যায়; তখন শনি-শুক্র-সঙ্গম ঘটিলে সাইবীরিয়াতে ভূমিকম্প ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? আবার চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, ইহা যখন কবি কালিদাস হইতে বৈজ্ঞানিক কেল্‌বিন পর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতেছেন, তখন সেই চন্দ্র বৃহস্পতির সমীপস্থ হইলে লুই নেপোলিয়নের দৌহিত্রের শিরঃপীড়া কেন না ঘটিবে? একটা যদি সম্ভব হয়, আর একটা অসম্ভব কিসে হইল? বিশেষতঃ মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন বলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কত কি আছে, যাহা মানবের জ্ঞানাতীত!

বাস্তবিকই স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন কত বিষয় আছে, যাহা মানবের পক্ষে স্বপ্নাতীত। বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচকগণ যে তাহা না জানেন, এমনও নয়। স্বর্গ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে কেন, এই মর্ত্ত্যেই দেখ, প্রীষ্টলি ক্যাবেণ্ডিশ লাবোয়াশিয়ার পর হইতে এক শত বৎসর কাল আমরা রসায়ন-গ্রন্থে মুখস্থ করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমাদের অন্তরিক্ষে গোটা-পাঁচেকের বেশী বায়ু নাই। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এই কয় বৎসরের মধ্যে সেই চিরপরিচিত অন্তরিক্ষমধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অশ্রুতচর কত নূতন বায়ুর অস্তিত্ব বাহির হইতে চলিল, এবং পৃথিবীর যাবতীয় রসায়ন-গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করার প্রয়োজন হইয়া উঠিল; কয়েক বৎসর আগে ইহা কে ভাবিয়াছিল? বিধাতা অত্যন্ত যত্নের সহিত মনুষ্যের বীভৎস অস্থি-কঙ্কালকে মোলায়েম মসৃণ ত্বকের আবরণের ভিতর সঙ্গোপনে রাখিয়া পেলীর ও তাঁহার শিষ্যগণের নিকট দূরদর্শিতার ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধির জন্য কত বাহবা পাইয়া আসিতেছিলেন, সহসা ক্রুক্‌স্ টিউবের ভিতর হইতে নূতন ধরণের রশ্মি বাহিরে আসিয়া সেই কঙ্কালকে প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাই বা কে জানিত!

সুতরাং এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীরই সকল সংবাদ যখন অদ্যাপি জ্ঞানগোচর হইল না,

পরন্তু নিত্য নূতন ঘটনা মনুষ্যের বিজ্ঞান-বিদ্যাকে এক-একটা ধাক্কা দিয়া বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে, তখন এত বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় কি সম্ভব, কি অসম্ভব, তাহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তোমাদের বিজ্ঞানেই না কি বলে যে, ঐ সূর্য্যটার আয়তন বার লক্ষ পৃথিবীর সমান; ঐ নক্ষত্রটা হইতে আলো আসিতে বার বৎসর পনর দিন অতিবাহিত হয়, সেই আলো আবার সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে ইত্যাদি। ইতরের পক্ষে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কঠিন। এত বড় ব্রহ্মাণ্ডটার সম্বন্ধে এটা সম্ভব, ওটা অসম্ভব, এরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বালকের পক্ষেই শোভা পায়, বিজ্ঞানবাদীদের পক্ষে নহে।

অহো, সকলই যথার্থ; তথাপি বৈজ্ঞানিক আপনার জেদ ছাড়িবে না। সে বলিবে, সবই যথার্থ—জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। উল্কাবর্ষণে রাষ্ট্রবিপ্লব, যোগবলে আকাশ-বিহার ও মন্ত্রবলে পিশাচসিদ্ধি, কিছুই অসম্ভব নহে। অমুক ঘটনাটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের প্রতিকূল, অমুক ঘটনাটা শক্তির নিয়মের প্রতিকূল, ইত্যাদি বলিয়া তাহার অসম্ভাব্যতা সপ্রমাণ করিতে বসা ঠিক নহে। এমন কি, সেকালের বীরেরা দেবতার সহিত কারবার করিতেন এবং এ-কালের বীরেরা উপদেবতার সহিত কারবার করেন, ইহাতেও অসম্ভব বলিয়া উপহাসের কথা কিছুই নাই। আমার বোধ হয় না, এ-কালের কোন বৈজ্ঞানিকের এরূপ দুঃসাহস আছে যে, তিনি যুক্তিবলে ঐ সকল ঘটনার অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন।

বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকের উপর এমন অনেক উক্তি সর্ব্বদা আরোপিত হয়, যাহা তিনি কখনই করেন নাই। লোকে বলে, বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক নিয়মের অব্যভিচারিতায় নিতান্ত বিশ্বাসী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম বা লঙ্ঘন হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। এ পর্য্যন্ত আমি একখানি খাঁটী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ দেখি নাই, যাহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলে ভূমিতে পড়িতে বাধ্য, অথবা সূর্য্যদেব পৃথিবীকে চতুঃপার্শ্বে ঘুরাইতে বাধ্য। বস্তুতঃ জগতের এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এ পর্য্যন্ত কাঁঠাল ফল বৃন্তচ্যুত হইলেই ভূমিতে পড়িয়া আসিতেছে, কাহারও ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই; তাই পদার্থবিদ্যাবিদেরা বলেন, কাঁঠাল ফলের ঐরূপ স্বভাব, সে ভূমিতেই পড়ে, আকাশে উঠে না; এতকাল তাহাই করিতেছে, সম্ভবতঃ কাল পরশুও সেইরূপই করিবে। কিন্তু কাল হইতে যদি কাঁঠাল ফল আর ভূমিতে পতন অনুচিত ভাবিয়া আকাশে আরোহণই কর্তব্য বিবেচনা করে, সমস্ত বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী নিতান্ত নির্ব্বিকারচিত্তে আপন আপন খাতার মধ্যে তখন লিখিতে থাকিবেন, কাঁঠাল ফলের স্বভাবের অমুক দিন হইতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—অমুক তারিখ পর্য্যন্ত সে ভূমিতে পড়িত, এখন সে আকাশে উঠে। এবং কাঁঠালের দেখাদেখি সকল দ্রব্যই যদি সেই পন্থা অবলম্বন করে, তাহা হইলে পদার্থবিদ্যাগ্রন্থগুলি ভবিষ্যৎ সংস্করণে দেখা যাইবে, পৃথিবী এখন আর আকর্ষণ করেন না, দূরে ঠেলেন। প্রকৃতির নিয়মটা যদি বদলাইয়া যায়, কেন বদলাইল, তাহা প্রকৃতিদেবীই বলিতে পারেন; বৈজ্ঞানিকের তজ্জন্য মাথাব্যথার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং প্রকৃতির নিকট তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবারও

উপায় নাই।

ফলতঃ আম কাঁঠালের ভূতলপাতে সর্ব্বসাধারণের প্রচুর স্বার্থ আছে, বিশেষতঃ ঐ ঐ দ্রব্য যখন সুপক্ক অবস্থায় থাকে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তাহাতে বিশেষ স্বার্থ কিছুই নাই। দলিলের ভিতর যাহাই থাকুক, রেজিষ্ট্রার বাবু তাহা রেজিষ্টারি করিয়া যান, দাতা ও গৃহীতার অভিসন্ধি জানা তাঁহার আবশ্যক হয় না; বৈজ্ঞানিক সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা-গুলিকে কেবল রেজিষ্টারি করিয়া যান; ঘটনাটা এমন কেন হইল, তাহা ভাবিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয় না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানবিদের নাম শুনি নাই, যিনি কোন প্রাকৃতিক ঘটনার মূল কারণ অনুসন্ধানে সমর্থ হইয়াছেন। বা তজ্জন্য বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন দেখিয়াছেন।

তবে কোন একটা ঘটনার খবর পাইলে সেই খবরটা প্রকৃত কি না এবং ঘটনাটা প্রকৃত কি না, তাহা রেজিষ্টারির পূর্ব্বে জানিবার অধিকার বিজ্ঞানবিদের প্রচুর পরিমানে আছে। এই অনুসন্ধান-কার্য্যই বোধ করি তাঁহার প্রধান কার্য্য। প্রকৃত তথ্যের নির্ণয়ের জন্য তাঁহাকে প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। বরং তজ্জন্য তাঁহার বুদ্ধি নানা সংশয়ের উদ্ভাবন ও সেই সংশয় অপনোদনের বিবিধ উপায় আবিষ্কার করে। আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকের সহিত বিজ্ঞানবিদের এইখানে পার্থক্য। আমরা যত সহজে কোন একটা ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ফেলি, তিনি তত সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না; নানারূপ প্রমাণ অনুসন্ধান করেন। আমরা ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস নিতান্ত অসামাজিক কাজ ও অনুচিত কাজ মনে করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের এই সামাজিকতা-বোধ অতি অল্প। তিনি অতি সহজে অত্যন্ত ভদ্র ও সুশীল ব্যক্তিকেও বলিয়া বসেন, তোমার কথায় আমি বিশ্বাস করিলাম না। এইটাই বিজ্ঞানবিদের ভয়ানক দোষ: তবে তাঁহার এই সংশয়পরতা কেবল অন্যের প্রতিই নহে; তাঁহার নিজের উপরেও তাঁহার বিশ্বাস অল্প। তিনি আপনার ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করেন না ও আপনার বুদ্ধিকেও বিশ্বাস করেন না। কোথায় কোন্ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া ফেলিবে, কখন্ কবে পূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও একটা স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিবেন, এই ভয়েই তিনি সর্ব্বদা আকুল। তাঁহার যখন নিজের প্রতি এইরূপ সংশয়, তখন তাঁহার পরের প্রতি অবিশ্বাস ক্ষমাযোগ্য।

প্রমাণ সংগ্রহ যে সকল সময়েই অত্যন্ত কঠিন, এমন নহে। এমন অনেক নূতন ঘটনা সর্ব্বদা আবিষ্কৃত হয়, যাহাতে প্রমাণ খুঁজিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। মনে কর, সে দিন যে একটা নূতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইল যে, এমন এক রকম আলো আছে, যাহার সাহায্যে বাক্সর ভিতর টাকা রাখিলেও ধরা পড়ে, মানুষের অস্থি-কঙ্কালে হাড় কয়খানা, তাহা দেখান চলে। এই ব্যাপার সত্য কি না, তাহার প্রমাণ পাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটা কাচের গোলার ভিতর হইতে বায়ু নিষ্কাশন করিয়া তন্মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গ পুনঃ পুনঃ চালাইতে থাক ও একখানা কাগজে একটা প্রলেপ মাখাইয়া আঁধার ঘরে সেই কাগজখানা ঐ গোলার সম্মুখে ধর; উভয়ের মাঝে ধরিলেই সেই প্রলেপের উপর বাক্সর ভিতরের টাকার ছায়া ও হাতের হাড়গুলার ছায়া দেখিতে পাইবে। পাঁচ মিনিটের পরিশ্রমেই ব্যাপারটা যে-কোন ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া

দেখিতে পারেন। এরূপ স্থলে ঘটনা সত্য কি না, প্রতিপন্ন করিতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি আমার কোন বন্ধু আসিয়া বলেন, কাল রাত্রিতে চন্দ্রলোক হইতে একটা ভালুক আসিয়া আমার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া গিয়াছে ও সেই ভালুকের তিনটা চোখ ও লম্বা দাড়ি, তাহা হইলে আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কথাটা মিথ্যা বলিলে আমাকে বন্ধুর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, আর সত্য মনে করিয়া অন্যের নিকট গল্প করিতে গেলে অনুরূপ বিপদের আশঙ্কা রহিয়ে। অথচ ঘটনাটা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা কোন তার্কিকেই সাহস করিয়া বলিবেন না। এরূপ স্থলে বুদ্ধিমান্ লোক কি করিয়া থাকেন? বন্ধুর সত্যপরতায় তাঁহার সম্পূর্ণ আস্থা থাকিলেও তিনি 'বানরে সঙ্গীত গায়' ইত্যাদি প্রবচন স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঘটনাটা মিথ্যা কি সত্য, তাহা অপ্রতিপন্ন থাকিয়া যায়।

বস্তুতঃ ফলিত জ্যোতিষে যাঁহারা অবিশ্বাসী, তাঁহাদিগের সংশয়ের মূল এই। তাঁহারা যতটুকু প্রমাণ চান, ততটুকু তাঁহারা পান না। তার বদলে বিস্তর কুযুক্তি পান। চন্দ্রের আকর্ষণে জোয়ার হয়, অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে, ইত্যাদি যুক্তি কুযুক্তি। কালকার ঝড়ে আমার বাগানে কাঁঠালগাছ ভাঙিয়াছে, অতএব হরিচরণের কলেরা কেন না হইবে, এরূপ যুক্তির অবতারণায় বিশেষ লাভ নাই। গ্রহগুলা কি অকারণে এ-রাশি ও-রাশি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, যদি উহাদের গতিবিধির সহিত আমার শুভা-শুভের কোন সম্পর্কই না থাকিবে, এরূপ যুক্তিও কুযুক্তি। নেপোলিয়নের ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোষ্ঠী ছাপানার পরিশ্রমও অনাবশ্যক। একটা ঘটনা গণনার সহিত মিলিলেই দুন্দুভি বাজাইব, আর সহস্র গণনায় যাহা না মিলিবে, তাহা চাপিয়া যাইব অথবা গণক ঠাকুরের অজ্ঞতার দোহাই দিয়া উড়াইয়া দিব, এরূপ ব্যবসায়ও প্রশংসনীয় নহে।

জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। সূর্য্যও অকস্মাৎ ফাটিয়া দ্বিধা হইতে পারে; অগ্নির দাহিকা-শক্তিও নষ্ট হইতে পারে; মরা মানুষও সমাধি হইতে উঠিতে পাবে। আমারও অদ্য তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জুটিতে পারি; কিন্তু জুটিল কি না, তাহার প্রমাণ অন্যরূপ! অবিশ্বাসীরা যেরূপ প্রমাণ চাহেন, বিশ্বাসীরা সেরূপ প্রমাণ দেন না। বিশ্বাসীরা যে প্রমাণে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অবিশ্বাসীরা সে প্রমাণে তুষ্ট নহেন। এই আত্যন্তিক সংশয় জন্য বিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীদিগকে গালি দেন। বলেন, আমি যে প্রমাণে তৃপ্ত হইলাম, তুমি তাহাতে তৃপ্ত হইতেছ না কেন; আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি অন্ধ, আমি কি বধির ইত্যাদি। এ সকল যুক্তির উত্তর নাই। এ সকল যুক্তি বিফল হইলে তাঁহারা লাঠি বাহির করেন, তখন প্রাণভয়ে পশ্চাৎপদ হইতে হয়।

একটা সোজা কথা বলি। ফলতি জ্যোতিষকে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার পদে উন্নীত দেখিতে চাহেন, তাঁহারা এইরূপ করুন। প্রথমে তাঁহাদের প্রতিপাদ্য নিয়মটা খুলিয়া বলুন। মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের স্থিতি দেখিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ কোন্ নিয়মে গণনা হইতেছে, তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না।

তারপর হাজারখানেক শিশুর জন্মকাল ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়া প্রকাশ করিতে হইবে; এবং পূর্ব্বের প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে গণনা করিয়া তাহার ফলাফল স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শিশুর নাম-ধাম পরিচয় স্পষ্ট দেওয়া চাই, যেন যাহার ইচ্ছা, সে পরীক্ষা করিয়া জন্মকাল সম্বন্ধে সংশয় নাশ করিতে পারে। গণনার নিয়ম পূর্ব্ব হইতে বলা থাকিলে যে-কোন ব্যক্তি গণনা করিয়া কোষ্ঠীর বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিতে পারিবে। যত দূর জানি, এই গণনায় পাটীগণিতের অধিক বিদ্যা আবশ্যক হয় না। পূর্ব্বে প্রচারিত ফলাফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলাফল মিলিয়া গেলেই ঘোর অবিশ্বাসীও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসে বাধ্য হইবে; যতটুকু মিলিবে, ততটুকু বাধ্য হইবে। হাজারখানা কোষ্ঠীর মধ্যে যদি নয়-শ মিলিয়া যায়, মনে করিতে হইবে, ফলিত জ্যোতিষে অবশ্য কিছু আছে; যদি পঞ্চাশখানা মাত্র মেলে, মনে করিতে হইবে, তেমন কিছু নাই। হাজারের স্থানে যদি লক্ষটা মিলাইতে পার, আরও ভাল। বৈজ্ঞানিকেরা সহস্র পরীক্ষাগারে ও মানমন্দিরে যে রীতিতে ফলাফল গণনা ও প্রকাশ করিতেছেন, সেই রীতি আশ্রয় করিতে হইবে। কেবল নেপোলিয়নের ও বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠী বাহির করিলে অবিশ্বাসীর বিশ্বাস জন্মিবে না। চন্দ্রের আকর্ষণে গঙ্গার জোয়ার হয়, তবে রামকান্তের জজিয়তি কেন হইবে না, এরূপ যুক্তিও চলিবে না।

নিয়মের রাজত্ব

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞান সম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্ব-জগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাতেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত-হন ভাবাবেশে গদগদকণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহ বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় এই নিয়মের অব্যভি-চারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতি-প্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাকল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগ্‌যুদ্ধের পরিবর্ত্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীর ভাবে একটা সন্দর্ভ

লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্য্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পাড়ে, কেহই ঊর্দ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে কোন দ্রব্য ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে—লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে—লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্ত্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেন না, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশূট বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে;

তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে

কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ!

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম:—

ধারা। —কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে,

তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয় উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি!

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকার্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্ত্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন,—দেখিলে প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্দ্ধগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না, পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত বৎসরের অধিক হইল, একজন লোক পৃথিবীকে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল-ফলেই ও আতা ফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা জানিয়াও

জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার্ আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন, দূরস্থ চন্দ্রদেব পর্য্যন্ত পৃথিবী-মুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাঁহার পার্ষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবী মুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলেই সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন; স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই; সকলেই সকলের দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এত দূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্য্যের অভিমুখে চলিতে থাকুন। চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী-মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এত দূরে আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরুভার, তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর; তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশালকায় লইয়া বহু দূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্য্যদেব বর্ত্তমান; তুমি তাঁহার অভিমুখে এই নির্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক্ দিয়াও একটু ঘুরিয়া চলিতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখণ্ডের মালা পরিয়া গর্ব্ব করিও না; এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহু দূরে থাকিয়া এত কাল লুকাইয়াছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম;—একটা কঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দিষ্ট বিধানে নির্দিষ্ট পথে চলিতেছে। খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌরজগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌরজগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক যোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক যোড়া বা পৃথিবী সূর্য্য আর এক যোড়া, কতকটা তেমনই। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌরজগতের বাহিরেও এই আইন বলবৎ। কিন্তু সর্ব্বত্র বলবৎ কি না, বলা যায় না। কেন না, সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এত দূরে আছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষ গোচরও হয় না।

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহু দূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে, কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই আইন মানিতেছে না, তাহা হইলে কি হইবে? যদি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌরজগতের মধ্যে যে কোন নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল, বিশ্ব-জগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে: তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্ব-জগতের এই প্রদেশের এই নিয়ম; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশের এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়মের ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন,—জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন-না কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম; যতদিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম—এই নিয়ম অনিবার্য্য, ইহার ব্যভিচার নাই। যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যবস্থা! তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম! বলিলাম— অহো, এত দিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর ঐ স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম;— যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ, এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম:—এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কি না, নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্ত্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা ভাল হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে: এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবার কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে। নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তরমুখে থাকে না; একটু হেলিয়া থাকে। আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লণ্ডন শহরে ততটা হেলিয়া নাই. না থাকিবারই কথা, উহাই

ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; দুই শত বৎসর বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে; উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম। প্রতি এগার বৎসরে একবার উহার এইরূপ নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিম্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উদীচী উষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত, ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়। যত ক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, তত ক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিলে সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ-পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে—আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না; চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক সোজা পথে না গিয়া আশে-পাশে কিছু দূর পর্য্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মিও সূক্ষ্ম ছিদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এ স্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, তাহাই নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে-কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্দ্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পুরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একযোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। যাহা ঘটে,

তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি, ঐখানে ঐ ব্যভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়া থাকে। বহু কাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে, কাষ্ঠরূপী ইন্ধনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্ধনযোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনা'র পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্ক নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্প দিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে; যতক্ষণ কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ-সীমায় না আইসে, ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি, কোন্ নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে। বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্য্যগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মাণ্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দ গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদযন্ত্র চলিতেছে মনে করিয়া এক জন সৃষ্টিছাড়া, নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু না-কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎ-ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনা-পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে চুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কিরূপে, ইহা একটা সমস্যা। বড় বড় পণ্ডিতে এই সমস্যা মীমাংসা করিতে গিয়া হারি মানিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে মাত্র, মীমাংসার কোন চেষ্টা হইবে না। বহু মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। ইংরেজীতে যাহাকে ইউটিলিটি বলে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহাই দেখিয়া চলে। ইউটিলিটির বাঙ্গালা অর্থ হিতকারিতা উপকারিতা, উপযোগিতা, কাজে লাগা। যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবন-সংগ্রামে অনুকূল, কোন না-কোনরূপে জীবন-সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, জীব কালক্রমে তাহাই অর্জ্জন করে। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয় দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুইখানা অস্ত্রনির্ম্মাণের ও অস্ত্রপ্রয়োগের উপযোগী, মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবন রক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। অতএব প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এ সকল ধর্ম্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের গায়ের জোর অল্প, কাজেই বুদ্ধির-জোরে সেটা পোষাইয়া লয়; কাজেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। মানুষের গায়ের জোর অল্প, কাজেই তাহাকে দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; দলের অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। কাজেই মানুষের সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্ম-সংবরণ করিতে হয়; বর্ত্তমান কামনা, বর্ত্তমান লালসা, বর্ত্তমান প্রবৃত্তি দমনে রাখিতে হয়; এই জন্য মনুষ্যমধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্ভব। ইহাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাজ। কেন না, যাহা কিছু জীবনরক্ষার সাহায্য করে, তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় সাহায্য না করিলেও জাতিগত জীবনরক্ষায় বা বংশরক্ষায় সাহায্য করিতে পারে, অতএব বংশরক্ষার ও জাতিরক্ষার অনুকূল ধর্ম্মসকলও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেই অভিব্যক্তি হয়।

এইরূপে যাবতীয় মুখ্য মানব-ধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। এমন এক দিন ছিল—যখন মানুষ ষোল আনা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই; তখন নরে বানরে প্রায় অভিন্ন ছিল। কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বিবিধ মানব ধর্ম্ম অভিব্যক্ত হইয়া সে মানব পদবীতে উন্নত হইয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি মানব-ধর্ম্ম। মানব-ধর্ম্ম এই হিসাবে যে, মানবেতর জন্তু এই সৌন্দর্য্য বুদ্ধিতে হয়ত একেবারে বঞ্চিত। ইতর জীবের সৌন্দর্য্যবোধ আছে কি না, বলা কঠিন। ইংরেজীতে যাহাকে ফাইন আর্ট বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা হইতেছে, সেই ফাইন আর্টের যে সৌন্দর্য্য লইয়া কারবার, আমি সেই সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। ইংরেজীতে যাহাকে ইস্থেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিমবাবু যাহার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দর্য্যের কারবার। ইতর জীবের মধ্যেও একরকম সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা

আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ জীবধর্ম্ম; তাহাকে বিশিষ্ট মানব-ধর্ম্মের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। যেমন বিহগ গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায়; কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায়; ময়ূর কলাপশোভা বিস্তার করিয়া কেকা-রব সহকারে নাচিয়া নাচিয়া ময়ূরীর মন ভুলায়। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সাধারণ জীবধর্ম্মের অন্তর্গত। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, যৌন নির্ব্বাচনে ঐরূপ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। ময়ূরীর সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়াই ময়ূর সুন্দর হইয়াছে। মনুষ্যের মধ্যেও এইরূপ সৌন্দর্য্যের ও এইরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অসদ্ভাব নাই। নারীদেহের সৌন্দর্য্য এই যৌন নির্ব্বাচন হইতেই উৎপন্ন। চম্পক-অঙ্গুলির প্রতি ও খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের অকস্মাৎ অনুরাগ থাকায় নারী চম্পক-অঙ্গুলির ও খঞ্জন-নয়নের অধিকারিণী হইয়াছেন। ইহা বুঝা যায়: কিন্তু জবা শেফালিকা ছাড়িয়া কেন চম্পক-অঙ্গুলির প্রতি এবং পেঁচা হাড়গিলা ছাড়িয়া কেন খঞ্জন-নয়নের প্রতি অকস্মাৎ পুরুষের আকর্ষণ হইল, ইহা বুঝা যায় না। ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। মনুষ্য যেখানে সেখানে অহেতুক সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তুমি আমি যেখানে মুগ্ধ হইবার কোন হেতু দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ অকারণে সেইখানে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবিকুল এই জন্য বিজ্ঞসমাজে নিন্দিত। কালিদাস মারুতপূর্ণরন্ধ্র কীচক ধ্বনিতে অর্থাৎ বাঁশবনে বাতাসের ডাকে বনদেবতার গীতি শুনিতে পাইতেন; ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোকিলের কু কু শুনিয়া অশরীরী বাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন; এই শ্রেণীর অদ্ভুত আনন্দ বোধ করি, অপর সাধারণের হৃদ্গত হয় না। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির জীবনরক্ষায় কোন কার্য্যকারিতা আছে, তাহাও বোধ হয়, কেহ সপ্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বথা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচ রকমের বর্ণের বিন্যাস করিয়া অপরূপ রূপের সৃষ্টি করেন; কলাবৎ নানা রকমের স্বরবিন্যাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়া আনন্দের সৃষ্টি করেন; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথা হইতে কিরূপে কি উদ্দেশ্যে উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। এই সকল বস্তুর কোথায় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সকলে সমর্থ হয় না; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন। কেন তাঁহার এই মোহ, তাহা বুঝান যায় না। জীবন-সংগ্রামে এই মোহ কোনরূপ আনুকূল্য করে বলিতে গেলে মিথ্যা নির্দ্দেশ হইবে। কাজেই এই সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তি প্রাকৃতিক হেতু নির্দ্দেশ একরকম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনরূপ মন্ত্রের অন্যতর ঋষি আলফ্রেড রসেল ওয়ালাশ এই জন্য নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বুঝান যায় না। যৌন নির্ব্বাচনেও ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ যখন মানবত্বের একটা প্রধান লক্ষণ,—অনেকের মতে মানবত্বের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ,—

সৌন্দর্য্যবুদ্ধিবর্জ্জিত মনুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব দিতে পারা যায় না, তখন পূর্ণ মানবত্বই যে প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ফল, এ কথা স্বীকারে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন। মানবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য অন্য কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তির অতিরিক্ত কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি হয়ত মানবত্বের অভিব্যক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে, ওয়ালাশের চরম সিদ্ধান্ত এইরূপ।

ওয়ালাশের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্যান্য পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্য বুদ্ধির যখন জীবন-সংগ্রামে কোন কার্য্যকারিতাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি জন্মাইতে পারে, এই কথা স্পষ্টতঃ বলিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে এই সৌন্দর্য্য বুদ্ধির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দর্শাইবার জন্য তাঁহারা নানা চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল চেষ্টা ফলপ্রদ হয় নাই।

জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা কেহ কেহ বলেন, এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা একটা by product of evolution—জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। পাখীর সৌন্দর্য্য পাখীর ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় বিশেষ কোন কাজে লাগে না, ইহা স্বীকার্য্য। তাহার জাতিগত জীবনরক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও প্রামাণাভাব; সুতরাং এই সৌন্দর্য্যে পাখীর নিজের কোন লাভ নাই, তাহার বংশেরও কোন লাভ নাই। ময়ূরীর কাছে বাহবা পাইবার জন্য ময়ূরকে কলাপের দুর্ব্বহ বোঝা বাহিতে হয়। কিন্তু এই বোঝার প্রতি ময়ূরীর আকস্মিক অনুরাগ জীবনদ্বন্দ্বে ময়ূর বংশের রক্ষাবিষয়ে আনুকূল্য না করিয়া বরং প্রতিকূলতাই করে; ময়ূরকে এই বোঝা বহিয়া তার শত্রুর নিকটে আত্মরক্ষায় একান্ত অসমর্থ করে। তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে যখন শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটে, জীবনরক্ষায় অনুকূল বিবিধ ধর্ম্ম তাহাতে বিকাশ পায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও দুই একটা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, যাহার জীবনে কোন উপযোগিতা নাই; এই সকল আগন্তুক বা আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন জীবন রক্ষায় অনুকূল না হইতেও পারে। পক্ষিজাতির অভিব্যক্তি সহকারে তাহার নানাবিধ বিকার ঘটিয়াছে। অধিকাংশ বিকারই তাহার জীবন রক্ষার অনুকূল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোন অজ্ঞাত জৈবিক নিয়মবশে আর পাঁচ রকম বিকারও ঘটিয়া থাকিবে, যাহা জীবন রক্ষায় তেমন কার্য্যকরী না হইতেও পারে। ময়ূরের যে সৌন্দর্য্য লাভের কথা বলা যাইতেছে, তাহা এইরূপ আগন্তুক আনুষঙ্গিক বিকার মাত্র।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আগন্তুক আনুষঙ্গিক লাভ মাত্র; জীবনরক্ষার অনুকূল বিবিধ মানব-ধর্ম্মের বিকাশের সহকারে ঘটনাক্রমে এই বুদ্ধিটারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তাহার অন্য লাভ কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা আনন্দ লাভের উপায় ঘটিয়াছে মাত্র। সুখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের সুখলাভ ঘটে; তাহা বেশ বুঝা যায়; কেন না, এই সুখলাভ জীবনের অনুকূল; এই সুখের জন্যই মানুষ জীবনরক্ষায় যাহা উপাদেয়, তাহা গ্রহণ করে; অতএব এই সুখলাভশক্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। কিন্তু মদ খাইয়া তাহার নেশাতেও মানুষের একরকম তীব্র আনন্দলাভ ঘটে; এ আনন্দে মানুষের কোন লাভ নাই, বরং হানি আছে: এই

আনন্দলাভ-শক্তি জীবনরক্ষায় প্রতিকূল ; এবং মনুষ্য পদে পদে এই অহিত প্রবৃত্তির জন্য অনিষ্ট ভোগ করিতেছে। অথচ আর পাঁচটা হিত প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অহিত প্রবৃত্তিটাও মানুষের জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার উপায় নাই। মানুষের সৌন্দর্য্যানুরাগও এইরূপ একটা নেশা ; ইহার কোন উপকারিতা নাই ; বরং অন্য নেশার মত সময়ে সময়ে জীবনের অপকার করে। অন্যান্য নেশার মত এ নেশাটাও দৈবক্রমে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের আনুষঙ্গিক আগন্তুক ফল মাত্র। ইহার জন্য মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারের ভীষণ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যাহার ছেলেখেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, যে বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার অবকাশ নাই এবং প্রণয়িনীর বিরহবিধুর হইয়া চন্দ্রকিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রকৃতিদেবীর এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বদান্যতায় কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে একটু দ্বিধাবোধ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুক্কুটের মাথায় অনাবশ্যক শিখার মত, পুরুষ মানুষের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক দাড়ি গোপ গজাইয়াছে,—ডারুইন হয়ত বলিবেন, ইহার উদ্দেশ্য নারীজাতির মনোরঞ্জন,—তথাপি ইহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের জন্য নাপিতের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই অনর্থক সৌন্দর্য্য-নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে তবু ভাল যে, সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।

ফলে ইউটিলিটি লইয়া যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কারবার, এবং ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন সাহায্যে মনুষ্যে কবিত্বের স্ফূর্ত্তির বা সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তির হেতুনির্দ্দেশ পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পারে। তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অক্ষমতা স্বীকারের পূর্ব্বে একটু ভাবিবার আছে। জীবন রক্ষায় যে কিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করিয়া বলা কঠিন। এই বিষয়টাতে আমার কোন উপকার হয় নাই, কখনও উপকার হইতে পারে না, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিও মানব-জীবনে কোনরূপ আনুকূল্য করে না, ইহা বলাও দুঃসাহসের কাজ ; এবং যদি মানব-জীবনে ইহার কোনরূপ উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনই ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আনিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থেই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে সেই আলোচনার চেষ্টা হইয়াছে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একটা কথা থাকিয়া যায়। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য কেবল উপভোগের সামগ্রী—ইহার ফল বিশুদ্ধ নির্ম্মল আনন্দ। এই আনন্দ কোন কোন কাজে লাগে, জীবনযাত্রায় কাহারও কোন রকমে কোন হিত করিতে পারে, এরূপ কল্পনা করিতে গেলেও উহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়, উহা যেন মলিন হইয়া যায়। কোনরূপ লাভের, কোনরূপ হিতের সম্পর্ক আনিতে গেলে উহার শুদ্ধতা থাকে না। কোন প্রাকৃতিক কারণে এই আনন্দের উৎপত্তি নির্দ্দেশই বোধ হয় অসম্ভব।

মুক্তি

ডাক্তার জ্বরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনীন ব্যবস্থা করিলেন; বলিলেন, তোমার কুইনীন সেবন কর্ত্তব্য। এই সময়ে যদি কেহ গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, কুইনীন সেবন মানুষের কর্ত্তব্য নহে, পরোপকারই মনুষ্যের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, রোগীর কোন উপকার হয় না।

আজকাল গদ্যে পদ্যে বক্তৃতায় শব্দের অপপ্রয়োগ দ্বারা ঐরূপ বা তাহা অপেক্ষাও উৎকট যুক্তির প্রয়োগ হয়, কিন্তু তাহাতে হাস্যরসের উদ্ভব কেন হয় না, বুঝিতে পারা যায় না।

প্রাচীন কালে আমাদের বেদপন্থী সমাজে কতকগুলি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবাদি সম্পাদিত হইত; উহাদিগকে যাগযজ্ঞ বলিত ও উহাদের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম্ম। তদ্দেশে তৎকালে উহাদের উপযোগিতার বিচার বর্ত্তমান কালে দুষ্কর। এ-কালে আমরা ধর্ম্ম শব্দ ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি ও গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করি ও কাব্য লিখি—"যজ্ঞে ধর্ম্ম নহে ধর্ম্ম লোকহিতে।" আর যাঁহারা এইরূপ করেন, তাঁহাদের আস্ফালনই বা কত।

শব্দের অপপ্রয়োগের এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে মুক্তি শব্দটি নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টানদের স্বীকৃত salvation নামক একটা ব্যাপার আছে; আজকাল অনেকে উহার পর্য্যায়রূপে মুক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়া নানাবিধ উৎকট যুক্তির অবতারণা করেন।

মুক্তি শব্দের অর্থ বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য। কিন্তু এইখানেই বলিয়া রাখা উচিত, মুক্তি অর্থে আর যাহাই হউক, উহা খ্রীষ্টানি salvation নহে।

খ্রীষ্টানি salvation শব্দের অর্থ কি? খ্রীষ্টানি মতে মনুষ্য মাত্রই জন্মাবধি পাপী। মনুষ্য আপনার পাপের ফল ভোগ করিতে বাধ্য। মনুষ্যের শেষ দিনের বিচারকর্ত্তা পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য; নতুবা তাঁহার ন্যায়পরতা থাকে না। কিন্তু তিনি আবার করুণাময়। কাজেই তিনি করুণাবশে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইলেন, মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও মনুষ্যজাতির নিষ্ক্রয় স্বরূপে আপনাকে যজ্ঞীয় পশুরূপে কল্পনা করিয়া আপনাকে বলিরূপে অর্পণ করিয়া আপনার শোণিতপাত দ্বারা মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার শোণিতধারায় মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইল। যে তাঁহার শরণাগত হইয়া তৎপ্রবর্ত্তিত সঙ্ঘের আশ্রয় লইবে, তাঁহার রক্ত মাংস ভক্ষণ করিয়া তদাত্মতা প্রাপ্ত হইবে, বিচারের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া গৃহীত হইবে; তাহাকে আর পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না; সে তৎপরে চিরকাল ধরিয়া স্বর্গে বাস করিবে। মনুষ্যের এই পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তির ইংরেজী নাম salvation; বাঙ্গালায় উহাকে উদ্ধার বা পরিত্রাণ বলা যাইতে পারে। এইরূপে খ্রীষ্টানেরা ঈশ্বরের ন্যায়পরতার ও করুণাময়তার সমন্বয় স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্যের পাপমোচনের ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় ঈশ্বরের কৃপা; যে অনুতপ্তচিত্তে সেই কৃপার ভিখারী হইয়া সেই করুণানিধান

ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের শরণাগত হয়, সে-ই পরিত্রাণ পায়। এই ব্যাপারকে মুক্তি না বলিয়া পরিত্রাণ বলাই অধিক সঙ্গত। ঈশ্বরের অবতার খ্রীষ্ট এই হিসাবে মানবজাতির পরিত্রাণকর্তা।

খ্রীষ্টান-সমাজে এই পরিত্রাণের থিওরি কোথা হইতে আসিল, বলা দুষ্কর। অতি প্রাচীন ইহুদি-সমাজে এইরূপ পরিত্রাণ ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল কি না, সন্দেহের স্থল। ইহুদিরা আপনাদিগকে জেহোবাদেবের অনুগৃহীত জাতি বলিয়া জানিত। তাহারা প্রবল প্রতিবেশিগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত হইয়াছিল। জেহোবার (জাহবে নামক ইহুদিগণের কুলদেবতার) আদেশ লঙ্ঘনই তাহাদের এই নিগ্রহের হেতু বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাহাদের জাতীয় দুর্দ্দশার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিয়া সান্ত্বনা পাইত। মনে করিত, ভবিষ্যতে মেশায়া জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের এই চিরন্তন দুঃখ মোচন করিবেন। এই মেশায়া কতকটা আমাদের কল্কি-অবতারের মত। ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছনিবহ দূর করিয়া ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ আমাদের পুরাণে ভবিষ্যদুক্তি আছে। ইহুদিদিগেরও সেইরূপ আশা ছিল, মেশায়া জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাদিগের জাতীয় দুরবস্থার অপনোদন হইবে। মধ্যে মধ্যে নবি বা প্রফেট নামে এক শ্রেণীর লোক ইহুদি জাতির দুর্দ্দশাকালে ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবী মেশায়ার কথা বলিয়া ইহুদি জাতিকে আশ্বাস দিতেন। সাধারণ ইহুদি জাতির বিশ্বাস তাহাতে অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই যখন যীশু জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাকে মেশায়া বলিয়া প্রচার করিলেন, অথচ ইহুদি জাতির জাতীয় দুঃখের অবসান হইল না, তখন ইহুদি জাতি তাঁহাকে মেশায়া বলিয়া স্বীকার করিল না। কেহ কেহ তাঁহাকে স্বীকার করিয়া একটা দল বাঁধিল মাত্র। তৎপরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও ত্রাণকর্তৃত্ব ইহুদি-সমাজের বাহিরে প্রচারিত করিয়া বৃহৎ খ্রীষ্টান-সমাজের স্থাপনা করিলেন। এই খ্রীষ্টীয় সমাজ উনিশ শত বৎসর ধরিয়া যীশু খ্রীষ্টকে মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। তাঁহাকে ত্রাণকর্তা বা উদ্ধারকর্ত্তা বলা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তিদাতা বলা যায় না। কেন না, আমাদের দর্শন-শাস্ত্রে যাহাকে মুক্তি বলে, খ্রীষ্টানেরা সেরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন না। খ্রীষ্টানি শাস্ত্রে সেরূপ মুক্তির কথা আছে কি না জানি না।

যীশুর জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শাক্যকুমার সিদ্ধার্থের জন্ম হইয়াছিল। তিনি একটা দেশব্যাপী সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করেন ও তদ্ব্যতীত গৃহস্থ লোকেও দলে দলে তাঁহার উপাসক হইয়াছিল। তিনি বহু সাধনার পর আপনাকে বুদ্ধ অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহা নির্ব্বাণ লাভের এক মাত্র পন্থা বলিয়া নিশ্চয় করেন, মানবজাতির নিকট সেই পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মানবজাতির দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় ছিন্ন হইয়াছিল; তাঁহার প্রদর্শিত নির্ব্বাণের পথ মানবজাতির সেই সনাতন দুঃখনিরোধের এক মাত্র উপায় বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি

সেই দুঃখনিরোধের উপায় আবিষ্কারের জন্য রাজ্য-সম্পৎ ত্যাগ ও ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রাজকরূপে বেড়াইয়াছিলেন। তিনি যে নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করেন, তাহা বেদনির্দ্দিষ্ট মুক্তির পথ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাণকে আমরা মুক্তির সহিত এক পর্য্যায়ে গ্রহণ করিলে অধিক দোষ হইবে না। কিন্তু এই নির্ব্বাণ বা এই মুক্তি কোন পুরুষের বা মহাপুরুষের কৃপা মাত্রে লভ্য নহে; এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাক্রমে বা কৃপাবলে মানুষকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভগবান্ বুদ্ধ কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহাই সন্দেহের স্থল। মানুষ আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। সৎ কর্ম্মের ফল সদ্‌গতি ও সুখলাভ; অসৎ কর্ম্মের ফল অসদ্‌গতি ও দুঃখলাভ। কোন ব্যক্তি কোনরূপে এই কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি লাভে সমর্থ নহে। মনুষ্য ইহ জীবনে তাহার কর্ম্মফল কতক ভোগ করে; কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলেও তাহার কর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না। সে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারে; এক লোক ত্যাগ করিয়া অন্য লোকে যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়। লোকান্তরে গিয়াও তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয় এবং সেই দেহান্তরে ও লোকান্তরে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগের জন্য তাহাকে আবার নূতন দেহ ধারণ বা নূতন লোকে বিচরণ করিতে হয়। ইহার নাম সংসার। নরদেহ-পরিত্যাগের পর মনুষ্য দেবদেহ ধারণ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। ভূলোক ত্যাগ করিয়া সে কিছুদিন স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই দেবদেহপ্রাপ্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি মুক্তি নহে। সেখানেও কর্ম্ম আছে ও কর্ম্মপাশের বন্ধন আছে। সে বন্ধন হয়ত সোনার শিকলে বন্ধন, আর নরদেহের বন্ধন লোহার শিকলে বন্ধন। কিন্তু উভয়ই বন্ধনদশা। স্বর্গপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে না। সৎ কর্ম্মফলে স্বর্গপ্রাপ্তির ও ফলভোগাবসানের পর তাৎকালিক কর্ম্মফলে আবার অন্য লোকের প্রাপ্তি ঘটিবে। কাজেই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিল না। সৎ কর্ম্মই কর, আর অসৎ কর্ম্মই কর, সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেই হইবে; অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। কোন দয়ালু পরিত্রাতা এই সংসারচক্রে ভ্রমণ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে না। সংসার হইতে অব্যাহতির উপায় নাই।

তবে এক উপায় আছে। এই সংসার বস্তুতঃ অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ভ্রান্ত জ্ঞান মাত্র, ইহা জানিলে সকল দুঃখ দূর হইতে পারে। নির্ব্বাণলাভের বা দুঃখবিমুক্তির এই এক মাত্র পন্থা এবং ইহা জ্ঞানের পন্থা। এই জ্ঞানমার্গ ভগবান্ তথাগত আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায় এই লোক এত কাল ধরিয়া তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল; ভগবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপ জ্বালিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিলেন। মনুষ্য যে দেহ ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়, পুনঃ পুনঃ কর্ম্মবশে বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ইহার মূল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান। যে প্রক্রিয়ায় বা ধারাক্রমে

অবিদ্যা হইতে এই সংসারের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। প্রসঙ্গান্তরে প্রতীত্যসমুৎপাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা গিয়াছে। ফল কথা, যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান বা অনুভূয়মান, যাহা কিছু প্রত্যয়গোচর, তাহা ভ্রান্তি—তাহার মূল অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব। স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, যাহা কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা কেবল সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন। উহার ভিতরে কিছুই নাই। সমস্ত শূন্য ও মরীচিকা। সংসার অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই ভ্রান্তি কাটিয়া যাইবে। তখন বুঝিবে—জন্মমৃত্যু সবই মিথ্যা, ইহকাল-পরকাল কিছুই নাই, সুখ-দুঃখও অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই নির্ব্বাণ ঘটে বা মুক্তি ঘটে। এইটুকু বুঝিলেই দুঃখ থাকে না; এইটুকু বুঝিলেই জন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয় না। কেন না, সংসারই যদি না থাকে, জন্ম-মৃত্যু তাহা হইলে কিরূপে থাকিবে, জন্মান্তর পরিগ্রহই বা কিরূপে হইবে, দুঃখই বা কিরূপে থাকিবে। এই সংসারের বা জন্ম-মৃত্যুর অস্তিত্ব আছে, এই ভ্রমটাই অবিদ্যা; এই ভ্রান্তির অপনোদনই নির্ব্বাণ। ইহার ফল দুঃখনাশ।

কাজেই ঐ জ্ঞানের উদয় ভিন্ন নির্ব্বাণ লাভের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেই জ্ঞানোদয় অতি কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টা মাত্রেই সেই জ্ঞানের উদয় ঘটে না। বিশ্ব-জগৎ নাই, ইহা ইচ্ছা করিলেই মনে করা যায় না। অন্ততঃ অনেক বড় বড় লোকে যখন এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই। তবে সাধারণ মানুষে করিবে কি? তাহারা যথাসাধ্য এই জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে; এই জ্ঞান লাভের জন্য যে সাধনা আবশ্যক, তাহা দ্বারা এই জ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। বুদ্ধ-প্রদর্শিত আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্পাদি দ্বারা আত্মোন্নতি বিধানের পর শেষ পর্যন্ত সম্যক্ সমাধিবলে ঐ জ্ঞান লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। মুক্তি আয়াসলভ্য; উহা জ্ঞানীর প্রাপ্য। আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে, এবং ঐ পথ ভিন্ন অন্য পন্থায় চলিলে ফল লাভের সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অধিকার থাকিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

ভগবান্ তথাগত এইরূপে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই হেতু মুক্তির পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করেন করেন নাই। বিশুদ্ধ বৌদ্ধ মতে কোন মনুষ্য বা কোন দেবতা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন না; কাজেই মুক্তিদাতা কেহ থাকিতে পারে না। বিনা অবিদ্যানাশে নির্ব্বাণ লাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই নির্ব্বাণ প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনাসাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে বুদ্ধপ্রদর্শিত ত্রিশরণ মার্গ আশ্রয় করিলে সেই সাধনার পথ পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। কিংবা একটুকু বলা যাইতে পারে যে, সৌগত মার্গ আশ্রয় না করিলে মুক্তির পথ জানিবার উপায় থাকে না, অতএব মুক্তি লাভের উপায় থাকে না। বুদ্ধদেবই জগৎকে মুক্তির পন্থা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা অন্য পন্থা দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধগণের মতে ভ্রান্ত।

বৌদ্ধগণ ভগবান্‌কে ভবব্যাধির চিকিৎসক বৈদ্যরাজ জ্ঞানসিন্ধু দয়াসিন্ধু ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। এই করুণানিধান মহাপুরুষের পূজা বৌদ্ধ-সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কৃপা মাত্রে যে মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-মতের স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু মুক্তিকে অনায়াস-লভ্য বলেন নাই। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ অচিরে তাঁহাকে মুক্তিদাতার স্বরূপ গ্রহণ করিল। যিনি মুক্তির এক মাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে মুক্তিদাতা, সর্ব্বসাধারণে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। করুণাময়ত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব উভয়ের আধার-স্বরূপ হইয়া তিনি বৌদ্ধসমাজে অচিরে পূজিত হইতে লাগিলেন। উত্তরকালে মহাযানী বৌদ্ধেরা নানা বুদ্ধের এবং বোধিসত্ত্বের কল্পনা করিয়াছিল। সংসারতাপক্লিষ্ট মানব সর্ব্বদাই সংসারক্লেশ হইতে ও জন্মামরণ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্মণ এই উদ্ধার লাভের কোন সহজ পন্থা দেখান নাই। মহাযানী বৌদ্ধেরা অতি সহজ পন্থা দেখাইয়া দিল। মহাযানীদের কল্পিত বোধিসত্ত্বগণ মূর্ত্তিমান করুণাস্বরূপ। তাঁহারা মানবকে দুঃখসাগর হইতে তরাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। সৌগত মার্দের আশ্রয় লইয়া বোধিসত্ত্বগণের শরণাগত হইলে, তাঁহাদের করুণার ভিখারী হইলে, তাঁহাদের পূজা করিলে, কাহাকেও এই সংসারতাপ হইতে উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। বোধিসত্ত্বগণের সহকারে তাঁহাদের নানা পত্নী বা শক্তি-দেবতা কল্পিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দয়ার নিধান। তাঁহার শক্তি তারাদেবী সংসারার্ণবতারিণী। তাঁহাদের শরণাগত হও; সংসার সাগর হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইবে। এইরূপে উপাসকের সিদ্ধিদানে ও সংসারক্লেশ নিবারণে সর্ব্বদা উদ্যত অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমায় বৌদ্ধগণের দেবমন্দির-সকল পূর্ণ হইতে লাগিল। দলে দলে বৌদ্ধ উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেদমার্গভ্রষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহস্থ উপাসকে দেশ পূর্ণ হইল। মহাযান আশ্রয় করিয়া সংসার-বারিধি উত্তীর্ণ হইবার জন্য দলে দলে যাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। বেদপন্থী সমাজ হইতে বৈদিক মার্গ লোপ পাইতে বসিল।

দেখা গেল, খ্রীষ্টানগণের স্বীকৃত পরিত্রাণের পন্থার সহিত বৌদ্ধস্বীকৃত নির্ব্বাণের পন্থার আদৌ কোন মিল ছিল না। কিন্তু কালের পরিণতিতে উভয়ই প্রায় তুল্যমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পন্থার পরিণতি সাধনে বৌদ্ধ পন্থার কোন প্রভাব ছিল কি না, ইহা একটা প্রচণ্ড ঐতিহাসিক সমস্যা। খ্রীষ্টানগণের আচরানুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠানের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য দেখিলে এই প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কাহারও কাহারও মতে মিশর দেশের থেরাপিউটগণ ও ইহুদি দেশের এসিনি-গণ বৌদ্ধ সম্প্রদায় মাত্র। ব্যাপ্‌টিষ্ট জোহন বৌদ্ধ ছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্ট বৌদ্ধ মতই ইহুদি-সমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা ইহা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। অনিচ্ছুক হইবারই কথা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহেন। মক্ষমূলার বলিয়াছেন, বিনা ঐতিহাসিক প্রমাণে খ্রীষ্টানির উপর বৌদ্ধের প্রভাব স্বীকার্য্য নহে।

চীনদেশে ও তিব্বতদেশে খ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তদ্দারা খ্রীষ্টানি আচারানুষ্ঠান বৌদ্ধদেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারক খ্রীষ্টানের দেশে বাস করিয়া বৌদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিল, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান খ্রীষ্টান কর্তৃক অনুকৃত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

কথাটা ঠিক। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত কোন ঐতিগাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে না। আমরা ঐতিহাসিক নহি। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মুখেই শুনিতে পাই,- মহারাজ অশোক সিরিয়া মিশর কাইরিনি এপাইরিস প্রভৃতি যবনদেশে বৌদ্ধ মত প্রচারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন ; পরবর্ত্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ গ্রীক ও রোমক নৃপতিগণের সভায় দূত পাঠাইতেন ; প্রাচ্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের বহু দিন হইতে বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রচলিত ছিল; যবন নরপতিরা ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদিগকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেন। বর্ত্তমান বিচারে এইগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া কেন গৃহীত হয় না, ঠিক বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্ত্বের মূল কথা এই যে, ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত পাপাত্মা মানবের উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, এবং তিনি মানবের প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যীশু খ্রীষ্ট নরদেহধারী ভগবান এবং তিনিই মনুষ্যের উদ্ধারকর্ত্তা। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কাহারও কৃপাবলে মনুষ্য আপন কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। জ্ঞানের পন্থা ভিন্ন নির্ব্বাণের—মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা তিনি দেখান নাই। তবে সেই পন্থা তিনি নিজে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন মাত্র ; মুক্তিদাতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই ; এবং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই যে, খ্রীষ্টানের পরিত্রাণ ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণ একবিধ পদার্থ নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব নিজে যে শক্তি চাহেন নাই তাঁহার অনুগতেরা তাঁহার প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। তাঁহাকে জীবের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। বুদ্ধগণের ও বোধিসত্ত্বগণের ও বুদ্ধশক্তিগণের শরণ গ্রহণ ও উপাসনা সংসার হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধমুখে বলাইয়াছিলেন, "কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোকঃ"—কলির বশে জীব যে সকল পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই পাপের ভার আমার উপর পতিত হউক, জীব সেই পাপভার হইতে মুক্ত হউক ;—দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত এই উক্তির সহিত দয়াময় যীশু খ্রীষ্টের উক্তির অধিক প্রভেদ নাই। এই উক্তিকে খাঁটি খ্রীষ্টানি মত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি অতি দীনহীন, আমি অতি পাপী, প্রভু নিজগুণে দয়া করিয়া আমার চুল ধরিয়া আমাকে উদ্ধার কর—আধুনিক বৈষ্ণবেরা এ কথা আধুনিক বৌদ্ধদের নিকট শিখিয়াছিলেন কি না, বিচার্য্য হইতে পারে। বৌদ্ধগণ ইহা খ্রীষ্টানের নিকট পাইয়াছিলেন অথবা খ্রীষ্টানেরা ইহা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়াছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তাহার বিচার করিবেন।

বুদ্ধপ্রচারিত নির্ব্বাণতত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণের স্বীকৃত বৈদান্তিক মুক্তিতত্ত্বের অধিক পার্থক্য নাই। কিন্তু খ্রীষ্টপ্রচারিত পরিত্রাণতত্ত্ব হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালক্রমে বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব কিরূপে বিকৃত হইয়া খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্ত্বের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখা গেল। ব্রাহ্মণ-শাসিত বেদপন্থী সমাজও এই বিকার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। মহাযানী মন্ত্রযানী বজ্রযানী ইত্যাদি নানা বৌদ্ধ মাঝিরা যখন শস্তায় ও সহজে ভবসমুদ্র তরাইবার জন্য আপন আপন ডিঙ্গি হাজির করিয়া যাত্রীদিগকে টানাটানি করিতে লাগিল, তখন বেদপন্থীর জাহাজের জন্য পাথেয় সংগ্রহে লোকের আর প্রবৃত্তি থাকিল না। সদাচার ধ্বংসমুখে পতিত হইতে চলিল; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে চলিল; অনার্য্য দেবদেবীর প্রতিমায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; দেশবিদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণের আনীত অনার্য্য অনুষ্ঠানে আর্য্যসমাজ কলুষিত হইতে চলিল; বৌদ্ধ বিহার মধ্যে রাজশাসন সমাজশাসন ও শাস্ত্রশাসনের বহির্ভূত নর নারী দলবদ্ধ হইয়া নানাবিধ বীভৎস অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া কর্ণধারহীন সমাজের তরণীখানিকে ডুবাইবার উদ্যোগ করিল। তখন সেই স্রোতের গতি ফিরাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কঠোর বৈদিক মার্গকে শিথিল করিয়া সংসার হইতে পরিত্রাণের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ দ্বারা সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি প্রজাপতি, বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভের সহিত ক্রমশঃ লোকলোচন হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। রুদ্রমূর্ত্তি কপর্দ্দী পিণাকপাণি আপনার ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া অবলোকিতেশ্বরের অনুকরণে আশুতোষ শঙ্কর মূর্ত্তিতে পুনর্গঠিত হইলেন। জাতকোক্ত বুদ্ধাবতারগণের অনুকরণে নারায়ণের অবতারনিচয় কল্পিত হইল। গোপাবল্লভ মায়াসুতের স্থলে গোপীবল্লভ যশোদাদুলাল ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেদান্তের উমা হৈমবতী ও রুদ্র-ভগিনী অম্বিকা, ধূম্রবর্ণা কালী-করালাদি যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার সহকারে, এক দিকে বেদপূজিত শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী বাগ্‌দেবতার এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য জগজ্জননী মহামায়ার ও অন্য দিকে শবরদ্রবিড়পূজিতা চামুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া, ঈশানজননীরূপে বুদ্ধমাতা প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত এবং মহেশ্বর-পত্নীরূপে বুদ্ধশক্তি তারাদেবীর সহিত মিশিয়া গেলেন। সিততারা উগ্রতারা ও নীলতারা, বজ্রেশ্বরী বজ্রবারাহী উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর সহিত পূজাভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গৌরী-পদ্মা-শচী-মেধাদি মাতৃকাগণ ইন্দ্রাণী-কৌবেরী প্রভৃতি শক্তিগণের ও উগ্রচণ্ডা-প্রচণ্ডাদি নায়িকাগণের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। অমৃতদায়িনী পুরাতনী বাগ্‌দেবতা বীণাপুস্তকের সহিত অক্ষমালা ও মদিরাকলস গ্রহণ করিলেন। অবিদ্যানাশিনী কামবিজয়িনী মহাবিদ্যা কামোপরিস্থিতা আত্মঘাতিনী ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত প্রভৃতি বিবিধ ভক্তসম্প্রদায় আপন আপন ইষ্টদেবতার প্রসাদ লাভই সংসার হইতে উদ্ধারের এক মাত্র সহজ উপায় বলিয়া প্রচারিত করিতে লাগিল। অবশেষে যখন 'হরের্নামৈব কেবলং' কলি-কলুষ-নাশের ও পতিত উদ্ধারের সহজ পন্থাস্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন অধঃপতিত ধিক্কৃত বৌদ্ধ নামে পরিচয় দেওয়া আর কেহ আবশ্যক

বোধ করিল না।

এ-কালের পৌরাণিক শাস্ত্রে দেবতার প্রসাদ লাভ মোক্ষহেতু বলিয়া অকাতরে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, বেদে ইহার মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই মোক্ষ দর্শনশাস্ত্রের মোক্ষ নহে। সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাবধান, তাঁহারা অনেকটা বুঝিয়া কথা কহেন। ইষ্টদেবতার সালোক্য সামীপ্য প্রভৃতি তাঁহারা প্রার্থনা করেন; সাযুজ্য সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথা কহেন; আর মুক্তির নাম শুনিলেই তাঁহারা চমকিয়া উঠেন। মুক্তি, যাহার বেদান্ত-সম্মত উপায় জীব ব্রহ্মের একতানিরূপণ, তাহা আধুনিক ভক্ত উপাসকের শিরঃপীড়া-জনক। মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ চিনি খেতে ভাল বাসিতেন, চিনি হতে চাহিতেন না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অনেক দম্ভের সহিত তাদৃশ উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টানের সহিত আধুনিক হিন্দুর বড় পার্থক্য নাই।

বৌদ্ধ উৎপাতে যখন সনাতন ধর্ম্মের তরণীখানি বিপ্লুত হইতেছিল, সেই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। বেদান্ত-বিদ্যা এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তিনি অগাধ বিদ্যাবলে ও অসামান্য ধীশক্তিবলে বেদান্ত-বিদ্যার জনসমাজে পুনঃপ্রচার করেন। তৎকালে বৌদ্ধ, জৈন, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, নগ্ন, ক্ষপণক, কাপালিক প্রভৃতি বিবিধ সদাচারভ্রষ্ট বেদমার্গচ্যুত সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদ-কোলাহলে ভারতবর্ষের আর্য্যসমাজ "কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়" মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণের সহিত জীবনব্যাপী বিচার সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতিসম্মত মুক্তিতত্ত্বের উদ্ধার করেন। তৎকর্ত্তৃক চিরতরে প্রতিষ্ঠাপিত মুক্তিতত্ত্বের নামান্তর অদ্বয়বাদ।

শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত ব্যাখ্যা সকল আচার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা অন্যরূপে বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদান্তের ভাষা অতি প্রাচীন ভাষা; সর্ব্বস্থানে উহার অর্থবোধ সুখকর নহে। আবার ঐ ভাষা অনেক স্থলে কবিতার ভাষা, কোথাও বা হেঁয়ালির ভাষা। কাজেই বেদান্তদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নিবারণের উপায় নাই। অধুনাতন কালে প্রাচীন ভাষার নানা অর্থ আবিষ্কার করা চলিতে পারে। ঘটিয়াছেও তাহাই। আচার্য্য-গণের মধ্যে যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি শ্রুতিবাক্যমধ্যে সেই মতের অনুযায়ী অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং যে এইরূপ পক্ষপাত করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি অদ্বয় মতের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থাকে মুক্তিলাভের এক মাত্র পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিতেন। শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন নব-প্রচারিত বা নবাবিষ্কৃত মত গৃহীত হওয়া উচিত নহে, ইহাও তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেক স্থলে আত্মমতের অনুযায়ী করিয়া শ্রুতি-বাক্যের অর্থ করিতে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায়। তথাপি ইহাও মানা যাইতে পারে যে, বেদান্ত-বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম শঙ্কর যেমন বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন, আর কেহ তেমন পারেন নাই।

শঙ্কর-প্রচারিত বেদান্তব্যাখ্যা বেদান্ত-সঙ্গত হউক আর না হউক, এবং শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বয়বাদ সত্য হউক আর না হউক, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। শঙ্করের ব্যাখ্যা পরবর্তী বহু দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানিসমাজে তৎপ্রচারিত অদ্বয়বাদ যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, অন্যের প্রচারিত অন্য কোন বাদ সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অদ্বয়বাদীরা মুক্তি শব্দে কি বুঝিয়াছেন, আমাদের এ স্থলে তাহাই আলোচ্য। তাঁহাদের মুক্তির সারবত্তা আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁহারা যাহাকে মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মুক্তির প্রকৃত পথ বা প্রকৃষ্ট পথ না হইতে পারে। তাঁহারা বেদান্ত-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত অর্থ না হইতে পারে। অদ্বয়মতানুযায়ী মুক্তির তাৎপর্য্য কি, উপস্থিত আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য।

শঙ্কর-প্রচারিত মুক্তির অর্থ সম্বন্ধে ও অদ্বয়বাদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা দেখা যায়। ইংরেজী বাঙ্গালা নানাবিধ গ্রন্থে এই অদ্বয় মতের আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই হতাশ হইতে হইয়াছে, স্বীকার করিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সমস্ত প্রচলিত আলোচনার সার সঙ্কলন করিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়।

বলা হয়, অদ্বয়বাদী এক মাত্র নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই এক মাত্র নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইংরেজীতে ইহার Universal Soul নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইহাই বেদান্ত-স্বীকৃত ঈশ্বর-পদবাচ্য। তবে অন্য শাস্ত্রের স্বীকৃত ঈশ্বরে ও বেদান্তস্বীকৃত ঈশ্বরে প্রভেদ আছে। খ্রীষ্টানাদির ঈশ্বর সগুণ; বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িকগণের এবং নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরও সগুণ। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর—যাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়; তিনি নির্গুণ।

এই নির্গুণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য পদার্থ;—তদ্ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। এই যে বিশ্ব-জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা মিথ্যা। ইহা সেই ব্রহ্মেরই মায়া হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম আপনার মায়া দ্বারা এই মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সত্যবস্তু পরমাত্মা ও তাঁহার মায়াকল্পিত এই মিথ্যা জগৎ ব্যতীত দেহধারী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না? বেদান্ত এ বিষয়ে কি বলেন? এই জীবাত্মাকে ইংরেজীতে Individual Soul বলা হয়। জীবাত্মার ভোগের জন্য এই বিশ্ব-জগৎ বর্ত্তমান; জীবাত্মা কাজেই ভোক্তা, কর্ত্তা, সুখী দুঃখিরূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু ইহা জীবাত্মার বুঝিবার ভুল। জীবাত্মা বস্তুতই পরমাত্মার সহিত এক পদার্থ। পরমাত্মা নির্গুণ, কাজেই তিনি কর্ত্তা ভোক্তা, সুখী দুঃখী হইতে পারেন না। জীব অবিদ্যাবশে বা অজ্ঞানবশে আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে করিয়া আপনাকে সুখী দুঃখী, কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব আপনাকে পরমাত্মার সহিত এক বলিয়া জানিতে পারে; তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বা

ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন উহাকে আর কর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তখন আর উহাকে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না।

ব্রহ্ম ও জীব এক ; এ কিরূপ ঐক্য? প্রচলিত মতানুসারে উভয়ই এক বস্তুতে নির্ম্মিত। তবে ব্রহ্ম নিরুপাধিক ; আর জীব সোপাধিক। মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, জলরাশির সহিত বুদ্বুদের যেরূপ সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত—Universal Soul-এর সহিত—জীবাত্মার Individual Soul-এর কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও আকাশ বস্তুতঃ একই পদার্থ ; কেবল ঘটরূপী উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে উহা পৃথক্ দেখায়। বুদ্বুদ ও জল একই পদার্থ। কেবল ভিতরে বায়ু থাকায় বুদ্বুদকে জল হইতে পৃথক্ দেখায়। কিন্তু ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ঘটের অন্তর্গত আকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায় ; বায়ুটুকু বাহির হইয়া গেলে বুদ্বুদ যেমন জলরাশিতে মিশিয়া যায়, তখন ঘটাকাশের ও বুদ্বুদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকে না ; সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায় ; তখন আর উহা স্বতন্ত্র থাকে না। অজ্ঞান উপাধি থাকাতে উহাকে কর্ত্তা ভোক্তা সুখী দুঃখী বলিয়া, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইতেছিল। অজ্ঞানের বিলোপে উহা নির্গুণ নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপে লীন হইয়া যায়। উহাকে তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া চেনা যায় না। ইহার নাম মুক্তি।

এই মুক্তিলাভের পর পুনর্জ্জন্ম ঘটে না, কেন না, জন্ম-মরণ, আধি-ব্যাধি, এ-সমস্ত অনিত্য দেহের ধর্ম্ম ; নির্গুণ পরমাত্মার পক্ষে এ-সকলের সম্ভাবনা নাই।

প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে ইহাই অদ্বয়বাদ। জীব ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন ; অর্থাৎ উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। ব্রহ্মও যেমন নির্ব্বিকার নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ; জীবও তদ্রূপ ; তবে অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের বশ জীব আপনাকে অন্যরূপ মনে করে। যত দিন মনে করে, তত দিন সে কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। সেই অবিদ্যাটা কাটিয়া গেলে জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায় ; তখন মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

ভয়ে ভয়ে বলিতেছি ; খুব সম্ভব যে, পাঠকগণের অধিকাংশেরই ইহাই অদ্বয়বাদ বলিয়া ধারণা আছে ; এবং এইরূপ ধারণা আছে বলিয়াই দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদের উপর খড়্গহস্ত। এ কি স্পর্দ্ধা! জীব আর ব্রহ্ম কখন কি এক-জাতীয় পদার্থ হইতে পারে? উভয়ের একাত্মতা কি সম্ভবপর? যেরূপেই হউক, ব্রহ্ম হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ঘটিতেছে ; সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সহিত ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, পরিমিত, জন্ম-মৃত্যুর ও জরা-ব্যাধির অধীন জীবের একাত্মতা স্বীকার—ইহা বাতুলের প্রলাপ। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টের, অপরি-মেয়ের সহিত পরিমিতের ঐক্য বা একাত্মতা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। আর

মুক্তি অর্থে যাহাই হউক, উহাকে ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না; বড়জোর ব্রহ্ম-সান্নিধ্য-লাভ, ব্রহ্ম-সালোক্য-লাভ ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। অদ্বয়বাদীর মুক্তি দ্বৈতবাদীর প্রার্থনীয় নহে; ঐ মুক্তি কেবল মিথ্যাভিমানী অবিদ্বানের মিথ্যা আস্ফালন :

অদ্বয়বাদের ঐরূপ অর্থ ধরিয়া দ্বৈতবাদী এইরূপে গর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জন সম্পূর্ণ নিরর্থক। অকারণে তিনি হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করেন। কেন না, অদ্বয়বাদের যে অর্থ উপরে দেওয়া হইল, উহা প্রকৃত অদ্বয়বাদ নহে। মুক্তিতে যে অর্থ আরোপ করিয়া দ্বৈতবাদী গর্জ্জন করেন, মুক্তির অর্থ তাহা নহে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অদ্বয়বাদ বলিয়া বিবৃত হইল তাহা অদ্বয়বাদ নহে; তাহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ মাত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদেরই নিরাসের জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে মত শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আরোপ করা হয়, তাহা তাঁহাদের মত নহে; বরং সেই মত নিরাসের জন্যই তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম।

Individual Soul আর Universal Soul, এই দুই ইংরেজী তর্জ্জমা হইতেই এই ভ্রমের কথা বুঝা যায়। Individual Soul বলিতে বুঝায়, দেহধারী জীবের আত্মা; আর Universal Soul বলিতে বুঝায়. একটা বৃহত্তর আত্মা—পরিমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর জগদ্ব্যাপী আত্মা। উভয়ের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধের তুল্য। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পরমাত্মা অসীম অপরিমেয় উপাধি-বর্জ্জিত, আর জীবাত্মা সসীম পরিমেয় উপাধিবিশিষ্ট, অথচ উভয়ে অভিন্ন অর্থাৎ একজাতীয় চৈতন্যরূপ পদার্থে নির্ম্মিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায়, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ; জীব ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে, এই Universal Soul ও Individual Soul ঘটিত ব্যাখ্যাটা অদ্বয়বাদ নহে; ইহাই দ্বৈতবাদ।

তবে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি? দেখা যাক।

অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না; বিজাতীয়, সজাতীয়, স্বগত, কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না; এক অন্যের অংশ, এইরূপ বলিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, উভয়ই সর্ব্বতোভাবে এক। অর্থাৎ কি না, জীবই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মই জীব। পরমাত্মাই জীবাত্মা ও জীবাত্মাই পরমাত্মা। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—এই বাক্যের অর্থ এই যে, আত্মার অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দ বেদান্ত-বিদ্যা হইতে উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র আত্মা শব্দ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু এই কথা বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে হাহাকার উঠিবে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ—ইহাই বরং ছিল ভাল; জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক— আত্মার অপর নামই ব্রহ্ম—ইহা যে আরও বিষম কথা! এরূপ যে বলে, সে যে বাতুলেরও অধম।

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা হেতু আছে ; কিন্তু সেই হেতু তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত। তাঁহারা বেদান্তের ব্রহ্ম শব্দে গোড়া হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্ম শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা নিজে যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থবাচ্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর ঐরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের আতঙ্কের কারণ নাই। তাঁহারা যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ করেন, অদ্বয়বাদী সে অর্থে প্রয়োগ করেন না; অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তাঁহাদের ব্রহ্ম নহে। সুতরাং অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর উক্তি তাঁহাদের ব্রহ্মকে স্পর্শ মাত্র করে না। সুতরাং তাঁহাদের আতঙ্ক ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। তাঁহাদের প্রতিবাদও অদ্বয়বাদীকে স্পর্শ করে না। তাহাদের লড়াই হাওয়ার সহিত।

অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তবে কি? তিনি যাহাই হউন, কোনরূপ সগুণ ঈশ্বর নহেন। খ্রীষ্টানেরা এই বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, বিধাতা, অসীমশক্তিশালী, ন্যায়বান্, করুণানিধান এক নিরাকার পুরুষের—Personএর—অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আমাদের ব্রহ্মসমাজের আচার্য্যগণ বেদান্তের ব্রহ্মকে যথাসাধ্য সেই খ্রীষ্টানি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত অন্ততঃ অদ্বয়বাদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সহিত তাঁহার কোন একার্থতা নাই। আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িকেরা ও দ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা ও ঐশ্বরকারণিকেরা ঐরূপ এক জন সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করেন—তবে খ্রীষ্টানেরা তাঁহাতে যে সকল গুণ অর্পণ করেন, ইঁহারা সকলে সেই সকল গুণ অর্পণ করিতে চাহেন না। অনেকের মতে তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ও সগুণ; আবার অনেকের মতে নির্গুণ অথবা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই সৃষ্টি। কাহারও মতে ইনিই Universal Soul; জীব ইঁহারই অংশ; মুক্তির পর জীব ইঁহাতে লীন হইয়া যান। কেহ বা সে কথা বলিতে গেলে মারিতে আসেন। এই Universal Soul—এই জীব হইতে স্বতন্ত্র "ঈশ্বর"—যিনিই হউন, ইনি অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম নহেন; এবং যাঁহারা অদ্বয়বাদকে শ্রুতি বাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে ইনি উপনিষৎপ্রতিপাদ্য শ্রুতিসম্মত ব্রহ্ম নহেন।

তবে এই অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি? অদ্বয়বাদী ব্রহ্ম শব্দের অর্থই আত্মা। ইনি আর কেহই নহেন—ইনি আত্মা—তোমরা যাহাকে জীবাত্মা বল বা জীব বল; ইনি সেই জীবাত্মা বা জীব। অদ্বয়বাদ মতে পরমাত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পরমাত্মা নাম যদি নিতান্তই প্রয়োগ করিতে হয়, উহা জীবাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আর এক বার এইখানে বলিয়া রাখি, অদ্বয়বাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। অদ্বয়বাদী ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, সে কথা তুলিবারই কোন প্রয়োজন নাই। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ স্বীকার্য্য হউক আর না হউক, তাহাতে আপাততঃ কিছুই যায় আসে না। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি, তাহা বুঝিয়া দেখাই

বর্ত্তমান আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য।

এই অদ্বয়বাদকে খাঁটি Idealism বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। বার্কলির Idealism-এর সহিত ইহার মিল আছে, আবার প্রভেদও আছে। বার্কলি প্রতীয়মান জড় জগতের পারমার্থিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। অদ্বয়বাদীও স্বীকার করেন না। উভয়েরই মতে প্রতীয়মান জগৎ প্রত্যয়-সমষ্টি মাত্র। এই প্রত্যয়স্বরূপ জগৎ যে চেতন পদার্থের সমীপে প্রতীত হয়, সেই চেতন পদার্থের নাম আত্মা। বার্কলি ও অদ্বয়বাদী উভয়েই এই চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের উভয়ের নিকটই, এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী যে চেতন আত্মা, তাঁহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চেতন সাক্ষী না থাকিলে জগৎ কেবল অসম্বদ্ধ প্রত্যয়-পরম্পরায় বা ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টিতে পরিণত হইত। বার্কলির ভাষায় এই চেতন আত্মাই রূপ দেখে ও শব্দ শুনে ও আপনাকে রূপের দ্রষ্টা ও শব্দের শ্রোতা বলিয়া জানে; চেতন আত্মা না থাকিলে রূপ হয়ত থাকিত, শব্দ হয়ত থাকিত; কিন্তু রূপ শব্দকে শুনিতে পাইত না ও শব্দ রূপকে দেখিতে পাইত না; রূপের সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক থাকিত না। বৌদ্ধগণ জগৎকে ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি বা প্রত্যয়-পরম্পরা বলিয়াই জানেন; তাঁহারা এই প্রত্যয়-পরম্পরার সাক্ষী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে হিউমও স্বীকার করেন না। হিউম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের নিকট এই সাক্ষী আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাঁহারা সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান; আমি কিন্তু এই আত্মাকে কখনই দেখিতে পাই নাই; আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া কেবল একটা-না-একটা প্রত্যয় দেখি,—শীতাতপ, আলো আঁধার, সুখ দুঃখ, এইরূপ একটা না-একটা প্রত্যয় দেখি; এই প্রত্যয় বা এই ক্ষণিক বিজ্ঞানই আমার পক্ষে সর্ব্বস্ব; সুষুপ্তির সময় যখন এই প্রত্যয়গুলি লীন হইয়া যায়, তখন কিছুই থাকে না! বার্কলির সহিত ঐ পর্য্যন্ত অদ্বয়বাদীর মিল আছে। কিন্তু তাহার পরে আর মিল নাই। অদ্বয়বাদীর মতে আত্মা বহু নহে, আত্মা এক মাত্র। সে কোন্ আত্মা? আমিই সে আত্মা। অন্য মনুষ্যের বা অন্য কোন জীবের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারে অদ্বয়বাদী কুণ্ঠিত। তাহার কারণ বুঝা যায়। তোমার দেহ আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। সেই প্রত্যক্ষ দেহ দেখিয়া ও তাহার আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তোমার আত্মার অস্তিত্ব আমি অনুমান করিয়া থাকি। তোমার দেহ প্রত্যক্ষবিষয়—তোমার আত্মা প্রত্যক্ষবিষয় নহে, অনুমানবিষয় মাত্র। কিন্তু তোমার দেহেরই পারমার্থিক অস্তিত্ব যখন আমি স্বীকার করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অনুমিত আত্মারও পারমার্থিক অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। অন্ততঃ আমার আত্মা যেরূপ আমার উপলব্ধির বিষয় ও আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, তোমার আত্মা সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে; অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুও নহে। এইখানে বার্কলির সহিত অদ্বয়বাদীর প্রভেদ। কেবল বার্কলি কেন, সাংখ্যদর্শন-সম্মত পুরুষের সহিত যদি বৈদান্তিক আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়—তাহা হইলে এখানে সাংখ্যের সহিতও বেদান্তীর ভেদ। সাংখ্য বহুপুরুষবাদী; বেদান্তী একপুরুষবাদী বা

একাত্মাবাদী। বেদান্তের আত্মা আমার আত্মা—অর্থাৎ আমি। তদ্ভিন্ন অন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। এই আত্মার নাম জীবাত্মা বা জীব। এবং এই জীব এক মাত্র। অন্য জীব কাল্পনিক মাত্র।

এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্ব-জগৎ নামক একটা কল্পিত পদার্থকে আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া, তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ও তাহার সহিত আমার বিবিধ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি। এই বিশ্ব-জগৎ আমার নিকট নিয়মিত সুব্যবস্থ জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে আমি কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা দেখিতে পাই। এই জগতের মধ্যে শীত গ্রীষ্ম, দিবা রাত্রি নিয়মমত পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রহ-নক্ষত্র নিয়মমত উদিত ও অস্তগত হয়। আগুনে হাত পোড়ে, অন্নে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, এইরূপ বিবিধ নিয়ম ও কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা এই জগতে আমি দেখিতে পাই। এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝান একটা সমস্যা। হিউম এবং বৌদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা নাই; কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরা মাত্র আছে। জাগতিক পদার্থের অর্থাৎ প্রত্যয়গুলির মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ আছে। একটা প্রত্যয়ের পর আর একটা প্রত্যয় আসিয়া থাকে। অন্নভোজনরূপ প্রত্যয়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তি নামক প্রত্যয় উপস্থিত হয়, এই মাত্র—কিন্তু উপস্থিত হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কেন না, উভয় প্রত্যয়ই ক্ষণস্থায়ী। একের সহিত অন্যের ঐ পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঐরূপ ঘটিয়া থাকে; ঐরূপ যে ঘটিতেই হইবে, এরূপ কোন হেতু নাই। কেন অন্যরূপ না ঘটিয়া ঐরূপই ঘটে, এ প্রশ্ন নিরর্থক—কেন না, ঐরূপ না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও ঠিক সেই প্রশ্নই উঠিত। আতা-ফল ভূমিতে কেন পড়ে, আকাশ কেন নীলবর্ণ, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না; আতা-ফল যদি ঊর্দ্ধগামী হইত, আকাশ যদি হরিদ্বর্ণ হইত, তাহা হইলেও কেন তেমন হয়, এই প্রশ্ন উঠিত; তাহারও উত্তর দিতে পারিতাম না। যখন একরূপ-না-একরূপ ঘটিতেছে ইহা মানিতেছ; তখন যাহা ঘটিতেছে, তাহাই মানিয়া লও। কেন এরূপ হইল, কেন ওরূপ হইল না, এ তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, এরূপ যে হয়, উহাই অবিদ্যা। হিউম বলেন, ও সকল প্রশ্নের উত্তর নাই; উহা হেঁয়ালি।

বার্কলি জগতের এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এক বৃহৎ চেতন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহাকে Universal Soul বা Active Reason, এইরূপ একটা নাম দেওয়া হয়। বার্কলি খ্রীষ্টান ছিলেন; তিনি বলেন, এই বৃহৎ চেতনময় পদার্থই খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর—এবং ইনিই প্রতীয়মান জগতে নিয়মের, ব্যবহারের ও কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা। জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর সেই বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর তৎকল্পিত বিশ্ব-জগতে স্বেচ্ছায় কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও প্রত্যয়গুলিকে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; সেই জন্য একের পর অন্য ঘটনা ঘটে। তিনি যেরূপ বিধান করিয়াছেন, সেইরূপই ঘটে; অন্যরূপ বিধান করিলে অন্যরূপই ঘটিত। সেই জন্যই

পরিমিত সঙ্কীর্ণ জীবাত্মা সেইরূপই ঘটিতে দেখে, অন্যরূপ ঘটিতে দেখে না। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া যথাকালে সূর্য্য উঠে, যথাকালে ঋতু-পরিবর্ত্তন হয়, যথাকালে জীবের জন্ম-মরণ ঘটে, যথানিয়মে সুখ দুঃখের আবির্ভাব তিরোভাব হয়— প্রত্যয়-সমষ্টিরূপ প্রত্যক্ষ জগৎচক্রের নেমি যথানিয়মে আবর্ত্তন করে।

প্রতীয়মান বাহ্য জগতে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার ও নিয়মের হেতু আবিষ্কার করিতে গিয়া বার্কলি এক জন বিশ্বাত্মার কল্পনা করিয়াছিলেন! যে সকল প্রত্যয়ে অচেতন জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমরা নির্দ্দিষ্ট বিধানে সজ্জিত ও বিন্যস্ত দেখিতে পাই। কে তাহাদিগকে এইরূপে সাজাইল? এই সজ্জায় ও বিন্যাসে কেবল যে একটা শৃঙ্খলা আছে, তাহা নহে; উহাতে একটা উদ্দেশ্যের, একটা লক্ষ্যের, একটা design এর পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের স্রোত যথানিয়মে চলিয়াছে–পরন্তু একটা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। দেখ, সেই প্রাচীন কালের প্রায় নিরাকার নীহারিকা হইতে কেমন সুন্দর সুব্যবস্থ সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ধরাপৃষ্ঠে কেমন বিবিধ জীবের, বিবিধ উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে; কেমন নূতন নূতন উৎকৃষ্ট জীব পুরাতন অপকৃষ্ট জীবের স্থান গ্রহণ করিয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত এই অত্যুন্নত মনুষ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। সমস্ত জগদযন্ত্রটি যেন তারে তারে, চাকায় চাকায় গাঁথা; এখানের চাকাখানি ওখানের চাকাখানিকে কেমন নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে। লাপ্লাসের ধীশক্তি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল; সৌরজগৎ-রূপ বিশাল যন্ত্রটি কেমন স্থিতিশীল; এতগুলি বৃহৎ জড়পিণ্ড পরস্পরকে কক্ষাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সকলে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জগদ্‌যন্ত্রের এই বৃহৎ উদ্দেশ্য, এই design, এই বড় হাতের-P যুক্ত Purpose, মন্দমতিকে বুঝাইবার জন্য মহামহাপণ্ডিতে মিলিয়া এতগুলা Bridgewater Treatiseই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। যন্ত্রটির নির্ম্মাণেই কেমন মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আজি যে উন্নত স্পর্দ্ধিত মনুষ্যজাতি ধরাপৃষ্ঠে অতুল মহিমায় বিচরণ করিতেছে, যেন কত কোটি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহার উৎপাদনের জন্য উদ্যোগ চলিতেছিল। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালাশ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, মনুষ্যকে কেন্দ্রগত করিয়া তাহার মহিমা বাড়াইবার জন্যই এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের কারখানাটা এত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। জড় জগৎকে প্রত্যয়সমষ্টি বল, ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই প্রত্যয়সমষ্টিকে এমন ভাবে এমন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইল কে? তাহারা আপনা হইতে ঐরূপে সজ্জিত হইয়াছে, আপনা হইতে আপনাদিগকে ঐরূপ উদ্দেশ্যের অভিমুখ করিয়া ঐরূপে যথানিয়মে ব্যবস্থিত করিয়া লইয়াছে, এরূপ বলিলে নিতান্ত অত্যাচার হয়। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মন মানে না। অচেতন জড়ে অথবা অচেতন প্রত্যয়ে এরূপ ক্ষমতা স্বীকার করিতে পারা যায় না। হিউম বলেন, ঐরূপ না হইয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপও হইতে পারিত। যাহা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর; কেন হইয়াছে, ওরূপ প্রশ্ন করিও না। কিন্তু হিউমের এ উত্তরেও মনের তৃপ্তি হয় না।

জড় জগৎকে ঐরূপ নিয়মে স্থাপনের জন্য, ঐরূপ একটা উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইবার জন্য এক জন নিয়ন্তার প্রয়োজন ; এক জন ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন ; এক জন ঈপ্সিত কর্ম্মে উৎসুক ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চেতন পুরুষের প্রয়োজন ; এক জন Pirson-এর প্রয়োজন। ইংরেজীতে ইহাকে বলে Argument from Design. বার্কলি এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ চেতন বৃহৎ আত্মার, অর্থাৎ চৈতন্যময় জীব হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর চৈতন্যময় ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। ইতর লোকে এই জন্য জগদ্রূপী ঘটের নির্ম্মাতা কুম্ভকাররূপী ঈশ্বরের কল্পনা করে। চেতনা-সম্পন্ন জীবের ঐরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের, ঐরূপে একটা উদ্দেশ্যের অনুকূলে চলিবার ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়াই এই বৃহৎ উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য বৃহৎ চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। এখন অদ্বয়বাদী বৈদান্তিক এ-ক্ষেত্রে কি বলেন, দেখা যাউক।

অদ্বয়বাদী বৈদান্তিকও জড় জগতে এই ক্ষমতা অর্পণে কুণ্ঠিত। প্রত্যয়সমষ্টি আপনা হইতে আপনাকে ঐরূপে বিন্যস্ত ও ব্যবস্থিত করিবে, ইহা তিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদান্ত-মতে প্রত্যয়সমূহ জড় পদার্থ বা অচেতন পদার্থ। আমরা আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলি, বৈদান্তিক তদ্ব্যতীত অন্যান্য পদার্থকেও জড় পদার্থ বলিতেন। এ-কালে যাহাকে matter বলে, বেদান্ত মতে তাহা প্রত্যয় মাত্র—তাহা ত অচেতন জড় বটেই। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থও বৈদান্তিকের ভাষায় জড় পদার্থ—কেন না, উহাদের নিজের চেতনা নাই। আত্মাই চেতন। আত্মা যাহা দেখে, যাহা শুনে অথবা যদ্দ্বারা দেখে, যদ্দ্বারা শুনে, সে সকলই অচেতন জড়। চন্দ্র সূর্য্য গাছপালা প্রভৃতি যাহা দেখা যায়, যাহা প্রত্যক্ষ-গোচর, তাহা ত অচেতন জড় বটেই ; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকলের সাহায্যে আত্মা এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করে, তাহারাও অচেতন জড়। তাহাদের নিজের চেতনা নাই। তাহারা আপনারা আপনাকে দেখিতে পায় না। এক মাত্র আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ, আত্মাই স্বপ্রকাশ ; আর সকলই তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। কাজেই জগদ্‌যন্ত্র আপনা হইতে নিয়মিত সুবিন্যস্ত সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ উদ্দেশ্যানুকূল হইতে পারে না ; উহাকে সাজাইতে গোছাইতে উদ্দেশ্যানুকূল করিতে চেতন আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন। কিন্তু সে কোন আত্মা ? বার্কলি বলিবেন যে, সে বিশ্বাত্মা—বৃহৎ ঐশ্বরিক আত্মা—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় চৈতন্যরূপী ঈশ্বর ; তিনিই ঐরূপে সাজাইয়াছেন বলিয়া ইতর সঙ্কীর্ণ পরিমিত জীবাত্মা ঐরূপ সজ্জিত দেখে। হিউম এইখানে আসিয়া বলিবেন, আচ্ছা, জড় জগতের সৃষ্টির জন্য, জড় জগৎকে সুনিয়ত করিয়া সাজাইবার জন্য যদি এক জন চেতন পুরুষের নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তজ্জন্য ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন কি ? অন্য কোন চেতন পুরুষেও সেই বিধান-ক্ষমতা, সেই নিয়ম রচনার ক্ষমতা অর্পণ করিতে ক্ষতি কি ? "Not only the will of the Supreme Being may create matter, but for aught we know *a priori*, the will of any other being might create it.', বৈদান্তিক হিউমের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন ; তিনিও

জোরের সহিত এইখানে আসিয়া বলেন, রহ, তজ্জন্য জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর আত্মার কল্পনার প্রয়োজন দেখি না; আমাকে ছাড়া আর আত্মা নাই এবং আমিই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যরূপী মহেশ্বর। আমিই এই প্রতীয়মান বিশ্বে ঐরূপ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—আমিই আমার কল্পিত জগৎকে ঐরূপ উদ্দেশ্যানুকূল করিয়া সাজাইয়াছি—আমিই জগতের স্রষ্টা কর্ত্তা ও বিধাতা—আমিই পরমাত্মা ও আমিই ব্রহ্ম।

কথাটা ঠিক হউক আর নাই হউক, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর হইতে পারে না। বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি আমি—সোঽহম্—অহং ব্রহ্মাস্মি। ইহা শ্রুতিসম্মত মহাবাক্য। ইহার তাৎপর্য্য লইয়া গণ্ডগোল নিষ্ফল। ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট। ইহা বিচারসহ কি না, তাহা লইয়া তর্ক তুলিতে পার; এই মত ভ্রান্ত, কি অভ্রান্ত, তাহা লইয়া বিচার করিতে পার; কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া বিসংবাদের কোন অবকাশ নাই।

বিশুদ্ধাদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত-বাক্যের যে এই অর্থ বুঝিয়াছিলেন, তাহা সহস্র স্থল হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। আত্মা অর্থে আমি, ইংরেজীতে যাহাকে ego বলে বা Self বলে, তাঁহাই; এবং আমার অপর নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে যদি পরমাত্মা বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্মা; আমা ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমাত্মা কিছুই নাই। ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ—ইহাই জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ। আমা ছাড়া জীব নাই—আমা ছাড়া ব্রহ্ম নাই—আমিই জীব ও আমিই ব্রহ্ম। যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা। কিন্তু ইহা বলিলেই অমনই কোলাহল উঠিবে। রামানুজ স্বামী হইতে বার্কলি পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির করিবেন, কেহ ভ্রূকুটি করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জন করিবেন। বলিবেন, এ কি বাতুলের প্রলাপ, এই সঙ্কীর্ণ সসীম পরিমিত কর্ম্মপাশবদ্ধ সংসারচক্রে ঘূর্ণমান জরামরণশীল দুর্ব্বল ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে জগৎকর্তৃত্ব জগৎবিধাতৃত্ব সর্ব্বশক্তিমত্তা চায়। এই minute philosopher, not six feet high"—এই ব্যক্তি বিশ্বভুবনপতির সিংহাসন গ্রহণ করিতে চাহে। হা দম্ভোঽস্মি!!

অদ্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, কে বলিল যে, আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্ম্মপাশবদ্ধ, জরামরণশীল? কে বলিল যে, আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নহি? কেন আমাকে ঐরূপে পরিমিত বিবেচনা করিবে? আমি যদি ঐরূপ মনে করি, তাহা আমার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের উদয় হইলেই বুঝিব, অখিল জগতের স্রষ্টা বিধাতা নিয়ন্তা আমিই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অন্য ব্রহ্ম নাই। কে বলিল, আমি সুখদুঃখভোগী অল্পশক্তি জীব মাত্র? এই জগৎ যখন আমারই কল্পনা, উহা যখন আমারই প্রত্যয়, এই স্থূল দেহ, এই জন্ম-জরা-মরণ, এই সুখ-দুঃখ, এ সমস্তও তখন আমারই কল্পনা। বস্তুতঃ আমি এ সকল হইতে মুক্ত;

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ। এইটুকু না জানিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত মনে করাই অবিদ্যা। এইটুকু জানারই নাম অবিদ্যার ধ্বংস—তাহার পারিভাষিক নাম মুক্তি।

প্রতিপক্ষ বলিবেন, ইহা অদ্বয়বাদীর নিতান্তই গায়ের জোর। জীবের সঙ্কীর্ণতা মানিব না বলিলেই কি চলিবে? এক মুষ্টি অন্ন যাহার জীবত্বের ভিত্তি, তাহার মুখে এমন কথা বাতুলের প্রলাপ। কাজেই প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতে হইলে অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির তাৎপর্য্য আর একটু স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সকল দর্শনে যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; একের নাম Subject বা বিষয়ী; অপরের নাম Object বা বিষয়। যে উপলব্ধি করে, সে বিষয়ী; যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা বিষয়। এই বিষয়ী আমি-অহং পদবাচ্য; আর এই বিষয় তুমি—ত্বং-পদবাচ্য। এ স্থলে তুমি শব্দে কেবল আমার সম্মুখবর্ত্তী তোমাকে মাত্র বুঝায় না; তুমি বলিতে, তিনি, সে, রাম শ্যাম হরি, বাঘ ভালুক, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য্য, লোষ্ট্র ইষ্টক সবই বুঝায়। কেন না, এ সকলই কোন-না-কোন সময়ে তোমার স্থলবর্ত্তী হইয়া আমার উপলব্ধির বিষয় বা আমার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে বা হইতে পারে। কাজেই এ সকলই বিষয়-শ্রেণীভুক্ত। এমন কি, আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এ সকলও আমি কোন-না-কোন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কাজেই এ সকলও বিষয়স্থানীয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বস্তুকে অর্থাৎ তোমাকে, তাঁহাকে, রাম শ্যাম হরিকে, আমারই মত চেতনাসম্পন্ন বলিয়া মনে করি; আর চন্দ্র-সূর্য্য গাছপালা লোষ্ট্র ইষ্টকাদিকে চেতনাহীন বলিয়া মনে করি। উহা কেবল লোকব্যবহারের জন্য; উহা ব্যবহারিক সত্য। উহাতে আমার জীবন-যাত্রার সুবিধা হয়, এই মাত্র; কিন্তু আমার জীবনযাত্রাই ব্যবহার মাত্র—সুতরাং পারমার্থিক ভাবে অসত্য। বিষয়ী আমিই এক মাত্র চেতন পদার্থ-আর আমা ছাড়া যাহা কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর বা অনুমানগোচর, যাহা আমরা বিষয়, তাহা চেতনাহীন পদার্থ। উহার কোন অংশে যদি চৈতন্য কল্পিত হয় বা অনুমিত হয়, সে আমারই কল্পনা বা অনুমান মাত্র; কাজেই সেই চৈতন্যের স্বাধীন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। আপাততঃ এই যে বিষয়ী আমি, সেই আমার জীব আখ্যা দেওয়া যাউক ও আমা-ছাড়া সমস্ত বিষয়কে জগৎ আখ্যা দেওয়া যাউক।

এই জীবের ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধ কি? আপাততঃ মনে হয়, জগৎ আমার বাহিরে স্বাধীন ভাবে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। সাংখ্যবাদী হয়ত তাহাই বলেন, জড়বাদিগণও তাহাই বলেন। আরও মনে হয়, এই বিষয়ের সহিত আমার নিত্য আদান-প্রদান কারবার চলিতেছে: শব্দস্পর্শগন্ধাদি বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তে আঘাত করিতেছে; তজ্জন্য আমার সুখ-দুঃখ ভোগ ঘটিতেছে। আমার মনে হয়, আমি সর্ব্বতোভাবে বিষয়ের

অধীন ও বিষয়ের বশীভূত; বিষয়ের কোন কোন ক্রিয়া আমার জীবনযাত্রার অনুকূল; কোন কোন ক্রিয়া বা প্রতিকূল। যাহা অনুকূল, তাহা আমার উপাদেয়; যাহা প্রতিকূল, তাহা আমার হেয়। উপাদেয়কে গ্রহণ করিবার জন্য, হেয়কে বর্জ্জন ও পরিহার করিবার জন্য আমি সর্ব্বদা কর্ম্মশীল; তদর্থ আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা চেষ্টাপর ও কর্ম্মপর। এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন। বিষয়ের সহিত আমার যে ক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণকে আমি আমার জন্মকাল বলি; বিষয়ের সহিত কারবার যত দিন চলিতে থাকে, তত দিন আমার বৃদ্ধি বিপরিণাম ক্ষয় ঘটে; ও যে সময়ে সেই কারবার থামে, সেই সময়কে মৃত্যুকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই সমস্ত কাল ধরিয়া আমি বিষয়ের অধীন থাকিয়া হেয় বর্জ্জনে ও উপাদেয় গ্রহণে চেষ্টা করি। বিষয়াধীন হইয়া আমাকে বিবিধ কর্ম্ম করিতে হয় ও সেই সকল কর্ম্মের যথানিয়মে ফল ভোগ করিতে হয়। কাহারও মতে মৃত্যুর পরেই যে আমার সহিত বিষয়ের কারবার চিরকালের জন্য থামে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তৎপরেও অন্য স্থানে অন্য দেহ ধারণ করিয়া আমাকে অন্য কর্ম্ম করিতে হয় ও তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ আমার জন্মের পূর্ব্বেও সম্ভবতঃ অন্য স্থানে অন্য দেহে বিষয়ের সহিত আমার কারবার চলিয়াছিল; তাহার স্মৃতি এখন বর্ত্তমান নাই; কিন্তু তাহার ফলভোগ হয়ত অদ্যাপি করিতে হইতেছে। এইরূপ মনে না করিলে, জন্মান্তরকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া না বুঝিলে এই জন্মের সকল সুখদুঃখের নির্দ্দেশ হয় না। জগৎপ্রণালীর 'ধর্ম্মগত সামঞ্জস্য'—moral justification ঘটে না।

এইরূপে বিষয়ের সহিত আমার এই কারবারের আরম্ভ; আমার এই সুখদুঃখভোগ, আমার এই কর্ম্মপরতা কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কবে শেষ হইবে, তাহাও বলা দুষ্কর। এই জন্মজন্মান্তরব্যাপী বিষয়বিষয়ীর পরস্পর আদান-প্রদান—ইহার নাম সংসার। ইহাতে কখন বা আমি আমার সম্মুখস্থিত বিষয়কে আত্মজীবনের অনুকূল করিয়া লইয়া সুখী হই, কখনও বা বিষয়কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দুঃখ ভোগ করি। চক্রনেমির আবর্ত্তনের সহিত আমার এই দশাবিপর্য্যয়কে উপমিত করা চলে। আমাকে আমি এই সংসারচক্রে ঘূর্ণমান কর্ম্মপাশবদ্ধ বিষয়াধীন ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ঐ বিষয় সর্ব্বতোভাবে আমা হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, আমার বহিঃস্থ ও আমা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস। উহা আপন নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই; কখন কখন আমি চেষ্টাপূর্ব্বক সেই নিয়মকে আমার অনুকূল করিয়া লই বটে, কিন্তু সেই নিয়ম সর্ব্বতো-ভাবে আমার অনধীন ও শেষ পর্য্যন্ত উহা অমাকে পরাভব করিয়া থাকি; শেষ পর্য্যন্ত আমি জগদ্‌যন্ত্রের চাকার তলে দলিত, পিষ্ট, অভিভূত হইয়া থাকি।

আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ আপাততঃ আমার ঐরূপ বোধ হয়। বোধ হয়, জীব

অর্থাৎ আমি ক্ষুদ্র, জগৎ বৃহৎ। আমি জগতের অধীন এবং জগতের অধীনতাহেতু সুখদুঃখভাগী ও জরামরণশীল। বৈদান্তিক এইখানে আসিয়া বলেন, যাহা মনে করিতেছ, তাহা ভুল। জীবের স্বভাব ঐরূপ নহে, জগতের স্বরূপও ঐরূপ নহে; এবং উভয়ের সম্বন্ধ যাহা মনে করিতেছ, ঠিক তাহার উল্টা। ঐ যে জগৎ, ঐ যে বিষয়, উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; উহা বিষয়ীর অর্থাৎ আমার কল্পিত পদার্থ। পরমার্থতঃ উহা স্বপ্নবৎ অলীক পদার্থ। এ কথা যে বৈদান্তিক একা বলেন, তাহা নহে। ইহা কেবল প্রাচ্য দার্শনিকের আফিমখুরি নহে। বার্কলি ও হিউম হইতে জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও টমাস হেন্‌রি হক্সলি পর্য্যন্ত সকলেই জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি কাটিতে যিনি সাহস করিবেন, তিনি করুন। আমি সেই যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে এখন বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমি তাঁহাদের সহিত মানিয়া লইব যে, বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহা বিষয়ীর কল্পনা মাত্র। বিষয়ী এই বিষয়ের সৃষ্টি করিয়া আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে।

এইখানে সৃষ্টি শব্দ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল। ইংরেজীতে যাহাকে creation বলে, আজকাল আমরা বাঙ্গলা সৃষ্টি শব্দ সেই অর্থে ব্যবহার করি। ইংরেজী creation শব্দে কখনও গঠন বা নির্ম্মাণ বুঝায়, কখনও অভিব্যক্ত করা বা মূর্ত্ত্যন্তর দেওয়া বুঝায়, আবার কখনও বা অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপাদন বুঝায়। কিন্তু বিষয়ী যে অর্থে বিষয়কে সৃষ্টি করে, আমি যে অর্থে আমার জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা ঐরূপ creation বলিলে বুঝায় না। এই সৃষ্টি শব্দের অর্থ কি, তাহা ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহার সাংখ্য-দর্শন পুস্তকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। এ স্থলে তাঁহার ভাষা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। "সৃজ ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জ্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূল ভূতের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। যেমন গুটিপোকাতে রেশমের কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ করে, তদ্রূপ নরনারী যে প্রক্রিয়া দ্বারা নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্ত জগতের বা স্থূল ভূতসংঘের) তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি।" (সাংখ্যদর্শন, ২৬ পৃ)। আমি সৃষ্টি শব্দ ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিলাম। বটব্যাল মহাশয়ের সহিত আমার প্রভেদ এই যে, তিনি সাংখ্য-মত বুঝাইতেছেন; আমি বেদান্ত-মত বুঝাইতেছি। সাংখ্য বহু জীবের, বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৈদান্তিক এক জীবের, এক পুরুষের, এক আত্মার অস্তিত্ব মানেন। বটব্যাল মহাশয় যেখানে 'নরনারী' বলিয়াছেন, বেদান্তী সেখানে কেবল 'জীব অথবা 'আত্মা' শব্দ ব্যবহার করিবেন। অপিচ সাংখ্য জ্ঞেয় নামক পদার্থের—প্রকৃতির—স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন; তবে এই জ্ঞেয় প্রকৃতি তাঁহার মতে প্রতীয়মান জগৎ

নহে; উহা কোন অনির্দ্দেশ বস্তু, যাহা আত্মার বা পুরুষের সন্নিধানে আসিয়া আত্মার সৃষ্টিক্ষমতাবলে পরিদৃশ্যমান, প্রতীয়মান জগতে পরিণত হয়। বেদান্ত সেই স্বতন্ত্র অনির্দ্দেশ্য জ্ঞেয় প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না। কাজেই যিনি বৈদান্তিক, তিনি বটব্যাল মহাশয়ের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উহাকেই জ্ঞেয় পদার্থে পরিণত করে, তদ্দ্বারা ব্যক্ত জগতের নির্ম্মাণ করে - অর্থাৎ আত্মা হইতে যে প্রক্রিয়ায় ভূতসমষ্টিস্বরূপ বিষয়ের আবির্ভাব হয়,—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি।"

বেদান্ত-মতে জ্ঞেয়, ব্যক্ত, প্রতীয়মান জগতের স্বরূপ কি, তাহা বলা হইল। উহা আত্মারই সৃষ্ট, আত্মারই কল্পিত; উহার ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। এ বিষয়ে প্রাচ্য দর্শন ও প্রতীচ্য দর্শন একমত। অজ্ঞেয় জগতের বা অব্যক্ত প্রকৃতির অস্তিত্ব বেদান্তী মানেন না।

তৎপরে প্রশ্ন, আত্মার স্বরূপ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদী প্রাচ্য দার্শনিক এবং হিউম ও হক্সলির সদৃশ প্রতীচ্য দার্শনিক এই আত্মারও অস্তিত্ব মানেন না। বেদান্ত উহার অস্তিত্ব মানেন; ভুলই হউক, আর ঠিকই হউক, মানেন; এবং বলেন, এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ; ইহার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এখন এই আত্মার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। বেদান্ত-মতে আত্মাই যখন বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সেই বিশ্বজগৎ যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারেই আপাততঃ অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে, তখন আত্মাকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিতে হয়। বেদান্ত তাহাই বলিয়াছেন। বেদান্ত আত্মাকেই পুনঃ পুনঃ ঐ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আত্মা সর্ব্বজ্ঞ—নতুবা অনাগত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্‌যন্ত্র চালান সম্ভবপর হইত না; আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, নতুবা পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সে সকলেরই তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। এইরূপে আত্মায় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা আরোপ করিয়া বেদান্ত আত্মাকে অর্থাৎ আমাকে ঈশ্বর এই নাম দিয়েছেন। এখন বলা বাহুল্য, এই বেদান্তের ঈশ্বর খ্রীষ্টান-সমাজের বা ব্রাহ্মসমাজের স্বীকৃত ঈশ্বর নহেন। নৈয়ায়িকাদি ঐশ্বরকারণিক দার্শনিকেরা জীব হইতে স্বতন্ত্র যে জগৎকারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, এ ঈশ্বর সে ঈশ্বরও নহেন। বৈষ্ণবদিগের ভাষা সকল সময়ে বুঝা যায় না। বৈষ্ণব দার্শনিকেরা অনেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত জীবের ভিন্নত্ব ও সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এরূপ ভাষায় কথা কহিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন বেদান্ত-স্বীকৃত আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহতত্ত্বের সহিত বৈদান্তিক অদ্বয়তত্ত্বের সমন্বয়-চেষ্টা দেখিয়াছি। তবে বৈষ্ণব-সমাজের আচার্য্যগণের নিকট এই সমন্বয় চেষ্টা অনুমোদিত হইবে কি না, জানি না। অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, অদ্বয়মতে আমিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের স্রষ্টা,

বিধাতা ও সংহর্ত্তা। পরিদৃশ্যমান চরাচরের "জন্মাদি" আমা হইতেই।

এইরূপে বেদান্ত আত্মায় জগৎকারণত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে ঈশ্বরপদবাচ্য করেন ও সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি তাহাতে অর্পণ করেন। আবার অন্য দিকে সেই বেদান্তই আত্মাকে সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত নিরুপাধিক শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এই একটা মহা সমস্যা। আত্মাকে নিরুপাধিক বলার তাৎপর্য্য আগে বুঝা যাউক। আমি আছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। ইহা আমার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সেই আমি কিংস্বরূপ, আমি কেমন, ইহা বুঝাইবার ও বলিবার ভাষা পাওয়া যায় না। কেন না, যাহা কিছু জ্ঞানগম্য, তাহাই ভাষা দ্বারা প্রকাশযোগ্য ও বর্ণনীয়; কিন্তু যাহা জ্ঞানগম্য, তাহা বিষয় শ্রেণীভুক্ত, তাহা বিষয়ী নহে। কাজেই আত্মার অর্থাৎ বিষয়ীর যদি কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে আত্মা বিষয়ী না হইয়া, বিষয়ের অন্তর্গত হয়ে পড়ে। কাজেই কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম, ভাষায় বর্ণনীয় কোন গুণ আত্মায় আরোপ করা চলে না। কাজেই ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপে আত্মার বর্ণনা করিতে হয়। বাক্য মনের সহিত আত্মার সন্ধানে চলিয়া আত্মাকে না পাইয়া আত্মার স্বরূপ প্রকাশে অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়। বড়-জোর, তাহা বিশুদ্ধ চেতনাস্বরূপ, এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু সেই চেতনা আবার কি, তাহা বুঝান চলে না।

এইরূপে বেদান্ত আত্মাকে নির্গুণ নিরুপাধিক অনির্ব্বাচ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। হিউমের ন্যায় প্রপঞ্চ-মাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিয়া বলেন, যাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না, বুঝি না, বুঝাইতেও পারি না, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার বৃথা জল্পনা। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রায় সেই কথাই বলেন। তিনি বলেন, যদি বাস্তবিকই সেইরূপ কোন অনির্দ্দেশ্য পদার্থ থাকে, ও তাহার নামকরণ নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহাকে শূন্য বলাই ভাল। বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, উহাকে শূন্য বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। শূন্য বলারও যে ফল, নাস্তি বলারও সেই ফল। উহা নাস্তি, ইহা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। উহা নাস্তি নহে; আমি জানিতেছি, উহা অস্তি; উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসংশয় নহি। অথচ উহা কেমন, তাহা ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

ভাষা দ্বারা বর্ণনীয় নহে, বুঝাইবার ভাষা পাইনা, অতএব নাই—নাস্তিকগণের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ। বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে পারি না, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। একটা মোটা উদাহরণ দিব। মনে কর, সবুজ রঙ; সবুজ রঙ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি; উহা আমার একটি পরিচিত প্রত্যয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে সবুজ রঙ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার কোন আশা নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অন্ধ নহে, অথচ সবুজ রঙ কখনও দেখে নাই, তাহাকেও আমি বর্ণনা দ্বারা সবুজ রঙ কি, তাহা বুঝাইতে পারিব না। তবে একটা গাছের পাতা তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাই সবুজ রঙ। জন্মান্ধকে যেমন রঙ বুঝান যায় না, তেমনই জন্মবধিরকে শব্দ বুঝান চলে না। সেইরূপ চেতনা কি, তাহা

আমি জানি, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি উপলব্ধি করি; উহার একটা নাম দিতেও পারি; কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে পারি না। হিউমের মত যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন নাই, আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করাইতে পারি না। আবার আত্মা যদি একের অধিক বহু থাকিত, যদি আত্মার সদৃশ বা সমধর্ম্মা অন্য কিছু থাকিত, তাহা হইলেও সেই বস্তু নাস্তিককে দেখাইয়া বলা যাইতে পারিত যে, এই আত্মা, অথবা আত্মা ইহারই মত। কিন্তু আত্মা বহু নহে; উহার সদৃশ বা সমধর্ম্মা অন্য কোন বস্তু নাই; উহা এক অদ্বিতীয় চেতন পদার্থ; জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। আমি এক জন বই দুইজন হইতে পারি না। কাজেই যত ক্ষণ কেহ না বুঝিবে, তত ক্ষণ উহার স্বরূপ বুঝাইতে পারিব না।

তবে গোল এই যে, বেদান্ত এক মুখে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অন্য মুখে আবার তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া বিবৃত করেন, এ কিরূপ? এই দ্বিবিধ উক্তির সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ঐ প্রকাণ্ড উপাধি বর্ত্তমান থাকিতে আত্মাকে নিরুপাধিক বলিব, এ কি ব্যাপার? একবার বলিতেছি, আমি জগতের স্রষ্টা; আবার বলিতেছি, আমি সর্ব্বগুণবর্জ্জিত; এ কিরূপ ব্যাপার?

বেদান্ত এইরূপে উত্তর দেন। বেদান্ত বলেন, এই সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি ভূয়া উপাধি—উহা অধ্যাস। যাহা যা নয়, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নহে; উহাকে সর্প মনে করা অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ। আত্মায় কোন গুণ নাই, কোন উপাধি নাই, উহাতে যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উপাধি আরোপ করা হয়, উহাও অধ্যাস বা মিথ্যা ধর্ম্মের আরোপ। রজ্জু সর্পের মত দেখাইলেও উহা সর্প হয় না; আত্মা সোপাধিক দেখাইলেও উহা সোপাধিক হয় না; প্রকৃত পক্ষে উহা নিরুপাধিক। উপাধি কেবল ভ্রম।

কি সর্ব্বনাশ! প্রতিপক্ষ বলিবেন, তবে এত ক্ষণ ধরিয়া এত দুন্দুভিধ্বনি সহকারে প্রতিপক্ষ সহ এত বিতণ্ডার পর, আত্মাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া সপ্রমাণ করিবার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল? এই যে প্রতিপাদন করিলে, বিশ্ব-জগতের কর্ত্তা আর কেহ নহে, আমি স্বয়ং; বিশ্ব-জগতের আমিই সৃষ্টি করিয়াছি; আমিই আমার উদ্দেশ্যানুরূপ করিয়া চালাইতেছি; এ সব কি নিরর্থক? এতক্ষণ বলিতেছিলে সত্য, যখন বলিতেছ মিথ্যা; তোমার কথার অর্থগ্রহই দায় হইল। তোমার কোন কথাটা গ্রহণ করিব?

বেদান্তী বলেন, বন্ধু হে, একটু স্থির হও। আমার ভাষাটা হেঁয়ালি-গোছের হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে হেঁয়ালি থাকিবে না। ভাষাটা বড় অদ্ভুত জিনিব; সত্য মিথ্যা এই শব্দ দুটাই অনেক সময় গণ্ডগোল বাধায়। যাহাকে সত্য বলা যায়, তাহা এক হিসাবে সত্য, অন্য হিসাবে মিথ্যা। যাহাকে মিথ্যা বলা যায়, তাহা একার্থে মিথ্যা, অন্য অর্থে সত্য। মনে কর মরীচিকা—মরুভূমিতে জলভ্রম—ইহা সত্য, না মিথ্যা? এক হিসাবে ইহা সত্য। যাহাকে আমরা জল বলি, তাহা একটা প্রত্যয় মাত্র বা কতিপয় প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত্র—কতিপয় প্রত্যয় যুগপৎ বুদ্ধির সমীপস্থ

হইলে উহাকে জল বলা যায়। বস্তুতঃ জল বলিয়া আমার বাহিরে কিছুই নাই। কিন্তু জলবুদ্ধি আছে; জলের প্রত্যয়টা আছে। মরীচিকাতে যে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে, উহা জলেরই প্রত্যয়। যতক্ষণ ঐ প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা জলেরই প্রত্যয়—যে প্রত্যয়সমষ্টিকে আমি জল নাম দিই, উহা সেই প্রত্যয় সমষ্টি। কাজেই উহা সত্য। অন্ততঃ যত ক্ষণ মরিচীকা থাকে, যত ক্ষণ ঐ জল-প্রত্যয় থাকে, তত ক্ষণ উহা সত্য। তারপর যখন অন্য প্রত্যয় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপ্রত্যয়কে ধ্বংস করে, জলপ্রত্যয় নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বলা যায়, ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয় মিথ্যা। যতক্ষণ ঐ জলপ্রত্যয় ছিল, ততক্ষণ উহা সত্যই ছিল; ততক্ষণ তুমি মাথা খুঁড়িলেও আমি উহাকে জলের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য প্রত্যয় বলিতাম না। এখন যখন সে প্রত্যয় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত আছি। এত ক্ষণ উহাকে সত্য বলিতেছিলাম; কিন্তু এখন জানিতেছি উহা স্থায়ী সত্য নহে, উহা তাৎকালিক সত্য। যাহা স্থায়ী সত্য নহে, তাহাকে তৎকালে যে সত্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারই নাম অধ্যাস। এখন নূতন প্রত্যয় আবির্ভাবের পর নূতন বুদ্ধির উদয় হইয়াছে; অধ্যাস কাটিয়া গিয়াছে। সেইরূপ রজ্জুকে যখন সর্প বোধ হয়, ঐ বোধও একটা প্রত্যয়; তৎকালে উহা সত্য। কিন্তু সর্পবুদ্ধি কাটিয়া গেলে জানিতে পারি, ঐ বুদ্ধি তাৎকালিক সত্য মাত্র। এইরূপ স্বপ্ন এক হিসাবে সত্য, অন্য হিসাবে মিথ্যা। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই থাকে না। কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; কিন্তু প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত হইলে সে অধ্যাস যায়; তখন উহা যে সত্য নহে, তাহা জানিতে পারি।

আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গেলেও সত্য মিথ্যা ঠিক এইরূপেই বুঝিতে হইবে। এই যে জড় জগৎ, যাহা আমার বাহিরে আমি দেখি, উহাও একার্থে সত্য, অন্য অর্থে সত্য নহে। যতক্ষণ উহাকে আমি আমার বাহিরে আমা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দেখি, ততক্ষণ উহা সত্য—কাহার সাধ্য উহাকে মিথ্যা বলে। তখন উহা সত্য—উহা তাৎকালিক সত্য—উহা ব্যবহারিক সত্য—কেন না, উহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ বুদ্ধিগোচর প্রত্যয়ের সমষ্টি। উহার এই সত্যতা স্বীকার করিয়াই আমার জীবনযাত্রা চলিতেছে; নতুবা আমার জীবন কোথায় থাকিত; আমার প্রাণযাত্রাই অসম্ভব হইত। যতক্ষণ উহাকে ঐরূপ সত্য মনে করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্য, উহা কোথা হইতে আসিল বুঝাইবার জন্য, উহার নির্ম্মাতার, উহার সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব কল্পনা আবশ্যক হয়। তা ত হইবেই। উহা যখন সত্য—তাৎকালিক সত্য—তখন উহার উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ অনুসন্ধান করতেই হইবে। তখন আমরা অন্য কারণের সন্ধান না পাইয়া, প্রচলিত কারণের অসঙ্গতি দেখাইয়া, আত্মাকেই উহার কারণ, আত্মাকেই জগতের স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যত ক্ষণ এই জগৎ সুব্যবস্থ সুনিয়ত উদ্দেশ্যানুযায়ী বৃহৎ যন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, তত ক্ষণ যাহাকে সেই যন্ত্রের নির্ম্মাতা ও চালক মনে করা যায়, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হই। অচেতন জড় জগৎ যখন আপনাকে আপনি কোন উদ্দেশ্যমুখে চালাইতে পারে না, তখন যে একমাত্র চেতন পদার্থকে আমি জানি, সেই চেতন আত্মাকেই

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করি। জড় জগৎ যে হিসাবে সত্য, আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও ঠিক সেই হিসাবে সত্য। ইহাতে বিস্ময় প্রকাশের কারণ নাই।

কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড় জগৎ স্বপ্নসদৃশ, ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে পারি যে উহা একটি অধ্যাস মাত্র। যাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাতে যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছি, তখন সেই আরোপ কেবল অধ্যাস। তখন বুঝিতে পারি যে, যাহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, উহা তাৎকালিক ব্যবহারিক সত্য মাত্র, স্থায়ী পারমার্থিক সত্য নহে। সেই কল্পিত জগতে যে নিয়মের, যে ব্যবস্থার, যে উদ্দেশ্যে অস্তিত্ব দেখিতেছিলাম, জগৎই যখন কল্পনা; তখন সে সকলই কল্পনা। জগৎ যখনই অধ্যাস, সে সকলই তখন অধ্যাস। তখন সেই মিথ্যা জগতের স্রষ্টা বিধাতা নিয়ন্তা কল্পনারই বা প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাহার আবার সৃষ্টি কি? তাহার আবার নিয়ন্তা কি? ঐ সকল বিশেষণ তখন অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়।

বন্ধ্যার পুত্র যেমন অর্থশূন্য, অস্তিত্বহীন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা তেমনিই অর্থশূন্য। জ্ঞানোদয়ে এই অর্থশূন্যতা বুঝিতে পারি। তখন আর আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপের আবশ্যকতা থাকে না। জগৎকে সত্য ধরিয়াই আত্মাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতেছিলাম। জগতের সত্য যখন ব্যাবহারিক সত্য হইল, তখন আত্মারও ঈশ্বরত্ব ব্যাবহারিক ভাবে সত্য। লোক-ব্যবহারের জন্য, জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য, আমি জগৎকে সত্য ও আত্মাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। জগৎকে যদি সত্য বল, আত্মাকেই উহার কর্ত্তা বলিতে হইবে। অন্য কর্ত্তা কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন অধ্যাসের লোপ হয়, তখন জগৎকেই মিথ্যা বলিয়া জানি, তখন আত্মাতে আর জগতের কর্ত্তৃত্ব আরোপের প্রয়োজন থাকে না। যাহা নাই, তাহার আবার কর্ত্তা কি? কাজেই ব্যাবহারিক হিসাবে আত্মা কর্ত্তা ও সোপাধিক; পরমার্থতঃ আত্মা কর্ত্তৃত্বহীন, নির্গুণ ও নিরুপাধিক।

বেদান্ত-মতে আমি পরমার্থতঃ উপাধিশূন্য, কিন্তু ব্যাবহারতঃ উপাধিযুক্ত। এক ভাবে দেখিলে আমার কোন গুণ নাই; কর্ত্তৃত্ব পর্যন্ত নাই; অন্য ভাবে দেখিলে আমিই জগৎকর্ত্তা। এই জগৎ কর্ত্তৃরূপ উপাধি, যাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মৎ-কল্পিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করি, ইহার পারিভাষিক নাম মায়া। বেদান্তের ভাষায়, আত্মা মায়োপাধিক হইলে ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ আমি আমাতে মায়া নামক উপাধি আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি। ঐন্দ্রজালিককে মায়াবী বলে; সে ব্যক্তি যে ক্ষমতায় দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া শূন্যমধ্যে ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করে, কাটা মুণ্ডে কথা কহায়, আমগাছে নারিকেল ফলায়, সেই ক্ষমতার নাম মায়া। বাহ্য জগৎ এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল; কাজেই যে পুরুষ সেই ইন্দ্রজাল উৎপন্ন করে, সে মায়াবী, সে মায়া নামক উপাধিযুক্ত। ঐন্দ্রজালিকের উৎপাদিত ঐ সকল অদ্ভুত দৃশ্যের বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই; ঐন্দ্রজালিকেরও বস্তুগত্যা আমগাছে নারিকেল ফলাইবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞ লোকে ঐন্দ্রজালিকে যে অলৌকিক ক্ষমতা

অর্পণ করে, ঐন্দ্রজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই নাই। তবে যে সে ঐরূপ আশ্চর্য্য কৌশল দেখায়, তাহা দর্শকগণেরই অজ্ঞতার ফল। যে জানে, সে ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় প্রতারিত হয় না; সে ঐ সকল কৌশলকে দৃষ্টিভ্রম বলিয়াই জানে ও ঐন্দ্রজালিককেও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করে না। সেইরূপ আত্মা যে জগতের সৃষ্টি করে, সে জগৎও অলীক পদার্থ; যে ইহা জানে না, সে প্রতারিত হয়; তাহার নিকট আত্মা মায়াবী, অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পদার্থ; আর যে জগৎকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া জানে, সে জানে যে, আত্মায় ঐরূপ ক্ষমতার আরোপ আবশ্যক নহে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ও উপাধিশূন্য। যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে না, সে বদ্ধ; আর যে জানিয়াছে সে মুক্ত।

বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি, তাহা এখন বুঝা যাইবে। উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা বুঝা গেল। বিষয় একটা অধ্যাস; উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে। বিষয়ীর ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ অস্তিত্বই আছে: তবে ব্যবহারতঃ উহা মায়াবলে বিষয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্; কিন্তু পরমার্থতঃ উহা উপাধিরহিত নিষ্ক্রিয় কর্তৃত্বহীন। এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ হইতে পারে? আমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অধীন সসীম সঙ্কীর্ণ সুখদুঃখভোগী জরামরণশীল ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহা অধ্যাস মাত্র। প্রকৃত সম্বন্ধ ঠিক ইহার বিপরীত। আমিই বরং জগতের স্রষ্টা, নিয়ন্তা, বিধাতা বলিলে ঠিক হয়। আমিই জগৎকে ঐরূপ ভাবে গড়িয়াছি ও ঐরূপ ভাবে চালাইতেছি, তাই জগৎ ঐরূপ দেখায় ও ঐরূপ চলে; এইরূপ বলিলে বরং ঠিক হয়। কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পরমার্থতঃ আমি ঐরূপ কিছুই করি না। আমি ঐরূপ করি বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধ মাত্র; আমি কিছুই করি না। ঐন্দ্রজালিক কাটা মুণ্ডে কথা কহায় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহাও বোধ মাত্র; ঐন্দ্রজালিক তাহা করে না। অতএব আমি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ জীব।

এ পর্য্যন্ত যে আত্মার কথা বলা গেল, যাহাকে বিষয়ী বা জীব, এই নাম দেওয়া হইল, সে আমি, আর কেহই নহে। আমিই এক মাত্র জীব; এবং এই জীবই ব্রহ্ম, এই আমিই ব্রহ্ম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জীবাত্মাই যদি এক মাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ, জীবই যখন ব্রহ্ম, তখন আবার পরমাত্মা নামটা বেদান্তের ভাষায় ব্যবহৃত হয় কেন? আত্মা বা জীবাত্মা বা জীব শব্দ ব্যবহারেই যখন সকল কাজ চলে, তখন পরমাত্মা নামক আর একটা আত্মার কল্পনা করিয়া শেষে সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ প্রতিপাদনরূপ উৎকট পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পরমাত্মার নাম আদৌ উঠে কেন? পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, তবে পরমাত্মা এই পৃথক্ নামকরণের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন কি, তাহা শারীরক ভাষ্যের আরম্ভেই একটি কথা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। ভাষ্যকার যাবতীয় পদার্থকে বিষয়ী ও বিষয় এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—বিষয়ী আমি, আর বিষয়ী আমা-ছাড়া আর সব। এই দুইয়ের সম্বন্ধ

আলো আর আঁধারের মত সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যাহা বিষয়ী, তাহা বিষয় নহে; যাহা বিষয়, তাহা বিষয়ী নহে। যে দেখে, সে-ই বিষয়ী; যাহা দেখা যায়, তাহা বিষয়। কিন্তু তার পরেই ভাষ্যকার বলিতেছেন—এই বিষয়ী অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আমি যেমন তোমাকে জানি, রামকে জানি, শ্যামকে জানি, তেমনই আমি আমাকেও জানি। আমাকে আমি জানি না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। আমি এক দিকে জ্ঞাতা, অন্য দিকে আমি আমারই জ্ঞেয়; আমিই আমার অহংবৃত্তির গোচর। যাহা জ্ঞানগম্য, যাহা জানা যায়, তাহাকেই যদি বিষয় বলা যায়, তাহা হইলে আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। পাশ্চাত্য দর্শনেও Ego নামক আমাকে দুই দিক্ দিয়া দেখা হয়। এক দিক্ হইতে বলা হয় Empirical Ego—অর্থাৎ বিষয় আমি; অন্য দিক্ হইতে বলা হয় Pure Ego বা Transcendental Ego—অর্থাৎ বিষয়ী আমি। বেদান্ত শাস্ত্রে এই বিষয় আমার বা জ্ঞানগম্য আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা; আর এই বিষয়ী আমার বা জ্ঞাতা আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা।

এই উভয় আমার পরস্পর সম্বন্ধ কি? বলা বাহুল্য, ইনিও যে আমি, উনিও সেই আমি। আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা আমি ও কর্ম্ম আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি। ইহাতে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা নাই। অথচ অন্য ভাবে দেখিলে উভয়কে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিরূপে, দেখা যাক।

আত্মা একাধারে বিষয়ী ও বিষয়—ভাষ্যকারের এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। এই বিষয়ী আত্মার নাম পরমাত্মা ও বিষয়রূপে প্রতীয়মান আত্মার নাম জীবাত্মা। আমিই আমাকে দেখি; যে আমি দেখে, সে আমি পরমাত্মা; যে আমাকে দেখা যায়, সে আমি জীবাত্মা। এই জ্ঞাতা আমি নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়; আর জ্ঞানের বিষয় আমি পরিবর্ত্তনশীল, বিকারশীল, জড়ের ঘাতপ্রতিঘাতে মুহ্যমান, জড় জগৎ কর্ত্তৃক অভিভূয়মান, জরামরণশীল, কর্ম্মপর, সংসারে ভ্রমমাণ। এইরূপে দেখিলে উভয়ে ভিন্ন: আবার উভয়েই এক। পরমাত্মাও যে, জীবাত্মাও সে, বেদান্তের এই কথাটার উপরেই দ্বৈতবাদীর যত আক্রোশ। কিন্তু আক্রোশের কোন কারণই নাই। পূর্ব্বেই বলা গিয়েছে যে, দ্বৈতবাদী হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করেন। অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির সরল অর্থ যে বিষয়ী আমি ও বিষয় আমি একই ব্যক্তি। যে দেখে ও যাহাকে দেখে, সে একই ব্যক্তি। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমিই আমাকে দেখি, এখানে দেখা ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়েই এক অভিন্ন ব্যক্তি। ইহারই নাম অদ্বয়বাদ। আমি এক জন ব্যতীত আর দুই জন নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ইংরেজীতে personal identity নামে একটা কথা আছে। উহার অর্থ কালিকার আমি ও আজিকার আমি একই ব্যক্তি। কিন্তু এই ঐক্য জ্ঞেয় আমার ঐক্য; জ্ঞাতা আমার ঐক্য নহে। কাল আমি আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি না, অথচ বস্তুতঃ সেই আমি অবিকৃত আছি, ইহা বুঝানই ঐ

উক্তির তাৎপর্য্য।

উভয়েই এক ; কেন না, কালও যে আমি ছিলাম, আজও ঠিক সেই আমিই আছি। দেখিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ের ঐক্যে কেহ সন্দেহ করেন না। বাল্যের আমি ও যৌবনের আমি ও আজিকার বৃদ্ধ আমি, একই আমি ; সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। বোধ হইতেছে যেন আমার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বেও যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি।

জ্ঞেয় আমার বিকার সত্ত্বেও এই ঐক্য অর্থাৎ personal identity কিরূপ ঐক্য, তাহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই ঐক্যকে ঐক্য বলা যাইতে পারে না। কাল যে গাছটি দেখিয়াছিলাম, আজও সেই গাছটি দেখিয়া আমি বলি, উহা সেই একই গাছ। কালিকার গাছে ও আজিকার গাছে এই ঐক্য প্রকৃত ঐক্য নহে। কাল উহাতে যে পাতা, যে ফুল জন্মিয়াছিল, আজ তাহা নাই ; কাল উহাতে যটা ডাল ছিল, তাহা আজ নাই ; ঝড়ে একটা ডাল ভাঙ্গিয়াছে। কালিকার গাছ ও আজিকার গাছ সর্ব্বাংশে এক নহে, উহা অংশতঃ এক। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; তবে ঐ পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়াছে। এক বারে অধিক পরিবর্ত্তন হইলে হয়ত বলিতাম, এ গাছ সে গাছ নহে, তাহার স্থলে আর একটা গাছ কেহ বসাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ক্রমিক পরিণতি, এই আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখিলে আমরা তাহা না বলিয়া বলি, সেই গাছই আছে। কিন্তু বস্তুতঃ সেই গাছ নাই। কাজেই কালিকার গাছের ও আজিকার গাছের ঐক্য সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। সেইরূপ কালিকার আমার ও আজিকার আমার ঐক্য পূরা ঐক্য—ষোল আনা ঐক্য—নহে। কালিকার আমি এবং আজিকার আমি, কখনই সর্ব্বতোভাবে এক আমি নহে। কাল আমি সুখী ছিলাম, আজ আমি দুঃখী ; কাল আমি ধনী ছিলাম, আজ গরীব ; কাল মূর্খ ছিলাম, আজ পণ্ডিত। তবে কতক মিলও আছে। কালিকার আমায় যে-যে গুণ ছিল, আজিকার আমায় তাহার অনেক আছে, তবে সব নাই। কাজেই জ্ঞেয় আমার এই ঐক্য পূর্ণ ঐক্য নহে, উহা আংশিক ঐক্য। আমার এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে, ক্রমশঃ ঘটিয়াছে ; সেই জন্য আমি বলি, সে আমি ও এ আমি এক আমি। কিন্তু এই একের অর্থ প্রায় এক ; পূরা এক নহে।

আজ আমি যেমন আছি, কাল আমি কি ঠিক তেমনটি ছিলাম ? আমার স্মৃতি কি বলে ? আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে, কাল আমি দুঃখে অভিভূত ছিলাম ; শোকে ম্রিয়মাণ ছিলাম ; আজ আমার সে অবস্থা নাই। সে অবস্থার স্মৃতি আছে বটে ; কিন্তু দুঃখের সে তীব্রতা নাই। আবার কাল আমার জ্ঞানের সীমা যত দূর বিস্তৃত ছিল, আজ তদপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে আমি ম্যাকবেথ পড়িয়া ফেলিয়াছি ; ইতোমধ্যে জয়চন্দ্র ও শ্যামচাঁদের সহিত আমার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে, ইতোমধ্যে আমি দূরবীন দিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি ; ইতোমধ্যে আমি রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়া উল্লসিত হইয়াছি। এইরূপ চারি দিক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কালিকার আমি আর আজিকার

আমি ঠিক সমান নহি। কাল আমার সহিত জগতের ঘাত-প্রতিঘাত যেরূপ চলিয়াছিল, আজ ঠিক সেরূপ চলিতেছে না। কাল আমি আমাকে যে ভাবে যে মূর্ত্তিতে জানিতাম, আজ আমি আমাকে ঠিক সে ভাবে সে মূর্ত্তিতে জানিতেছি না। এইরূপ বাল্যকালের আমাতে ও যৌবনের আমাতে ও বার্দ্ধক্যের আমাতে, সুস্থ আমাতে ও রুগ্ন আমাতে, সুখী আমাতে ও দুঃখী আমাতে প্রচুর প্রভেদ। এই প্রভেদ আমার জ্ঞানগম্য। অতি শৈশবকালে যখন আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম, সে কালের স্মৃতিটুকু সে কালের আমার যে অস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে, সেই আমি ও আজকার প্রৌঢ় দৃপ্ত কর্ম্মপর আমি কত ভিন্ন। তার আগে আরও শৈশবে আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা ত মনেই হয় না; স্মৃতি কোন কথাই বলে না; অথচ তখনও আমি ছিলাম। কেমন ছিলাম, ঠিক বলিতে পারি না; আজিকার মত ছিলাম না, তাহা নিশ্চয়। কাজেই যে আমি আমার জ্ঞানগোচর, সে আমি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল: সে আমি কাল এক রকম ছিলাম, আজ অন্য রকম আছি: সম্ভবতঃ আগামী কাল অন্যরূপ হইব। ক্ষণে ক্ষণে সেই আমার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কোন দুই ক্ষণে সে আমার মূর্ত্তি ঠিক এক রকম থাকে না। বলা বাহুল্য যে, এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আমি বিষয় আমি। এই আমি আমার জ্ঞানগম্য; ইহাকে আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, মনে করিতেছি। এই জ্ঞেয় আমার বৈদান্তিক নাম জীব। জীব নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, এবং এই পরিবর্ত্তনের হেতু অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাহ্য জড় জগতের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতই তাহার এই বিকারের হেতু। বাহ্য জগতের অধীন বলিয়াই জীব কখনও সুখী, কখনও দুঃখী কখন মূর্খ, কখন পণ্ডিত, কখন দুর্ব্বল, কখন সবল, কখন শিশু, কখন বৃদ্ধ। জীবের এই বিকার পরম্পরা সত্য বলিয়া এখন মানিয়া লওয়া গেল।

কিন্তু তার পরে প্রশ্ন, জ্ঞেয় আমি সবিকার, কিন্তু জ্ঞাতা আমিও কি সবিকার? যে আমি আমার এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী, যে ইহা বসিয়া বসিয়া দেখিতেছে, তাহারও কি বিকার আছে, তাহারও কি পরিবর্ত্তন আছে? সেও কি জড় জগতের অধীন?

ইহার স্পষ্ট উত্তর—না। কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়া জীবের এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা ঘটিতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই। এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বিষয় আমার পশ্চাতে আর এক আমি বসিয়া বসিয়া স্থির ভাবে এই সকল পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেছে—সেই আমার স্পন্দন নাই, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার নাই, পরিবর্ত্তন নাই। সে বসিয়া বসিয়া এই বিষয় আমার নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখিতেছে,—নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, নির্বিকার ভাবে দেখিতেছে;—এই নিত্য পরিবর্ত্তনের সে চিরন্তন বিনিদ্র সাক্ষী, অথচ এই পরিবর্ত্তন ঘটনায় সে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই নিষ্ক্রিয় নির্বিকার উদাসীন সাক্ষী আমি, বিষয়ী আমি: সে সর্ব্বদা বিষয় আমাকে নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াছে। জড় জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে বিষয় আমি নাচিতেছি, কাঁদিতেছি, হাসিতেছি—কখন চেতন ও জাগ্রত, কখন স্বপ্নাবস্থ, বা সুষুপ্ত-ক্রীড়াপর, কর্ম্মশীল,—দুঃখী সুখী,-রাগী দ্বেষী ঈর্ষী ঘৃণী,—এখন এমন, তখন তেমন,—কাল এইরূপ, আজ অন্যরূপ;—কিন্তু বিষয়ী আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ,

সদা জাগ্রত থাকিয়া এই ক্রীড়ার, এই চাঞ্চল্যের, এই বিকারের নিত্য সাক্ষী রহিয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রে এই বিষয়ী আমার নাম পরমাত্মা।

বিষয় আমি ও বিষয়ী আমি, উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা যথাশক্তি বুঝাইলাম। বিষয় আমি আজ যেমন আছে, কাল তেমন ছিল না; যৌবনে যেমন, বাল্যে তেমন ছিল না, শৈশবে আবার অন্যরূপ ছিল। জন্মের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না, কে বলিতে পারে? যদি থাকে, কিরূপ ছিল, তাহা আমি জানি না। শৈশবের অতি অস্পষ্ট স্মৃতি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু জন্মান্তর যদি থাকে, সেই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি এখন কিছুই নাই। কেহ হয়ত বলিবেন, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার আছে; অন্যে বলিবেন, প্রমাণ নাই। তখন আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চ শত বৎসর পূর্ব্বে আমি কেমন ছিলাম, আমি ছিলাম, কি ছিলাম না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অথচ সেই পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চ শত বৎসর পূর্ব্বে বিষয়রূপী জড় জগৎ কিরূপ ছিল, তাহা আমি কতক বলিতে পারি। প্রত্যক্ষ প্রমাণে বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমানবলে বা শব্দপ্রমাণবলে বলিতে পারি। সে সময়ে আমার জন্মের পূর্ব্বে, জগতের মূর্ত্তি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হইতেছিল, কোথায় কি ঘটিতেছিল, তাহা আমার জ্ঞানের বিষয়। তাহা আমি, বিষয়ী আমি—এখান হইতে অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ঐ ক্লাইব পলাশী বাগানে লড়াই করিতেছেন, ঐ জয়চন্দ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন,—ঐ দিগ্বিজয়ী সেকন্দার সসৈন্যে সিন্ধু নদ পার হইতেছেন, ঐ আর্য্যগণ হল স্কন্ধে গোধন সঙ্গে ভারত প্রবেশ করিতেছেন,—ঐ ধরাপৃষ্ঠে মাষ্টোডন মেগাথীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই,—ঐ মহাসাগরে বৃহৎ কুম্ভীর, বৃহৎ মীন চরিয়া বেড়াইতেছে, স্তন্যপায়ী তখনও আবির্ভূত হয় নাই; ঐ উত্তপ্ত ধারাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পে আন্দোলিত হইতেছে, তখন প্রাণীর আবির্ভাব হয় নাই; ঐ সৌরনীহারিকা সৌরজগতের পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ঘূর্ণমান, কেহ তাহা দেখিবার নাই; কিন্তু আমি এখান হইতে বসিয়া বসিয়া মনশ্চক্ষুতে তাহা দেখিতেছি;—আমি জড় জগতের এই কল্পব্যাপী পরিবর্ত্তনের সাক্ষী। বিষয়ী আমি এইখানে বসিয়া নির্ব্বিকার ভাবে নির্নিমেষে, উদাসীনের ন্যায় বিষয় আমার অতীত যৌবনের, অতীত শৈশবের, রাত্রিদিন ধুক ধুক তরঙ্গিত সুখ দুঃখ' এর অবেক্ষণ করিতেছি। আবার বিষয় আমি যখন ছিলাম না, অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকানা নাই, তখন বিষয় জড় জগৎ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিরূপে ঘুরিতেছিল, ফিরিতেছিল, অভিব্যক্ত হইতেছিল, তাহাও এখানে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি। সে কোন্ কালের কথা চন্দ্রমণ্ডল তখন ছিল না—সূর্য্যমণ্ডল তখন ছিল না—আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত না—অচেতন ঘূর্ণমান জড় নীহারিকা, তাহাও হয়ত তখন ছিল না—আসীদিদং তমোভূতং—সেই জগতের আদিম অবস্থা—তার পর কত কাল অতীত হইয়া গেল, মাস গেল, অব্দ গেল, যুগ গেল, কল্প গেল, আমি এইখানে বসিয়া নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় প্রশান্ত নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ—স্বয়ংপ্রকাশ চেতনাস্বরূপ আমি এইখান হইতে এখনই সমস্ত দেখিতেছি; সমস্ত অতীতের আমি সাক্ষী—আমি বিষয়ী—আমি আত্মা—আমি

পরমাত্মা—আমি ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মাস্মি।

এখন বেদান্তের অভিপ্রায় অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জড় জগৎ ত বিষয়,—উহা অধ্যাস—উহা মায়া। কাহার মায়া? উত্তর, আমার মায়া। আমার অস্তিত্ব আমি যত সহজে মানিব, জড় জগতের অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না। কিন্তু সেই আমিই বা কিং-স্বরূপ? বেদান্ত বলেন, আমারও দুই মূর্ত্তি—আমিও একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। আমি আমাকেই দেখি। যে দেখে, সে বিষয়ী; যাহাকে দেখে, সে বিষয়। যে বিষয়ী, তাহার নাম দাও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম; যে বিষয়, তাহার নাম দাও জীবাত্মা বা জীব। জীবাত্মা বিকারশীল, জড় জগতের অধীনতায় উহাতে কেবলই বিকার ঘটিতেছে। পরমাত্মা নির্ব্বিকার, সে জীবাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার এই বিকারপরম্পরা উদাসীন ভাবে দেখিতেছে। অতএব দুই ভিন্ন বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয়। অথচ দুই অভিন্ন। দুই আমিই এক আমি। আমি আমাকে দেখি, এ স্থলে যে কর্ত্তা, সে-ই কর্ম্ম। আমি আমাকেই দেখি—অন্য কাহাকে দেখি না। আমি যখন সুখী হই, তখন আমি আমাকেই সুখী মনে করি, অন্যকে সুখী মনে করি না। ইহা অতি সহজ কথা। দ্রষ্টা আমি ও দৃশ্য আমি, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, ব্রহ্ম ও জীব, উভয়ই এক, সর্ব্বতোভাবে এক। ইহাই জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ। ইহাই অদ্বয়বাদ। অদ্বয়বাদ আর কিছুই নহে। ইহাতে রাগ করিবার কিছুই নাই।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে উইলিয়ম জেম্‌সের নাম সুবিখ্যাত। ইনি এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব। আশা করি, বেদান্তের অভিপ্রায়, যাহা বুঝাইবার জন্য এত ক্ষণ চেষ্টা করা গেল, তাহা যদি এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে; তাঁহার Textbook of Psychology গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে এই আত্মতত্ত্বের বিচার আছে। তিনি গোড়াতেই আরম্ভ করিয়াছেন—"Whatever I may be thinking of, I am always at the same time more or less aware of *myself* of *my personal existence.* At the same time it is I who am aware; so that the total self of me, being as it were duplex, partly known and partly knower, partly object and partly subject, must have two aspects discriminated in it, of which for shortness we may call one the *Me* and the other the *I*" (পৃ. ১৭৬)। ইহার তাৎপর্য্য—আমি যেমন অন্য বিষয় জানি, তেমনই আমাকেও জানি। এবং সে কে জানে? আমিই জানি। জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম আমার নাম দেওয়া হইল Me—বেদান্তের বিষয় আমি অথবা জীব। আর কর্ত্তা আমার নাম হইল I—বিষয়ী আমি অথবা ব্রহ্ম। তৎপরে বলিতেছেন,—"I call these 'discriminated aspects', and not separate things, because the identity of *I* with *Me*, even in the very act of discrimination, is perhaps the most ineradicable dictum of common sense, and

must not be undermind by our terminology here" (পৃ. ১৭৬)। অর্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি একই আমি—ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিলেও উহারা ভিন্ন নহে—ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন হইতে পারে না। ইহাই বেদান্তের অদ্বয়বাদ। বেদান্তও বলেন, যে জীব, সেই ব্রহ্ম। জ্ঞেয় আমি জীব ও জ্ঞাতা আমি ব্রহ্ম; কিন্তু উভয়ই এক। দুইটা নাম দিয়াছি বলিয়া দুই নহে।

ঐ জ্ঞেয় আমার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে, এই জ্ঞেয় আমার ঐক্য—Personal identity—পূরা ঐক্য নহে। এই জ্ঞেয় আমি বস্তুতঃ বিকারশীল। "If in the sentence "I am the same that I was yesterday," we take the 'I' broadly, it is evident that in many ways I am *not* the same. As a concrete Me, I am somewhat different from what I was: then hungry, now full; then waking, now at rest; then poorer, now richer; then younger, now older; etc. So far, then, my personal indentity is just like the sameness predicated of any other aggreagate thing. It is a conclusion grounded on the resemblance in essential aspects, or on the continuity of the phenomena compared. The past and present selves compared are the same just so far as they *are* the same, and no fartner" (পৃ ২০১-২০২)। অর্থাৎ কালিকার গাছ, আর আজিকার গাছ যেমন এক গাছ হইলেও পূরা এক গাছ নহে, সেইরূপ কাল যে আমাকে জানিতাম ও আজ যে আমাকে জানিতেছি, উহারা এক আমি হইলেও পূরাপূরি এক নহে।

কাজেই জ্ঞেয় আমি বিকারশীল। কিন্তু জ্ঞাতা আমার স্বরূপ কি? লেখকের মতে—"The 'Pure Ego' is a very much more difficult subject of inquiry than the Me. It is that which at any given moment *is* conscious, whereas the Me is only one of the things which it is conscious *of*. In other words, it is the *Thinker*. It is the passing state of consciousness itself, or is it something deeper and less mutable? The passing state we have seen to be the very embodiment of change. Yet each of us spontaneously considers that by 'I' he means something always the same. This has led most philosophers to postulate behind the passing state of consciousness a permanent Substance or Agent whose modification or act it is. This Agent is the thinker. 'Soul' 'Transcendental Ego' 'Spirit' are so many names for this more permanent sort of Thinker. (পৃ ১৯৫-১৯৬)। অর্থাৎ যে জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় আমার বিকারের

ও চাঞ্চল্যের সাক্ষী, সে যেন নির্বিকার। সেই Permanent Agent-এর বৈদান্তিক নাম পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। বৌদ্ধ অথবা হিউম এই সাক্ষীকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের, মতে, ঐ passing state of consciousness ক্ষণিক বিজ্ঞানই সমস্ত।

এই জ্ঞাতা আমি নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে বিষয়ে জেম্‌সের সিদ্ধান্ত কি? তিনি বৌদ্ধের দিকে, না বেদান্তের দিকে? তাঁহার প্রশ্ন -"Does there not then appear an absolute identity [with regard to the thinker] at different times? That something which at every moment goes out and knowingly appropriates the Me of the past, and discards the non-me as foreign, is it not a permanent abiding principle of spiritual activity identical with itself wherever found?" (পৃ. ২০২)। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বৌদ্ধের দিকে ঝোঁক দিয়া বলিয়াছেন—"The states of consciousness are all that psychology needs to do her work with. Metaphysics or Theology may prove the Soul to exist; but for psychology the hypothesis of such a substantial principle of unity is superfluous" (পৃ. ২০৩)। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নির্বিকার আত্মার বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক নহে। কেন না, "Successive thinkers numerically distinct, but all aware of the same past in the same way, form an adequate vehicle for all the experience of personal unity and sameness which we actually have" (পৃ ২০৩)। অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ পূর্বাপর ক্ষণিক বিজ্ঞানের প্রবাহ বর্তমান; প্রত্যেক ক্ষণিক বিজ্ঞাতা তাহার পূর্ববর্ত্তী ক্ষণিক বিজ্ঞাতার নিকট হইতে তাহার অতীত স্মৃতির বা প্রত্যভিজ্ঞার সমষ্টি ধার করিয়া লয়; ইহা মনে করিলেই আত্মাকে কেন নিত্য ও নির্বিকার বলিয়া বোধ হয়, তাহা বুঝা যাইবে। ইহা প্রায় খাঁটি বৌদ্ধের কথা। বৈদান্তিক বলেন, তথাস্তু। ক্ষণিক বিজ্ঞান পর পর উপস্থিত হইয়া পূর্ববিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি বা প্রত্যভিজ্ঞাকে আত্মসাৎ করিয়া লয়, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এখানে থামা চলিবে না। কেন না, ঐ "পর পর" কথাটার গোল আছে। পর পর বলিলেই একটা কালক্রমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মনে আসে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা, এই পৌর্বাপর্য্য, ব্যাপারখানা কি? আমি যেমন জড় জগৎকে আমার সম্মুখে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেশে বিস্তীর্ণ মনে করি, কিন্তু সেই দেশ কেবল আমার কল্পিত দেশ; দর্পণের পশ্চাতে কল্পিত দেশের সহিত বা স্বপ্নদৃষ্ট দেশের সহিত উহার পারমার্থিক ভেদ নাই; সেইরূপ এই ক্ষণে বসিয়াই জ্ঞেয় আমাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করিয়া একটা অতীত কালের কল্পনা করি—মনে করি, কাল আমি এমনই ছিলাম, পরশু আমি ইহা করিয়াছি, চল্লিশ বৎসর আগে আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম—তারও

আগে আমি ছিলাম না, তবে তখন আমার পিতা পিতামহ ছিলেন, ম্যামথম্যাষ্টোডন ছিল - ইত্যাদি ; এই কালও ত আমারই একটা কল্পনা। দেশও যেমন কল্পনা, কালও তেমনই কল্পনা। দেশ কাল উভয়ই আমার আমাকে স্পষ্ট করিয়া ছড়াইয়া দেখিবার দ্বিবিধ রীতি। দুইটা ভিন্ন-রকমের উপায়। আমার বাহিরে যেমন দেশ নাই, তেমনই কালও নাই। আমার দেশব্যাপ্তি কেহই স্বীকার করিবেন না। আমার কালব্যাপ্তিই বা কেন স্বীকার করিবে? বস্তুতঃ আমি দেশেও ব্যাপ্ত নহি, কালেও ব্যাপ্ত নহি।

বস্তুগত্যা আমি এখন এই ক্ষণে বর্ত্তমান, এইটুকু স্বীকার করিতে আমি বাধ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বা পরবর্ত্তী ক্ষণ, অতীত বা ভবিষ্যৎ স্বীকারে আমি বাধ্য নহি। আমি অতীত কাল কল্পনা করিয়া তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যাপিয়া আমাকে বিদ্যমান মনে করি; কিন্তু মনে করি মাত্র। আমি অনাগত কালের আশা করিয়া তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকিব, এইরূপ প্রতীক্ষায় রহিয়াছি—কিন্তু উহা আমার আশা মাত্র ও প্রতীক্ষা মাত্র। সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, আশা ও প্রতীক্ষা। পরমার্থতঃ উহা অস্তিত্বহীন। জ্ঞেয় আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব নাই।

কালই যেখানে কল্পনা—উহা জ্ঞাতা আমি কর্ত্তৃক জ্ঞেয় আমিকে আমা হইতে পৃথক্ করিয়া ছড়াইয়া দেখিবার একটা ফন্দি মাত্র—সেখানে কালের পরম্পরা—ইহা আগে, ইহা পরে—এই সকল উক্তি লোকব্যবহার মাত্র। উহা ব্যাবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। বিষয়ী আমি - সাক্ষী আমি—জ্ঞাতা আমি—পরমাত্মা আমি—ব্রহ্ম আমি কালোপাধিশূন্য; আমি কালের বাহিরে।

তাই যদি হইল, তবে আমি permanent - নিত্য কি না, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। নিত্য বলিলেই কালব্যাপক বুঝায়। কিন্তু জ্ঞাতা আমি কালব্যাপক নহে, উহা নিত্যও নহে। উহা এখন আছে, ইহা ঠিক। অতীত কালে উহা ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, এ প্রশ্নের অর্থ হয় না।

এইরূপ উত্তর যে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেম্‌সের নিশ্চয় সংশয় ছিল। তাই তিনি হাত রাখিয়া বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর এইরূপ; তবে Metaphysics কিংবা Theology অন্যরূপ উত্তর দিতে পারেন। বেদান্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন না। মনোবিজ্ঞান-বিদ্যা ব্যাবহারিক বিদ্যা; জেম্‌স স্পষ্টাক্ষরে উহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। পরমার্থ-বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নহে; পরমার্থান্বেষী বেদান্তের নিকট সাক্ষী পরমাত্মা এখনই বর্ত্তমান; অতীতে উহা বর্ত্তমান ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না কেন না, অতীত ও ভবিষ্যৎ, এই দুই বিশেষণ প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি প্রযোজ্য। সমস্ত প্রকৃতিই যেখানে আমারই জ্ঞানগম্য, অতএব আমার সৃষ্ট বা কল্পিত, সেখানে অতিপ্রাকৃত জ্ঞাতার প্রতি তাহার প্রযোজ্যতা নাই। পরমাত্মা স্বয়ং কালোপাধিবর্জ্জিত; উহা অদ্বয়; উহা অখণ্ড। উহার এক টুকরা কাল ছিল, এক টুকরা আজ আছে, এমন মনে করা চলে না।

অধ্যায়ের উপসংহারে লেখক বলেন—"This *Me* is an empirical aggregate of things objectively known. The *I* which knows them cannot itself be an aggregate" (পৃ. ২১৫)। অর্থাৎ জ্ঞেয় আমাকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাবা চলে না। অপিচ, "For psychological purposes it (the I) need not be an unchanging metapshysical entity like the Soul, or a principle like the transcendental Ego, viewed as out of time" (পৃ. ২১৫)। বেদান্তী বলেন, তথাস্ত। মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু পারমার্থিক বিদ্যার পক্ষে উহাকে unchanging entity বলিতে চাহে না—কেন না, unchanging বা অবিকারী বলিলে কালব্যাপ্তি আসে,—তবে উহাকে out of time অর্থাৎ কালাতীত বলিতে পারি।

এখন বুঝা যাইবে, বেদান্ত কেন একমুখে পরমাত্মাকে নিত্য নির্বিকার বলেন; পক্ষে আবার যেন সহসা সাবধান হইয়া বলেন—না, না, ব্রহ্ম তাহাও নহেন। যাহার নিকট অতীত ও ভবিষ্যৎ অর্থশূন্য, তাহাকে নিত্য বলাও চলে না। ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশে অবশেষে ইহা নয়, ইহা নয় বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হয়।

আশা করি, এখন অদ্বয়বাদের তাৎপর্য্য কতকটা বুঝা গেল। আমি তোমাকে জানি। যে জানে, সে নিরুপাধিক ব্রহ্ম। যাহাকে জানে, সে সোপাধিক জীব; সে ক্ষুদ্র চঞ্চল, বিকারশীল, জরা-মরণের অধীন। অথচ উভয়ই এক। যে জানে ও যাহাকে জানে, সে একই ব্যক্তি। সে নিরুপাধিক, সে-ই আবার সোপাধিক, এই সমস্যার পূরণের উপায় কি? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন, ঐ উপাধি কল্পিত উপাধি। মায়াকল্পিত জগতের যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন সেই জগতের অধীনতা প্রকৃত অধীনতা নহে। ঐরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধ মাত্র। আবার কাল যখন একটা কল্পিত উপাধি, তখন জীবের যে কালব্যাপ্তি, যে পরিবর্ত্তন, যে পরিণতি, যে বিকার দেখা যায়, উহা কল্পিত। কাজেই জীব বিকারশীল নহে, পরিণামী নহে, চঞ্চল নহে। বিকারশীল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা বোধ মাত্র। উহা ভ্রান্তি এই ভ্রান্তির নামান্তর অবিদ্যা। ঐ বুদ্ধি জ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব। জ্ঞানাভাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল মনে করি ও উহাকে দেশ জুড়িয়া কল্পিত জগতের অধীন এবং কাল জুড়িয়া কল্পিত সংসারচক্রে ভ্রমণশীল ভাবি। জ্ঞানোদয়ে জানিতে পারি, উহা তেমন নহে। কেন না, আমিই আমাকে জানি; এখানে জ্ঞাতা আমারও যেমন কোন উপাধি নাই, জ্ঞেয় আমারও তেমনি কোন বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না। কেন না, উভয় আমিই এক আমি। ইহা যে জানে, সে মুক্ত। যে জানে না, সে বদ্ধ।

এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয়? জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়। এই গোড়ার কথাটুকু মানা কঠিন। জড়বাদী ও দ্বৈতবাদী এইখানে আসিতে পিছলিয়া পড়েন। এইটুকু পর্য্যন্ত আসিলে আর বাকী সব আপনি আসে। জগৎ কল্পনা; কিন্তু সেই কল্পনায় ব্যবস্থা দেখি,

শৃঙ্খলা দেখি। সেই সুব্যবস্থ সুশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কল্পনা করিতে এক জন চেতনা স্রষ্টিকর্ত্তা—Personal Intelligent God আবশ্যক। এই জন্য বার্কলি জীব হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। হিউম বলিয়াছেন, ঐ জাগতিক ব্যবস্থা কেন এমন, তাহা জিজ্ঞাসায় লাভ নাই। বৌদ্ধও সেই পথে গিয়াছেন। বেদান্ত বলেন—তজ্জন্য স্বতন্ত্র চেতন ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্যক নহে। যে এক মাত্র চেতন পদার্থকে আমরা জানি, তাঁহাকেই জগৎকর্তৃত্ব দিতে কোন বাধা নাই। সেই জগৎকর্ত্তৃত্বের নাম মায়া। আত্মাতে মায়া আরোপ করিলে উহার ঈশ্বরত্ব জন্মে; উহা স্রষ্টিক্ষম হয়। তবে জগৎ যখন অধ্যাস, সেই ঈশ্বরত্বও তেমনি অধ্যাস। আবার যদি তর্ক উঠে, এই ক্ষুদ্র জীব যে জগতের অধীন, সে জগতের কর্ত্তা হইবে কিরূপে, তদুত্তরে বলা হয়, এই ক্ষুদ্রত্ব আমায় আরোপের প্রয়োজন কি? আমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করি বটে, জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয় আমাকে বিকারশীল মনে করি বটে, কিন্তু তাহা ভুল, তাহা অবিদ্যা। ক্ষুদ্রত্ব জগতের অধীনতার ফল; জগৎই যখন কল্পনা, তখন সেই ক্ষুদ্রত্বও কল্পনা মাত্র, অবিদ্যা মাত্র। যত ক্ষণ সেই ভুল থাকে, অবিদ্যা থাকে, তত ক্ষণই আমি বদ্ধ। সেই ভুল গেলেই আমি মুক্ত।

কাজেই এই মুক্তির উপায় জ্ঞান—এই জ্ঞান লাভেই মুক্তি ঘটিবে—মরণকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। জীবন থাকিতেই মুক্তি ঘটিবে—জীবন্মুক্তিই মুক্তি।

সচরাচর বলা হয়, মুক্তির পর আর সুখ-দুঃখ থাকে না। মুক্তির পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই সকল বাক্যও সরলভাবে গ্রহণ করা উচিত। মুক্তির পর, অর্থাৎ জীবন্মুক্তির পর সুখ-দুঃখ কেন থাকিবে না? সুখ-দুঃখ থাকিবে বৈ কি। বেদান্ত বলেন, প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে। মুক্ত হইলেও যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, আগুনে হাত পুড়িবে, বাঘের সম্মুখে পড়িলে পলাইতে হইবে। বেদান্তের ভাষায় প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল আমাকে ভুগিতেই হইবে; তবে সেই সকল আর আমাকে বাঁধিতে পারিবে না, ফলভোগী হইয়াও আমি নির্লিপ্ত থাকিব। সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে, সুখ দুঃখের বোধ ঘটিবেই; তবে জ্ঞানোদয়ের পর সেই সুখকে ও সেই দুঃখকে জীবের জীবত্বের আনুষঙ্গিক প্রত্যয়-পরম্পরা বলিয়া জানিব। মুক্তির পূর্ব্বে উহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, এখন উহাকে ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া জানিব।

আর জন্মান্তর পরিগ্রহ? মুক্ত পুরুষের আর সংসারে ফিরিতে হয় না, এই বাক্যের মর্ম্ম কি? যে মুক্ত, তার পক্ষে দেহটাই কল্পনা; তার পক্ষে দেহ-ধর্ম্মে মরণ ঘটনাটাও কল্পনা, তাহার পক্ষে মরণ একটা প্রত্যয় মাত্র। মরণই যেখানে নাই, সেখানে আর জন্মান্তর পরিগ্রহ কি? তাহার পক্ষে ইহলোকই বা কি আর পরলোকই বা কি? স্বর্গ নরক, পরকাল, এমন কি, সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার নিকট অবিদ্যমান। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আপনাকে কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখে; কিন্তু অবিদ্যামুক্ত জীব, যে বিষয়ী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, সে স্বয়ং দেশ-কাল-নিরপেক্ষ। তাহার

পক্ষে সম্মুখ পশ্চাৎ নাই ; তাহার পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয় শব্দই অর্থশূন্য।
মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করিবেন কি না, ইহার উত্তরও এখন সহজ হইবে। মুক্ত পুরুষকেও জীবনে বদ্ধবৎ আচরণ করিতে হয়, তাহাতে কোন হানি নাই ; কেন না সে জানে যে, এই যে বন্ধন, ইহা মায়িক বন্ধন, ভেলকির বন্ধন। ইহা জানে বলিয়াই সে মুক্ত ; —ইহা জানাই মুক্তি। প্রারব্ধ কর্ম্ম ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফলভোগে সে যেমন বদ্ধবৎ বাধ্য, তেমনই সে তাহার ব্যবহারিক জীবনে হেয় বর্জ্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করিতেও বাধ্য। ক্ষুধা পাইলে যখন আহার করিতে হইবে, তখন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কন্থা গায়ে জড়াইয়া ধর্ম্মকে ফাঁকি দিলে চলিবে না। 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'—কর্ম্ম করিয়াই শত বৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে—বেদান্তের এই আদেশ। মুক্তের কামনা নাই ; কেন না, তাহার নিকট ইহকাল ও পরকাল অর্থশূন্য। মুক্তের কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম ; উহা তাহাকে বাঁধিতে পারে না।
মুক্তির অর্থ বুঝা গেল ও মুক্তির উপায়ও বুঝা গেল। মুক্তির উপায় জ্ঞান—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অন্য অর্থে প্রযুক্ত অন্যরূপ মুক্তির অন্য পন্থা থাকিতে পারে, কিন্তু বেদান্ত যে মুক্তির কথা বলেন, সেই মুক্তির জন্য কেবল জ্ঞানের পন্থা ; ইহার জন্য কর্ম্ম আবশ্যক নহে, ইহার জন্য ভক্তি মুখ্যতঃ আবশ্যক নহে। তাহা বলিলে কর্ম্মের বা ভক্তির নিন্দা করা হয় না। কর্ম্মের পন্থার বা ভক্তির পন্থার অন্য স্থলে অন্য উদ্দেশ্যে সার্থকতা আছে ; সেখানে জ্ঞানের পন্থা হয়ত কিছুই নহে। মুক্তির জন্য কিন্তু জ্ঞানের পন্থা। সেই জ্ঞান কোন আজগুবি জ্ঞান নহে ; উহা নির্ম্মল বিশুদ্ধ জ্ঞান ; সেই জ্ঞান লাভের জন্য নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ ও শমদমাদি সাধনা আবশ্যক ; শ্রবণ-মননাদি সেই জ্ঞানলাভে সাহায্য করে ; শ্রুতিবাক্য ও গুরুবাক্য তাহাতে সাহায্য করে। এগুলি কর্ম্ম এবং ভক্তিপূর্ব্বক কৃত না হইলে ইহারা ফল দেয় না। এইরূপে কর্ম্মের এবং ভক্তির গৌণভাবে আবশ্যকতা। ইহার অর্থ অতি সরল অর্থ—ইহার ভিতরে কোন বুজরুকি নাই।
বেদান্তের স্থূল কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে অবৃত্তি করা যাক।
(১) এক মাত্র চেতন পদার্থ বিদ্যমান উহা আমি—উহার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। উহা দেশকালনিরপেক্ষ নির্গুণ নিরুপাধিক পদার্থ; কাজেই উহার স্বরূপ ভাষা দ্বারা অপ্রকাশ্য। ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ অভাববাচী বিশ্লেষণে উহা বুঝাইতে হয়।
(২) এই আমি আমার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড দেশের কল্পনা করিয়া সেই দেশে আমার কল্পিত জড় জগৎকে প্রক্ষেপ করি ও কল্পিত দেশমধ্যে তাহাকে ব্যবস্থা করিয়াই সাজাই। এখানে সূর্য্য রাখি, ওখানে চন্দ্র রাখি, এখানে পৃথিবী রাখি ইত্যাদি। এবং সেই সূর্য্য-চন্দ্র-পৃথিবীকে বাঁধা নিয়মে দেশমধ্যে ঘুরাই।
পুনশ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত কালে আমার সৃষ্ট জগৎকে প্রক্ষেপ করি। তাহার কিয়দংশকে বলি অতীত, কতকটাকে বলি ভবিষ্যৎ ও উভয়ের সন্ধিস্থানকে বলি বর্ত্তমান।
পুনশ্চ, এই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত জগৎকে একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে

নিয়ম বাঁধিয়া পরিচালনা করি।

(৩) এই দেশকালে সজ্জিত ব্যবস্থানুযায়ী ও উদ্দেশ্যানুযায়ী জগতের সৃষ্টির জন্য আত্মাতে যে ক্ষমতা আরোপ করা হয়, উহার নাম দেওয়া হয় মায়া। কিন্তু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই সৃষ্টিক্ষমতাও সেখানে আরোপ মাত্র বা অধ্যাস মাত্র। উক্ত মায়ার আরোপে নিরুপাধিক আত্মা সোপাধিক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু সেও প্রত্যয় মাত্র। এই সোপাধিকরূপে প্রতীত অর্থাৎ মায়াযুক্ত আত্মার নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর: কেন না, ইনিই কল্পিত জগতের কল্পনাকারক, সৃষ্ট জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই জগতের কল্পিত বৃহত্ত্ব দেখিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাতেও অর্থাৎ ঈশ্বরেও সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি আরোপ করা হয়।

(৪) আর একটি অদ্ভুত কথা এই যে, আমি যেমন আমা হইতে পৃথক জড় জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বা ঈশ্বর মনে করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমিই আবার আমাকে আমা হইতে পৃথকরূপে দেখিয়া থাকি। উক্ত কল্পিত জড় জগৎ যেমন আমার জ্ঞানগম্য বিষয়, এই আমিও তেমনই আমার জ্ঞানগম্য বিষয়। অধিকন্তু এই বিষয় আমাকে আমি আমা হইতে পৃথক্ ভাবে দেখিয়া তাহার সহিত মহৎকল্পিত জড় জগতের একটা সম্বন্ধ আরোপ করি। আমাকে সর্ব্বাংশে সেই জগৎ হইতে ক্ষুদ্র, সেই জগতের বশতাপন্ন, সেই জগতের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য হেয় বর্জ্জনে ও উপাদেয় গ্রহণে সর্ব্বদা ব্যাকুল ও তদর্থ ক্রিয়াশীল, জড় জগতের আঘাতসহ ও সেই আঘাতে বিকারশীল, পরিণামশীল, সুখদুঃখ-ভোগী, জরামরণশীল বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল। এই ভ্রান্তির নাম দেওয়া হয় অবিদ্যা; —বস্তুতঃ জড় জগৎই মিথ্যা ও জড় জগতের সহিত আমার এই কল্পিত সম্বন্ধও মিথ্যা। আমি বিকারশীল বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইলেও এই জ্ঞানগম্য আমি, জ্ঞাতা আমি হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। অবিদ্যাবশেই আমি নিরুপাধিক হইয়াও আমাকে সোপাধিক ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করি।

(৫) কাজেই যিনি আত্মা, অর্থাৎ যে অনির্ব্বাচ্য চৈতন্যস্বরূপ পদার্থকে 'আমি' নাম দেওয়া হয়, তিনিই এক দিকে ঈশ্বর, অন্য দিকে জীব। মায়ার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগৎকর্ত্তা, জগতের প্রভু, ঈশ্বর; আর অবিদ্যার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগতের অধীন, জগতের দাস জীব। কিন্তু স্বরূপতঃ যে ঈশ্বর, সে-ই জীব।

(৬) এই তত্ত্ব জানিলেই মুক্তি ঘটে, অর্থাৎ তখন জগৎকে কল্পনা মাত্র বলিয়া বুঝা যায় ও জীবকে তাহার অনধীন বলিয়া বুঝা যায়। তখন সুখ দুঃখ, ইহ পরকাল, জন্ম-মরণ, সংসার, সমস্তই মৎকল্পিত প্রত্যয় মাত্র বলিয়া জানা যায়। তখনই পূর্ণ জাগরণ হয়;—তাহার পূর্ব্বে স্বপ্ন। আমি মায়াবী ঐন্দ্রজালিক—নিজেই এই ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া, সেই ঐন্দ্রজালিক অভিনয়ে আপনাকে নটের ন্যায় নৃত্যপর দেখিয়া, অভিনয়কে সত্য ঘটনা মনে করিয়া স্বয়ং প্রতারিত হইতেছি। চমক ভাঙ্গিয়া উহাকে স্বকৃত ইন্দ্রজাল বলিয়া বুঝিলেই আমি মুক্ত। আত্মপ্রতারণা হইতে অব্যাহতিই মুক্তি। অথবা আমি নিত্য-মুক্ত; আমি মনে করি—আমি বদ্ধ;

এই মনে করাই ভুল—ইহাই বন্ধন, ইহাই অবিদ্যা। অথবা নিত্য-মুক্ত না বলিয়া কেবল মুক্ত বলাই উচিত। কেন না, নিত্য বলিলে কালে বিদ্যমান বুঝায়; কিন্তু কালের বন্ধনও কল্পিত বন্ধন; বস্তুতঃ আমি কালাতীত।

(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ করিয়া, ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই অবিদ্যার আরোপ করিয়া জগতের দাসত্ব অভিনয় করিয়া প্রতারিত হই, তাহার উত্তর বোধকরি নাই। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব; বৈষ্ণব বলেন, উহা আমার লীলা বা খেয়াল; শাক্ত বলেন, উহা আমার আনন্দ; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা করিও না। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ইহার উত্তরে ঋষিমুখে বলাইয়াছেন—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব, যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্, সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনিই ইহা বিধান করিয়াছেন বা তিনি ইহা করেন নাই, যিনি পরম ব্যোমে অবস্থান করিয়া ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই তাহা জানেন, অথবা তিনিও তাহা জানেন না। এই তিনি কে? এই তিনি আমি স্বয়ং; আমা হইতে স্বতন্ত্র আর কাহারও অস্তিত্বের কল্পনা অনাবশ্যক;—করিলে তিনিও আমারই জ্ঞানগম্য বা কল্পনীয় হইয়া পড়িবেন, আমারই সৃষ্টি মাটির পুতুল হইবেন; অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তর আমিই জানি, অথবা জানিয়াও জানি না, এইরূপ ভান করি।

মায়া-পুরী

কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুরী রচনা করিয়া আপনাকে সেই পুরীমধ্যে আবদ্ধ ভাবিয়া বসিয়া আছি ও আপনাকে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র মনে করিয়া হা হুতাশ করিতেছি। এই মায়া-পুরীর নাম বিশ্ব-জগৎ; আমি ইহার কল্পনা করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ইহার অধীন ধরিয়া লইয়াছি। এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিম্ভূতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত; আমি কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্র; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।

এই গোড়ায় গলদ স্বীকার করিয়া লইয়া আমি মানব-জীবন আরম্ভ করি। বিশ্ব-জগতের একটা অংশকে আমি অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখি এবং তাহার নাম দিই আমার 'দেহ'। এই বিশ্ব-জগত অতি প্রকাণ্ড,—অনন্ত কি সান্ত, তাহা লইয়া এখানে বিতর্ক তুলিব না—কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগতের যে অংশকে আমরা দেহ বলি, উহা সমস্তের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। যে চর্ম্মাবরণের মধ্যে আমার দেহখানি বিদ্যমান, বস্তুতঃ সেইখানেই আমার দেহের সীমা, অথবা

তাহা অতিক্রম করিয়া আর কিছুদূর পর্য্যন্ত দেহ বিস্তৃত আছে, জীববিদ্যা বা পদার্থবিদ্যা এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু আমরা মোটামুটি ঐখানেই উহার সীমা ধরিয়া লই। এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ দেহটাকে আমরা নিতান্তই আপনার আত্মীয় ভাবি এবং ইহার বাহিরে বিশ্ব-জগতের যে বিশাল কায় বিদ্যমান, তাহাকে অনাত্মীয় বা পর ভাবি। দেহকে এত আত্মীয় ভাবি যে, সেকালের ও একালের বহু পণ্ডিত ও বহুতর মূর্খ—যাঁহাদের শাস্ত্রসম্মত উপাধি দেহাত্মবাদী—তাঁহারা এই দেহকেই সর্ব্বস্ব স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন ও আছেন। যিনি এই বিশ্ব-জগতের এবং বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্ত্তা ও রচনাকর্ত্তা, দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত না মানিতে ইঁহারা উদ্যত। সে কথা এখন থাক্। এই দেহ, যাহা আমার আপন ও বিশ্ব-জগতের অপরাংশ, যাহা আমার পর, এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। বিশ্ব-জগতের এই অপরাংশকে বাহ্য জগৎ বলিব। এই দেহের সহিত বাহ্য জগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন। এই কারবার যে ক্ষণে আরব্ধ হয়, সেই ক্ষণে জীবনধারী জীবের জন্ম এবং এই কারবার যে ক্ষণে সমাপ্ত হয়, সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই ঘটনার মাঝে যে কাল, সেই কাল ব্যাপিয়া দেহের সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক থাকে ও কারবার চলে। সে কিরূপ সম্পর্ক? প্রথমতঃ উহা বিরোধের সম্পর্ক। বাহ্য জগৎ দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে; সহস্র পথে সহস্র উপায়ে উহাকে নষ্ট করিয়া আপনার পঞ্চভৌতিক উপাদানে লীন করিতে চাহিতেছে; শীতাতপ, রৌদ্র-বর্ষা, সাপ-বাঘ, মাষ্টার ও ডাক্তার, ম্যালেরিয়া প্লেগ ও বেরিবেরি, এই সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহ্য জগৎ এই দেহকে বিপন্ন, নষ্ট ও লুপ্ত করিতে চাহিতেছে। ফলে বাহ্য জগৎই জীবদেহের পরম বৈরী এবং এক মাত্র বৈরী। কেন না, জীবের যত শত্রু আছে, সকলেই বাহ্য জগৎ হইতে আসিতেছে। দেহের সহিত বাহ্য জগতের আর একটা সম্পর্ক আছে, উহা মিত্রতার সম্পর্ক। কেন না, বাহ্য জগৎ হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া দেহ আপনাকে গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং বাহ্য জগৎ হইতেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বাহ্য জগতের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। বাহ্য জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেহের বাহ্য জগৎ ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই। এই কারণে বাহ্য জগৎ আমার পরম মিত্র এবং এক মাত্র মিত্র। এক মাত্র যে শত্রু, সেই আবার এক মাত্র মিত্র, এই সম্পর্ক অতি বিচিত্র; কুত্রাপি ইহার তুলনা নাই। বাহ্য জগতের মূর্ত্তি—এ কেমন হরগৌরী-মূর্ত্তি;—রুদ্রমূর্ত্তি হর আট প্রহর শিঙ্গা বাজাইয়া প্রলয়ের মুখে টানিতেছেন, আর বরাভয়করা গৌরী সেই প্রলয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহ্য জগতের সহিত দেহের কারবার যুগপৎ এই দুই রীতিক্রমে চলিতেছে; এই কারবারের নাম জীবন-দ্বন্দ্ব এবং জীব মাত্রই অষ্ট প্রহর এই জীবন-দ্বন্দ্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। দ্বন্দ্বের পরিণতিতে কিন্তু বাহ্য জগতেই জয়; জীবকে এক দিন না এক দিন পরাস্ত ও অভিভূত হইতে হয়; সেই দিন তাহার মৃত্যু।

জীব-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা হয়ত বলিবেন, জীব মাত্রেই মরিতে বাধ্য নহে; "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" এই কবি-বাক্য বিজ্ঞানসম্মত নহে; কেন না নিম্নশ্রেণীতে নামিয়া এমন জীব দেখা যায়, যাহারা বস্তুতই মরিতে বাধ্য নহে, যাহারা বস্তুতই অশ্বত্থামার মত চিরজীবী। বস্তুতঃ উচ্চতর শ্রেণীর জীবেরাই মরণ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে। উচ্চতর জীবেই মরণ-ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে এবং তাহারাই বাহ্য জগতের সহিত বিরোধে পরাভূত হয় ও মরিয়া যায়, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বাহ্য জগতকে ফাঁকি দিবারও একটা কৌশল এই উচ্চতর জীবেরা উদ্ভাবন করিয়াছে। স্বভাবতঃ মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা পিতা অথবা মাতা সাজিয়া, অথবা যুগপৎ পিতা ও মাতা সাজিয়া দেহের এক বা একাধিক খণ্ড বাহ্য জগতে নিক্ষেপ করে এবং সেই দেহখণ্ড আবার বাহ্য জগৎ হইতে মশলা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার মতই বাহ্য জগতের সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম বংশরক্ষা এবং জীব যখন মরিয়া যায়, সন্তান তখন তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া তাহারই মত জীবন দ্বন্দ্ব চালাইতে থাকে। বাহ্য জগতের এক মাত্র লক্ষ্য—জীবনকে লোপ করা; জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য—আপনাকে কোন-না-কোনরূপে বাহাল রাখা।

আধুনিক জীববিদ্যা জীবদেহকে যন্ত্র-হিসাবে দেখিতে চান। যন্ত্র মাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। ঘটিকা যন্ত্র কাঁটা ঘুরাইয়া সময় নির্দ্দেশ করে। এঞ্জিন চাকা ঘুরাইয়া জল তোলে, ময়দা পেষে, গাড়ী টানে। যন্ত্রের মধ্যে যে সকল অবয়ব আছে,—যেমন ঘটিকা-যন্ত্রের স্প্রিং পেণ্ডুলম্ চাকা কাঁটা ইত্যাদি,—সেই প্রত্যেক অবয়বের এক একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে; প্রত্যেক অবয়ব আপনার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে যন্ত্রটি আপনার উদ্দেশ্যসাধনে সমর্থ হয়। দেহমধ্যেও সেইরূপ নানা অবয়ব আছে: নাক, কান, চোখ, হাত, পা, দাঁত, এবং সকলের উপর উদর, প্রত্যেকে আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিলে দেহ-যন্ত্র চলিতে থাকে। উদরের উপর অভিমান করিয়া কেহ কর্ম্মে শৈথিল্য করিতে গেলেই ঠকিয়া যায়। যন্ত্রকে চালাইতে হইলে বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়;—যেমন, ঘড়িতে দম দিতে হয়, এঞ্জিনে কয়লার খোরাক যোগাইতে হয়;—দেহ-যন্ত্রেও তেমনিই বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়। ডাল-রুটি, পায়স-পিষ্টক এবং মৎস্য-মাংস শক্তি বহন করিয়া দেহমধ্যে সঞ্চিত রাখে। সকল যন্ত্রেরই বিপত্তি আছে। বাহির হইতে চেষ্টা দ্বারা সেই বিপত্তি নিবারণের উপায় করিতে হয়। ঘড়ির চাকায় মরিচা ধরিলে তেল দিতে হয়; স্প্রিং ছিঁড়িলে বদলাইয়া দিতে হয়। সেইরূপ দেহ-যন্ত্রেও বিপত্তি নিবারণের জন্য ঔষধ-প্রয়োগের ও অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হয়; ডাক্তার ও সার্জ্জন এখানে ছুতারের ও কামারের কাজ করেন। যে সকল যন্ত্রে কারিগরি অধিক, সেখানে যন্ত্রের মধ্যে এমনই বন্দোবস্ত থাকে যে, বৈকল্য ঘটিবার আশঙ্কা হইলেই যন্ত্র আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া সামলাইয়া লয়। যেমন এঞ্জিনের ভিতর গবর্ণার থাকে; চাকার বেগ অনুচিত পরিমাণে বাড়িবার বা কমিবার উপক্রম হইলে উহা বাড়িতে বা কমিতে দেয় না। ষ্টীমের চাপ মাত্রা ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে, ছাড়-কপাট অর্থাৎ safety valve আপনা হইতে খুলিয়া গিয়া খানিকটা ষ্টীম

বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহযন্ত্রমধ্যে এত অধিক আছে যে, যন্ত্রনির্ম্মাতার কারিগরিতে বিস্মিত হইতে হয়। দেহ-যন্ত্রের কোন অংশ বৈকল্য ঘটিলেই দেহ-যন্ত্র তাহা সংশোধনের চেষ্টা করে, আপনাকেই আপনি মেরামত করিয়া লয়; কামারেরর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। কর্ম্মকার ডাক্তার আসিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটান। ভাঙ্গা হাড় আপনা-আপনি জোড়া লাগে; আন্টিভেনীন ব্যতিরেকেও সাপে-কাটা মানুষ অনেক সময় মাথা তুলিয়া উঠে; দেহমধ্যে দুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলে লক্ষ শ্বেতকণিকা রক্তস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া সেই জীবাণুকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়; এমন কি, নিজের ঔষধ তৈয়ার করিয়া সেই দুষ্ট জীবাণুর উদ্গীর্ণ বিষের নাশ করে।

এই সকল কারণে জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি? ঘড়ির উদ্দেশ্য সময় নিরূপণ। এঞ্জিনের উদ্দেশ্য ময়দা পেষা,—ময়দাভোজীর পক্ষে অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবদেহের জীবন-যাত্রার উদ্দেশ্য কি? জীব যত দিন জীবিত থাকে, ততদিন আহার করে ও নিদ্রা যায় এবং সময়ে সময়ে লম্ফ-ঝম্প করে। কিন্তু তাহার জীবনব্যাপী যাবতীয় কার্য্যের এক মাত্র উদ্দেশ্য জীবনরক্ষা। তাহার জীবন-যাত্রার এক মাত্র উদ্দেশ্য জীবনযাত্রা। গরুকে আমরা নিতান্তই জোর করিয়া লাঙ্গলে ও গাড়ীতে খাটাইয়া লই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সেই গরু লাঙ্গল ও গাড়ী টানিবার জন্যই গোজন্ম গ্রহণ করে নাই। সময়-মত ঘাস খাইয়া, রোমন্থন করিয়া, ঘুমাইয়া, শিঙ নাড়িয়া, লাফাইয়া এবং কতিপয় বৎসতরীর জন্ম দান দ্বারা আপনার গো-জন্মের ধারা রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়া, জীবলীলা সাঙ্গ করাই তাহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। অকস্মাৎ বাঘের সম্মুখে পড়িলে, তাহার উদ্দেশ্য সহসা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার জীবন ধারণের মহত্তর উদ্দেশ্য দেখা যায় না। মনুষ্য-নির্ম্মিত যে সকল যন্ত্র কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে না, যাহা কেবল নাচে বা লাফায় বা ঘুরিয়া বেড়ায় বা প্যাঁক প্যাঁক করে, তাহা যন্ত্রের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর যন্ত্র; তাহা বালকের কৌতুকের জন্য ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ জীবের দেহ-যন্ত্র, যাহার এক মাত্র উদ্দেশ্য, খাইয়া শুইয়া লাফাইয়া চেঁচাইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তাহাও এই হিসাবে একটা প্রকাণ্ড কৌতুক বলিয়াই বোধ হয়। যিনি এই দেহ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, তাঁহার অন্তরে যদি কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকে, তাহা আমরা অবগতি নহি। অন্ততঃ জীববিদ্যা তাহা অবগত নহে।

ফলে জীববিজ্ঞান দেহ-যন্ত্রকে এইরূপ একটা কৌতুকের সামগ্রী বলিয়াই দেখে। কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব-নির্ম্মিত অন্য যন্ত্রের কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে কারিগরের অপেক্ষা করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় খানিকটা কাচ আর রূপা আর পিতল আর লোহা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম,—প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম, ম্যাকেবের ঘড়ির মত একটা ঘড়ি আপনা হইতে তৈয়ার হইয়াছে,—এরূপ ঘটনা দেখা যায় না। কিন্তু জীবদেহ

আপনাকে আপনি গড়িয়া তোলে। কোনও কারিগরের অপেক্ষা করে না। অবশ্য একবার অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্র একটু বীজ, যাহার মধ্যে কোনও অবয়বই খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর, সে আপনা-আপনি বাতাস হইতে, জল হইতে, মাটি হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া আপনার সমস্ত অবয়ব গঠন করিয়া ডাল-পালা পত্র-পুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ বটবৃক্ষে পরিণত হয়। জীবন হীন জড় পদার্থেরও চতুঃপার্শ্ব হইতে মশলা বাছিয়া লইয়া আপনাকে বিচিত্র আকারে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দেখা যায় বটে; যেমন মৃৎকণিকার পরে মৃৎকণিকা জমিয়া, মাটির স্তরের উপর স্তর জমিয়া, স্তরের চাপে স্তর জমাট বাঁধিয়া, পাহাড় পর্ব্বতের দেহ গঠিত হয়; অথবা চিনির দানা চিনির সরবত হইতে অনাবশ্যক জল বর্জ্জন করিয়া কেবল চিনির কণিকা সঙ্কলন দ্বারা বৃহদাকার মিছরিখণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু জীবদেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এবং জড় দেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে একটা পার্থক্য আছে। মাটির স্তর মাটি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, আর মিছরির দানা চিনি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, এমন কি, বিচিত্র আকার পর্য্যন্ত ধারণ করে; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কোনরূপ লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করে না। মহাকায় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র মিছরির দানা পর্যন্ত আত্মরক্ষা বিষয়ে একবারে উদাসীন। বায়ু, জল ও তুষার, হিম ও রৌদ্র, হিমালয়ের মাথা কাটাইয়া ও বুক চিরিয়া পর্ব্বতরাজকে জীর্ণ, বিদীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু পর্ব্বতরাজ একেবারে উদাসীন; ইহা নিবারণের জন্য তাঁহার কোন চেষ্টাই নাই। কালক্রমে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর ধূলি-কণায় পরিণত হইয়া যাইবে, তাহা নিবারণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মিছরির দানার পক্ষেও তাহাই. তাহাকে খলে ফেলিয়া চূর্ণ কর, আর জিহ্বায় দিয়া গলিত কর, আত্মরক্ষার জন্য তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। বাহিরের জগৎ হইেত শক্তিপ্রবাহ আসিয়া বৃহৎ হিমাচলকে ও ক্ষুদ্র মিছরিখণ্ডকে আঘাত করিতেছে; সেই আঘাতে তাঁহারা নড়িতেছেন, কাঁপিতেছেন, গলিতেছেন ও ক্ষয় পাইতেছেন। ইহাকে যদি সাড়া দেওয়া বলা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক আঘাতেই তাঁহারা সাড়া দেন। কিন্তু জীবদেহ যে ভাবে বাহ্য জগতের আক্রমণে সাড়া দেয়, সেরূপ ভাবে উহারা সাড়া দেয না। জীবদেহও আঘাত লাগিলে নড়ে, কাঁপে, চঞ্চল হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। অনেক সময় তাহারা সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা। আক্রমণ করিলে ছাগশিশু পলাইয়া যায়, সাপে ফণা তুলিয়া ছোঁ দেয়, ক্ষুদ্র পিপীলিকা কামড় দেয় ও জলৌকা আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। জন্তুর মধ্যে এমন কি, উদ্ভিদের মধ্যে এবং যাহা না-জন্তু, না উদ্ভিদ, জীব-সমাজে অতি নিম্ন স্থানে যাহাদের স্থান, তাহাদের মধ্যেও এই আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক জীব আপনার অবয়বগুলিকে এরূপে গড়িয়া লইয়াছে, যাহাতে সে বাহ্য জগতের সহিত বিরোধে সমর্থ হয়, যাহাতে বাহ্য জগতের সহস্রবিধ আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। জীবের যাবতীয় চেষ্টাই তাহার আত্মরক্ষার অনুকূল; জড় যন্ত্রে আমরা এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। যন্ত্র-নির্ম্মাতা কারিগর তাহাতে যে কয়টা অবয়ব দিয়াছেন এবং সেই অবয়বগুলিকে যে কার্য্যসাধনের

উপযোগী করিয়াছেন, জড় যন্ত্র কেবল সেই কয়টি অবয়ব লইয়া, সেই কয়টি কার্য্য সাধন করে মাত্র। ইহা অতিক্রম করিয়া এক পা চলিবার তাহার ক্ষমতা নাই। দেহের এই নূতন অবয়ব গড়িয়া আপনাকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই ব্যাঙাচি ব্যাঙে পরিণত হয় এবং মর্কট মানবে পরিণত হইয়াছে। দেহ-যন্ত্রের বিধান এ স্থলে অসাধারণ। মনস্বী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে দেখাইয়াছেন যে, জীব ও জড় উভয়েই বাহ্য শক্তির আঘাত পাইলে সাড়া দেয় এবং সেই সাড়া দিবার রীতিও উভয় পক্ষে একই প্রকার। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে জীবদেহের সাড়া দিবার ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, জড় দেহেরও এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়। সাড়া দিবার ক্ষমতাকে যদি জীবনের লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে জড় দ্রব্যেরও জীবন আছে এবং সেই জীবনের সমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও আছে। এ-পর্য্যন্ত আপত্তি চলিবে না। কিন্তু জীবের সাড়া দিবার চেষ্টা যেমন সর্ব্বতোভাবে তাহার জীবনরক্ষার অনুকূল, জড়ের চেষ্টা সেরূপ কোনও আত্মরক্ষার অনুকূল, তাহা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে।

পারিপার্শ্বিক শক্তির আঘাতে ও আক্রমণে আপনাকে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার এই ক্ষমতা জীবদেহে বর্ত্তমান। জীবদেহের আর একটা ক্ষমতা আছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি—সেটা সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা। পারিপার্শ্বিক সরবত হইতে জল বর্জ্জন করিয়া চিনি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা মিছরির দানার আছে; যেমন যব-গম, শাক-পাতা হইতে রক্ত-মাংসের উপাদান নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা জন্তুদেহে রহিয়াছে; মিছরির দানা খণ্ডিত করিলে সেই বিচ্ছিন্ন মিছরিখণ্ড নূতন করিয়া মিছরিজীবন আরম্ভ করিতে পারে। চারুপাঠোক্ত পুরুভুজ আপনাকে শতধা খণ্ডিত করে ও সেই নূতন পুরুভুজও নূতন করিয়া পুরুভুজ-জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। উচ্চতর জীবও আপনার কিয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত করিলে, সেই জীব নবজীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। জীবে ও জীবনহীন জড়ে এইরূপ সাদৃশ্যের আবিষ্কার চলিতে পারে। কিন্তু এই বীজের নবজীবন আরম্ভের একটা উদ্দেশ্য আছে। পিতা মাতা যেখানে মরণধর্ম্মশীল, বীজ সেখানে নবজীবন আরম্ভ করিয়া পিতা মাতার জীবনের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও সন্তত রাখে জীবন-প্রবাহকে রুদ্ধ হইতে দেয় না। সন্তানোৎপত্তির একটা উদ্দেশ্য আছে; ব্যক্তি যায়, কিন্তু জাতি থাকে। ব্যক্তি যে সকল ধর্ম্ম লইয়া বাহ্য জগতের সহিত লড়াই করিতেছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই সকল ধর্ম্ম উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের স্রোত থামিতে দেয় না। মিছরির খণ্ডে এই ক্ষমতা আছে বলিলে, মিছরি খণ্ড মিছরি-বংশ রক্ষার জন্য বংশবৃদ্ধি করিতে পারে বলিলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যুক্তি হইবে। ঘটিকাযন্ত্রের বাচ্চা হয় না; হইলে ঘড়ির কারখানা অনাবশ্যক হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে এত কালে যে সকল জীব ছিল না, কালক্রমে তাহারা আবির্ভূত হইয়াছে; অথচ এই সকল অভিনব জীব সৃষ্টি

করিবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে কোন কারখানা বসাইতে হয় নাই। প্রচুর প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীতে এক কালে মানুষ বা গরু ভেড়া বা পাখী বা সাপ-ব্যাঙ, এমন কি, মাছ পর্য্যন্ত ছিল না। কালক্রমে মাছের আবির্ভাব হইয়াছে। তার পর ক্রমশঃ ব্যাঙ, টিকৃটিকি পাখী চতুষ্পদ ও দ্বিপদের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন টিকৃটিকিই বা কত রকমের, পাখীই বা কত রকমের, পশুই বা কত রকমের এবং কালা ও ধলা এইরূপ জাতিভেদ করিলে মানুষই বা কত রকমের। এখন পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা; এক পয়সা দর্শনী না দিয়া আমরা এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়াছি। এক কালে জীবের অতি অল্পসংখ্যক জাতি ছিল, ক্রমশঃ এত অধিকসংখ্যক জাতির আবির্ভাব কিরূপ হইয়াছে, বুঝিবার জন্য নানা পণ্ডিত নানারূপ চেষ্টা করিয়াছেন। ডারুইন দেখিতে পাইলেন, জীবদেহে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর জীবদেহে কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম বিদ্যমান। প্রথমতঃ, জীব খাইতে না পাইলে বাঁচে না; খাইতে পাইলেও একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে মরিয়া যায়। এই মরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিলেও সন্তান জন্মাইয়া বংশরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। ইহা আত্মরক্ষারই অর্থাৎ মৃত্যুকে ফাঁকি দিবারই একটা প্রকারভেদ। সন্তান স্বভাবতঃ পিতামাতারই যাবতীয় ধর্ম্ম উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে আপনাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত করিয়া থাকে। একই পিতামাতার পাঁচটা সন্তান পাঁচ রকমের হয়, সর্ব্বতোভাবে এক রকমের হয় না। পাঁচটা সন্তানই জন্মলাভের পর বাহ্য জগতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সকলের সামর্থ্য ঠিক সমান হয় না: কাহারও একটু অধিক, কাহারও বা একটু অল্প সামর্থ্য থাকে। এই বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম কি ভীষণ, ডারুইনের পূর্ব্বে তাহা কেহ স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শীতাতপ, রৌদ্রবর্ষা, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, এ সকল ত আছেই; কিন্তু সংগ্রামের ভীষণতা মুখ্যতঃ অন্নের চেষ্টায়। বোধোদয়ে পড়া গিয়াছিল, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। কথাটা ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ধরাধাম নামক চিড়িয়াখানার মালিক সহস্রকোটি জীবকে এই চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্ন সংগ্রহের জন্য এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্তুত নহি: কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে ধরিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে কষ্ট হইবে না; অতএব পরমানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর। আহারদানের ও রক্ষা-কর্ম্মের ইহা অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর সেই পরমকারুণিক মালিকের অনুমতিক্রমে গরু ঘাস খাইতেছে, বাঘে গরু খাইতেছে, ঘাস ধানগাছের অন্নে ভাগ বসাইয়া ধানগাছের সংহার করিতেছে; আর ধানের অভাবে দুর্ভিক্ষহত মনুষ্য বসুন্ধরার ক্রোড়ে জীর্ণ কঙ্কাল ন্যস্ত করিয়া কৃমিকীটের ও শৃগালকুক্কুরের ও বায়স-গৃধ্রের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেছে। অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। এই ভীষণ জীবনযুদ্ধে যাহার সামর্থ্য আছে, পটুতা আছে, সেই ব্যক্তিই কায়ক্লেশে জিতিয়া যায় ও বংশরক্ষার অবসর পায়। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা

অপটু, তাহারা বংশরক্ষায় সমর্থ হয় না। কে কিসে জয়লাভ করে, বলা কঠিন। কেহ ধারাল দাঁতের জোরে, কেহ জোরাল শিঙের বলে, কেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বলে জয় লাভ করে। কেহ সম্মুখযুদ্ধে সামর্থ্য দেখাইয়া জিতিয়া যায়—তাহার বংশ-পরম্পরার শেষ পরিণতি সিংহ ও শার্দ্দূল। কেহ বা রণে ভঙ্গ দিয়া "যঃ পলায়তে স জীবতি' এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে—তাহারা বংশধর শশক ও হরিণ। ফলে জীব-সমাজে একটা অবিরাম বাছাই কার্য্য চলিতেছে। পণ্ডিতেরা ইহার নাম দিয়াছেন—প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। জীবন-সংগ্রামে যাহাদের কোন-না-কোনরূপ পটুতা আছে, তাহাদিগকেই বাছাই করিয়া লওয়া হয়। যাহাদের পটুতা নাই, তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলা হয়। এই বাছাই-কার্য্য যে নিতান্ত অপক্ষপাতে ও বিবেচনাসহকারে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে। অনেকে পটুতা সত্ত্বেও সামান্য ত্রুটিতে মারা পড়ে; অনেকে অপটু হইয়াও ফাঁকি দিয়া বাঁচিয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিকট হারি মানেন। তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বাছাই-কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে; কাজেই মোটের উপর যাহারা কোন-না-কোন কারণে বাহ্য জগতের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত, সমর্থ ও দক্ষ, তাহারাই বাঁচিয়া গিয়াছে। যাহার যে অবয়ব এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই অবয়ব পুরুষানুক্রমে গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে। যাহার যে ক্ষমতা এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জীবের দেহ-যন্ত্রের অন্তর্গত অবয়বগুলিতে জীবনরক্ষার অনুকূল নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের জীববিদ্যাবিশারদেরা এই কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। নাক কান প্রভৃতি যে-কোন একটা অবয়বের মধ্যে কত কারিগরি, কত কৌশল। আবার যে জীবের পক্ষে যেমনটি আবশ্যক, তাহার পক্ষে তেমনই বিধান। অসম্পূর্ণতা আছে সন্দেহ নাই; অসম্পূর্ণতা না থাকিলে জীবের আধিব্যাধি শোকতাপ হইবে কেন? তৎসত্ত্বেও এত গঠন-কৌশল দেখা যায়,—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে জীবনরক্ষা, সেই জীবনরক্ষার অনুকূল এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এক কালে এই সকল কৌশলের আলোচনায় রোমাঞ্চিত হইতেন এবং এই যন্ত্রের নির্ম্মাণকর্ত্তার স্তুতিগানে নাগরাজের মত সহস্র-কণ্ঠ হইয়া পড়িতেন। ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জীবদেহের নির্ম্মাণ-কর্ত্তাকে কোনরূপ কারখানা খুলিতে হয় নাই। এমন কি, মাথা খাটাইয়া কোনরূপ নক্শা বা ডিজাইন প্রস্তুত করিতে হইয়াছে কি না, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। অথচ তিনি এমনই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, জীবদেহ আপনা হইতে আপনাকে সহস্র বিভিন্ন উপায়ে গঠিত ও পরিণত করিয়া লইয়াছে। জীবদেহের যে কয়েকটি শক্তি গোড়ায় মানিয়া লওয়া গিয়াছে, সেই শক্তি কয়টা থাকিলে এরূপ হইবেই ত! বাঘের মধ্যে যে বাঘ দন্তহীন, চিলের মধ্যে যে-চিল দৃষ্টিহীন, হরিণের মধ্যে যে-হরিণ পলায়নে অক্ষম, প্রজাপতির মধ্যে যে-প্রজাপতি বিচিত্রবর্ণ ডানা প্রসার করিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আপনাকে গুপ্ত করিয়া শত্রুর মুখে

ছাই দিতে পারে না, ফুলের মধ্যে যে-ফুল মধুর প্রলোভনে, রঙের আকর্ষণে, গন্ধের প্ররোচনায় প্রজাপতিকে আকর্ষণ করিয়া তাহা দ্বারা আপনার পরাগ-রেণু পুষ্পান্তরে বহন করাইয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, জীবন সংগ্রামে তাহার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা নাই; সে বংশ রাখিবার অবকাশ পায় না। যাহাদের ঐ ঐ গুণ আছে, তাহারাই মোটের উপর বাঁচিয়া থাকে ও বংশ রাখে। তাহাদেরই বংশধরের দেহের গঠনে আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত আবশ্যক ঐ সকল কৌশল দেখিয়া আমাদের অতিমাত্র বিস্মিত হইবার সম্যক্ হেতু নাই।

আত্মরক্ষা করিতে হইলে যাহা হেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে যাহা প্রতিকূল, তাহাকে কোনরূপে বর্জ্জন করিতেই হইবে। যাহা উপাদেয় অর্থাৎ জীবন-সমরে অনুকূল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জীব-মাত্রেরই এই চেষ্টা থাকিবে। নতুবা সে সমরে পরাভূত হইবে, তাহার বংশ থাকিবে না। এই সকল জীবের মধ্যে যাহারা আবার উচ্চশ্রেণীতে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়-গ্রহণের জন্য একটা অতি অদ্ভুত কৌশলের আবির্ভাব দেখা যায়। এই শ্রেণীর জীব উপাদেয়-গ্রহণে সুখ পায়, আর হেয়-বর্জ্জন করিতে না পারিলে দুঃখ পায়। জীবমধ্যে এই সুখদুঃখের আবির্ভাব কবে কোথায় কিরূপে হইল, এ একটা সমস্যা। বুদ্ধিজীবী মানুষ হয়ত এমন একটা ঘটিকা-যন্ত্র তৈয়ার করিতে পারে যে, সেও হেয়-বর্জ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে সমর্থ হইবে। এমন ঘড়ি তৈয়ার করা চলিতে পারে যে, কোন ব্যক্তি তাহার পেণ্ডুলমে হাত দিতে গেলে অমনই একটা দাঁতাল চাকা বাহির হইয়া হাতে কামড়াইয়া ধরিবে; অথবা দম ফুরাইয়া গেলে, সেই ঘটিকা যন্ত্র একটা লম্বা হাত বাড়াইয়া দিয়া সূর্য্য-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া সেই সূর্য্যরশ্মির উত্তাপে আপনার দম আপনি দিয়া লইবে। প্রথমটা হইবে হেয়-বর্জ্জন, দ্বিতীয়টা হইবে উপাদেয়-গ্রহণ। কিন্তু এই কার্য্যে সমর্থ হইলে ঘটিকা-যন্ত্র সুখী, আর অসমর্থ হইলে দুঃখী হইতে পারিবে, এ কথা বলিতে সাহস করি না। ঘটিকা-যন্ত্র সুখদুঃখ অনুভবে অসমর্থ। সকল জীবই যে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে, তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না; অণুবীক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র জীবাণু দেখা যায়, তাহাদের কথা দূরে আস্তাম্, কেঁচো কিংবা জোঁকের মত অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব, যাহারা অহরহঃ আত্মরক্ষার জন্য হেয়-বর্জ্জন করিতেছে ও আত্মপুষ্টির জন্য উপাদেয় গ্রহণ করিতেছে, তাহারাও সুখদুঃখ অনুভবে সমর্থ কি না, বলা কঠিন। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আসিয়া তর্ক তুলিলেন, কেঁচো জোঁক দূরে থাক্, আপনি,—যিনি সর্ব্বতোভাবে আমারই মত মনুষ্যধর্ম্মা জীব, আপনারই যে সুখদুঃখের অনুভবক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আপনাকে হাসিতে দেখি ও কাঁদিতে দেখি এবং উভয় স্থলেই আপনার মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশ ও চীৎকারের রীতি দেখিয়া আমি অনুমান করিয়া লই, আপনি আমারই মত হাসির সময় সুখভোগ করেন ও কান্নার সময় দুঃখভোগ করেন। কিন্তু উহা আমার অনুমান মাত্র, আপনার সুখদুঃখের অনুভব কস্মিন্ কালে কোন উপায়ে আমার প্রত্যক্ষ হইতে পারিবে না। আমি নিজের সুখদুঃখ প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারি; অন্যের সুখদুঃখ আমার কাছে কেবল তাঁহার মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশের অতিরিক্ত কিছুই নহে। বস্তুতই জীব

মাত্রই automaton কি না, সুখদুঃখবোধ-ক্ষমতায় সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত যন্ত্র মাত্র কি না, ইহা লইয়া সেকালের পণ্ডিত দে কার্ত্তে হইতে একালের পণ্ডিত হক্সলি পর্য্যন্ত তর্ক করিয়া আসিতেছেন। সে কথা থাক্। যখন জ্ঞানগোচর জগতের এক আনা আমার প্রত্যক্ষগোচর, বাকী পনর আনার জন্য আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাশয়ও আমারই মত সুখানুভবে ও দুঃখানুভবে সমর্থ। মহাশয় যখন সমর্থ, তখন মহাশয়ের শাখালম্বী পূর্ব্বপুরুষও সমর্থ ছিলেন এবং গরু-ভেড়া, চিল-শকুনি, টিকটিকি-গিরগিটি, মাছি-মশা পর্য্যন্তও না হয় সুখদুঃখ-বোধে সমর্থ, ইহা স্বীকার করিয়া লইলাম।

জীবের এই সুখদুঃখের অনুভব-ক্ষমতা কিরূপে পুষ্ট হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ডারুইন-শিষ্যেরা বড় কুণ্ঠা বোধ করবেন না। এই অনুভবে জীবের লাভ আছে কি না, তাঁহারা কেবল ইহাই দেখিবেন। যদি এই অনুভব-ক্ষমতা জীবন-দ্বন্দ্বে কোনরূপ সাহায্য করে, তাহা হইলে উহার অবির্ভাবের জন্য ডারুইন-শিষ্য চিন্তিত হইবেন না। বলা বাহুল্য যে, অনুভবশক্তি হীন জীব অপেক্ষা অনুভবশক্তি যুক্ত জীবের জীবন-সংগ্রামে জয়ের সুযোগ অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, সুখদুঃখভোগী জীবের সহিত ইতর জীবের এ বিষয়ে তুলনাই হয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উন্নত জীবের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মোটের উপর উপাদেয় গ্রহণেই তাহার সুখ ও হেয় বর্জ্জন করিতে না পারিলেই তাহার দুঃখ। যদি কোন দুর্ভাগ্য জীব হেয়-গ্রহণে সুখ পায় বা উপাদেয়-বর্জ্জনে আনন্দ অনুভব করে, পতঙ্গের মত আগুন দেখিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়, অথবা পরমান্নদর্শনে বমন করে, ধরাধামে তাহার স্থান হইবে না; বংশরক্ষাতেও তাহার অবসর ঘটিবে না।

যে বাহ্য জগতের সহিত জীবের যুগপৎ মিত্রতা ও শক্রতা, সেই বাহ্য জগতের কিয়দংশ সে সুখজনক ও কিয়দংশ দুঃখজনকরূপে দেখিয়া থাকে। মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষ দেহমধ্যে পাঁচ পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের দরজা খুলিয়া বিশ্ব-জগতের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া আছে। চারি দিক্ হইতে জাগতিক শক্তিসমূহ তাহার সেই ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। সেই আঘাত-পরম্পরা গোটাকতক তার বাহিয়া মাথার ভিতর প্রবেশ করিলে মাথার মগজ কিলবিল করিয়া উঠে। মনুষ্যদেহ যন্ত্র মাত্র, বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় সেই যন্ত্র সাড়া দেয়। কিন্তু আমার মাথার খুলির ভিতরে যে এমন কাণ্ড হইতেছে, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি না। ঐসকল জাগতিক শক্তির সহিত, ঐ আঘাত পরম্পরার সহিত আমার মুখ্যতঃ কোনও সম্পর্ক নাই; আমার সহিত মুখ্য সম্পর্ক কয়েকটা অনুভূতির; পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে পাঁচ রকমের অনুভূতি জন্মে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। মাথার খুলির ভিতর কিলবিলের কথা আমি কিছুই জানি না; আমি জানি কেবল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের সহিত আমার মুখ্য সম্পর্ক, অথবা এক মাত্র সম্পর্ক। কেন না, আমার পক্ষে বাহ্য জগৎ, যে বাহ্য জগৎকে আমি জানি, সেই জগৎ রূপ রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শময়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শহীন জগৎ যদি থাকে, তাহা আমার জ্ঞানগোচর নহে। এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শ যে আমি অনুভব করিতেছি,

ইহাই আমার জ্ঞান; আমি ইহাই জানি, বাহ্য জগৎ সম্পর্কে আর কিছুই জানি না। জীবনহীন যন্ত্রের এই বোধ নাই। ঘটিকা-যন্ত্র বা এঞ্জিন-যন্ত্র রূপ রস সম্বন্ধে বোধহীন; অতএব বাহ্য জগৎ সম্বন্ধেও সে একেবারে জ্ঞানহীন। আবার জীবন থাকিলেই যে এই জ্ঞান থাকিবে, তাহাও জোর করিয়া বলিতে পারি না। কেঁচো কিংবা জোঁক বাহ্য জগতের উত্তেজনা পাইলে সাড়া দেয়, – জড় যন্ত্রে যেমন সাড়া দেয়, তার অপেক্ষা অনেক ভাল সাড়া দেয়,—কিন্তু বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে কেঁচোর বা জোঁকের কোনরূপ জ্ঞান আছে, ইহা খুব জোরের সহিত কেঁচো-তত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন না। জীবজগতের উচ্চতর প্রকোষ্ঠে যাহাদের বাস, তাহাদেরই এই জ্ঞান আছে, ইহাই আমরা অনুমান-পূর্ব্বক বলিতে পারি।

ফলে উন্নত জীব বাহ্য জগৎকে জানে না; সে জানে কেবল রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শকে। এই রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের পরম্পরাই তাহার নিকট বাহ্য জগৎ। কোন রূপ, কোন রস, কোন শব্দ, কোন স্পর্শ জীবের সুখপ্রদ—তাহাই তাহার উপাদেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য সে ব্যাকুল; যাহা দুঃখপ্রদ, তাহাই তাহার হেয়; তাহা বর্জ্জন করিতে সে ব্যস্ত। সে আর কিছু দেখে না। কোন্ অনুভবটা সুখ দেয়, কোনটা দুঃখ দেয় তাহাই দেখে ও তদনুসারে যাহা সুখজনক, তাহা গ্রহণ করে ও যাহা দুঃখজনক, তাহা বর্জ্জন করে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এইরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে. যাহা জীবনরক্ষার অনুকূল, তাহাই মোটের উপর আরাম দেয়, যাহা মোটের উপর প্রতিকূল, তাহাই দুঃখ দেয়। মোটের উপর বলিলাম, কেন না, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল কোথাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; সর্ব্বত্রই খট্‌কা আছে ও অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই পতঙ্গ বহ্নিমুখে বিবিক্ষু হয়। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই গাঁজা গুলি ও মদের দোকান চলিতেছে। জীবন-সমরে প্রতিকূল হইলেও মানুষের ঐ সকল দ্রব্যের প্রতি নেশা আছে—উহা একরকমের আরাম দেয় ও ভ্রমক্রমে উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। মানুষ পতঙ্গ দেখিয়া শুনিয়াও সেই আরামের লোভে ঐ সকল বহ্নির মুখে প্রবেশ করিতে যায়। এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মোটের উপর যাহা জীবন-দ্বন্দ্বে অনুকূল, তাহাই সুখজনক বলিয়া উপাদেয় ও যাহা প্রতিকূল, তাহা দুঃখজনক বলিয়া হেয়।
এই রূপ-রসাদির জ্ঞান এবং তৎসহিত সুখদুঃখের অনুভবের আবির্ভাব উচ্চতর জীবকে জীবন-সমরে আশ্চর্য্যভাবে সমর্থ করিয়াছে। আগুনে হাত দেওয়া জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে, আমরা আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই; আগুনের ভয়ে নহে, আগুন যে বেদনা দেয় তাহারই ভয়ে। এইরূপ সর্ব্বত্র। যাহা দুঃখজনক, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দূরে যাই; যাহা সুখজনক, তাহাকে টানিয়া লই। পায়সান্ন দেখিলেই আমাদের লালা নিঃসরণ হয়, আর কটু ও তিক্তরস হইতে আমরা রসনা সংবরণ করি। এইরূপে আমরা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। সময়ে সময়ে পতঙ্গ-বৃত্তির জন্য ঠকিতে হয় বটে। কিন্তু মোটের উপর জীবন-যাত্রার প্রণালী এই যে, সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে ও দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে। এই শিক্ষা আমরা প্রকৃতিদেবীর পাঠশালায় লাভ করিয়াছি।
যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট ভরিয়া খায়, আর

লুচিমণ্ডায় সঙ্কোচ বোধ করে, প্রকৃতিদেবী তাহাদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হয়; তাহাদের বংশে বাতি দিতে কেহ থাকে না। কাজেই যাহাদের সুখলাভের ও দুঃখপরিহারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই প্রকৃতির পাঠশালা হইতে পাস করিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লক্ষ পুরুষের গলা-টেপার পর জীবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মাষ্টার মহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য বেত মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয়; কিন্তু এই নিষ্ঠুর লেডী মাষ্টার যে মন্দ ছেলেদের একেবারে গলা টিপিয়া দেন, তজ্জন্য আমরা ক্ষুব্ধ হই না।

জীবন-রক্ষার জন্য এই প্রবৃত্তিগুলার এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতিদেবী সেগুলার সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে একবারেই তাকান নাই। তাঁহার নিষ্ঠুর আইনের প্রয়োগে একবারে কঠোর বিধান বাঁধিয়া দিয়াছেন। ক্ষুধা লাগিলেই খাইতে হইবে, তৃষ্ণা হইলেই জলের অন্বেষণ করিতে হইবে, বাঘের মুখ হইতে পলাইতেই হইবে; আগুন হইতে হাত গুটাইয়া লইতেই হইবে; এ সকল বিষয়ে আমাদের ভাবিবার অবসর নাই, আমাদের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এই সকল প্রবৃত্তির নাম সংস্কার। উচ্চতর জীব যখনই ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি লইয়া জন্মে,—পিতামাতার নিকট হইতে জন্ম সহ এই সংস্কার প্রাপ্ত হয়। জন্ম সহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাদের নাম দিতে পারি সহজাত বা সহজ সংস্কার; ইংরেজীতে বলে instinct। এই সকল সহজ সংস্কার জীবকে জীবন-পথে চালাইতেছে; মোটের উপর সুপথেই চালাইতেছে; যে পথে গেলে জীবন রক্ষা হইবে, সেই পথেই চালাই-তেছে। কাজেই সহজ সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকিলে, মোটের উপর জীবন-যাত্রা বেশ চলিয়া যায়। মোটের উপর,—কেন না, বাহ্য জগৎ হইতে এমন সকল আক্রমণ আসে, সহজ সংস্কারে যে স্থলে কোনরূপ কর্ত্তব্য উপদেশ দেয় না। জীবের জীবনে যে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ সদাসর্ব্বদা ঘটিতেছে, সেগুলার সম্বন্ধে সহজ সংস্কারই প্রধান অবলম্বন। এখানে সংস্কারের বলেই কর্ত্তব্য নির্ণয় হয়; ভাবিবার চিন্তিবার অবসর থাকে না। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটে, রূপ-রস-গন্ধাদির এমন মিশ্রণ মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে; তাহার সহজ সংস্কার তখন তাহাকে কোনও লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে না। অনুক্ষণ এই সকল আক্রমণ ঘটে না বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই শ্রেণীর আক্রমণ হইতে ঝটিতি পরিত্রাণের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই জীব এখানে কি করিবে, তাহা সহসা ঠাহর করিতে পারে না। যে সকল আঘাত ও উত্তেজনা কখনও বা সুখ দেয়, কখনও বা দুঃখ দেয়, কখনও বা সুখ দুঃখ কিছুই দেয় না, জীব সেই সকল স্থলে সুখলাভের বা দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করিতে গিয়া সময়ে সময়ে ঠকিয়া যায়; আপাততঃ সুখজনক বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে ও পরিণামে তাহা হয়ত দুঃখ আনয়ন করে। জামের মত যদি আফিমের গুলি সুলভ হইত, তাহা হইলে অহিফেন-তৃষ্ণা দমনের জন্য প্রকৃতিদেবীই একটা ব্যবস্থা করিতেন; সুলভ নহে বলিয়াই মানুষ এখানে নেশার অধীন। সেইরূপ আপাততঃ দুঃখ মনে করিয়া যাহাকে পরিহার করে, তাহা পরিণামে হয়ত কল্যাণকর হইতে পারিত। সহজ সংস্কারের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে এ-সকল স্থলে পরিণামে মঙ্গল হয় না।

অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত এই যে, এইরূপ স্থলেও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি জীব একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেখানে সহজ সংস্কার কোনও উপদেশ দেয় না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আসিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তি উন্নত জীবে আত্মরক্ষার্থ অর্জ্জন করিয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য। উন্নত জীবের মধ্যে আবার যাহারা অত্যুন্নত প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যেই এই বৃত্তি ও এই ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায়। মৌমাছি অতি অদ্ভুত ধরণের মৌচাক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধু সঞ্চয় করে। পিঁপীড়া আরও অদ্ভুত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থা করে; কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক করে, ইহা বলা চলে না। উহারা সহজ সংস্কারের প্রভাবেই ঐ সকল কাণ্ড করিয়া থাকে। মৌমাছি যন্ত্রের মত পুরুষানুক্রমে তাহার চাক নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে; পিঁপীড়া যন্ত্রের মতই তাহার সমাজ বাঁধিয়া আসিতেছে; এ সকল কার্য্যে তাহারা সংস্কারবশে বাধ্য আছে অথবা প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত আছে; এ বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা স্বাধীনাতা কিছুই নাই। কেন, কি উদ্দেশ্যে তাহারা ঐরূপ করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। জীবন ধরিতে গেলে উহাদিগকে ঐরূপ করিতেই হইবে। না করিলে জীবন-যাত্রা চলে না বলিয়াই প্রকৃতিদেবী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা উহাদিগকে ঐ প্রবৃত্তি ও ঐ ক্ষমতা দিয়াছেন। যাহাদের ঐ প্রবৃত্তি ছিল না বা ঐ ক্ষমতা ছিল না, তাহাদিগকে টিপিয়া মারিয়াছেন। উচ্চ পশু-পক্ষীর বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আছে কি না, বলা বিষম সমস্যা। তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যখন তাহার মাহুতের মাথায় নারিকেল প্রহার করিয়াছিল, তখন সে যে বিচার-শক্তির পরিচয় দেয় নাই, তাহা বলা দুষ্কর। আমার কোন আত্মীয় মহাজনি ব্যবসা করিতেন; তাঁহার বাড়ীর দরজায় খাঁচার মধ্যে একটি ময়না পাখী ঝুলিত। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা দিবা মাত্র পাখী জিজ্ঞাসা করিত, "টাকা এনেছিস?" পাখীর এই কর্ম্ম কতটুকু সংস্কার-প্রেরিত, আর কতটুকু বিচারপূর্ব্বক কৃত, বলা কঠিন। কিন্তু বানর যখন তাহার পালকের আদেশক্রমে কদম গাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও শাশুড়ীকে ভেংচায়, তখন তাহার এই ব্যবহার যে বুদ্ধিপূর্ব্বক আচরিত হয় না, ইহা বলা কঠিন। সে যাহাই হউক, জীবের মধ্যে মনুষ্য এই বৃত্তির পরা কাষ্ঠা পাইয়াছে। এই বৃত্তির উৎকর্ষহেতু মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ।

এই বুদ্ধিবৃত্তি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কেন না, সহজ সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, অথবা ঠকাইয়া দেয়, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে গন্তব্য নির্ণয় করিয়া জীবন-রক্ষার উপায় করে; বুদ্ধিজীবী মনুষ্যই সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করে এবং অমাবস্যার নিশি পালনে ব্যবস্থা দেয়। বুদ্ধিবৃত্তি জীবন-রক্ষায় যখন অনুকূল, তখন ডারুইন-শিষ্যের আর ভাবনা নাই। তিনি অকুতোভয়ে বলিলেন, ঐ বুদ্ধি-বৃত্তিও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে লব্ধ। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে ইহার তীক্ষ্ণতা ও পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সহজাত সংস্কারের সহিত ইহার অত্যন্ত প্রভেদ। মানুষ পিতামাতার নিকট হইতেই এই বুদ্ধিবৃত্তি

পাইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্য মানুষকে শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হয়। মানুষ জন্মকালে যে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে, জন্মের পর শিক্ষার দ্বারা সেই বৃত্তির প্রয়োগ-প্রণালী শিখিয়া লয়। পিতামাতা যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই, যে অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, পুত্র সেই অবস্থায় পড়িলে কিরূপে চলিতে হইবে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহা স্থির করিয়া দেয়। এমন কি, পিতামাতা কোনও অবস্থায় পড়িয়া বুদ্ধিপ্রভাবে যদি কোন পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন, পুত্র জন্ম মাত্রেই সে পথ জানিতে পারে না। তাহাকে নূতন করিয়া তাহা শিখিয়া লইতে হয়। এই শিক্ষা মোটের উপর ঠেকিয়া শেখা। এখানে সুখ-দুঃখের উপর নির্ভর চলে না। বাহ্য জগতের কোন আক্রমণ আমাকে একটা আঘাত দিয়া গেল, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলাম না ; সহজ সংস্কার এখানে পথ দেখাইয়া দেয় নাই ; আমি ঠেকিয়া গেলাম। কিন্তু এই যে ঠেকিয়া গেলাম, এই ঘটনাটা আমার অভ্যন্তরে মুদ্রিত ও অঙ্কিত রহিল। পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য আমি প্রস্তুত থাকিলাম। সে-বার আর আমি ঠকিলাম না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি আমাকে বলিয়া দিয়াছে, এইরূপে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। গ্রামে প্লেগ প্রবেশের পূর্ব্বে ইঁদুর মারিতে হইবে, মানুষের সহজ সংস্কার তাহা বলে না ; মানুষ ইহা ঠেকিয়া শিখিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা-ফলে এইরূপে আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই। বাহ্য জগতের আক্রমণ নানা দিক্ হইতে নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদিগকে নানারূপে ঘা দিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি : ভবিষ্যতের আক্রমণ যাহাতে বিপন্ন করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কি করিলে কি হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। আমরা সেই ধারণা সঞ্চয় করিতেছি ও আবশ্যক-মত প্রয়োগ করিতেছি। কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর কিরূপ সম্পর্ক, কোন্টা হিতকর, কোন্টা অহিতকর, কোন্টা আপাততঃ সুখদায়ক হইলেও হেয় বা দুঃখ-দায়ক হইলেও উপাদেয়, তাহার সমাচার আমাদের মধ্যে আমরা মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা গন্তব্য পথ নিরূপণ করিতেছি। সহজাত পাশবিক সংস্কারের বশে যন্ত্রবৎ নীয়মান না হইয়া আমরা স্বাধীন ভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। যে রূপ, রস, গন্ধ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, সেই রূপ, রস, গন্ধকেই আমরা স্বকার্য্য সাধনে প্রেরণ করিতেছি। তাহাদিগকেই আমরা খাটাইয়া লইতেছি। তাহারা শত্রুভাবে আসিলেও তাহাদিগকে আমরা জীবন-রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতেছি। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকতা। মনুষ্য এই অর্থে বৈজ্ঞানিক জীব। বিশ্ব-জগতের মধ্যস্থলে আমি বসিয়া আছি, এবং বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে সহস্র সমাচার আমার ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রবেশ করিয়া আমায় অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছে। আমি নিরীক্ষণ করিতেছি, আমি সাক্ষী ; আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা চিত্তপটে আঁকিয়া রাখিতেছি এবং প্রয়োজন-মত তাহা আমার কাজে লাগাই-তেছি। কাজ, কি না—জীবনরক্ষা। রূপ-রসাদির প্রবাহ আসিয়া আমার চিত্তপটে রেখা টানিয়া যাইতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছি। অতএব আমি বৈজ্ঞানিক।

কিসে কি হইতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি ঘটিতেছে, ইহা বসিয়া বসিয়া দেখা এবং এই দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবন-যুদ্ধেরকাজে লাগান, বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র কার্য্য। মনে করিও না যে, বগলে থার্মমিটার ও চোখে দূরবীন না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। ষ্টীম-ইঞ্জিন আর ডাইনামো, আর মোটর গাড়ী আর গ্রামোফোন দেখিয়া ভুল বুঝিও না যে, যন্ত্রতন্ত্রের বহ্বারম্ভ না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। বসিয়া বসিয়া জগদ্‌যন্ত্রের গতিবিধির আলোচনা ও সেই আলোচনাকে আপন জীবনযাত্রায় নিয়োগ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই অর্থে আমরা সকলেই ছোট বড় বৈজ্ঞানিক। এমন কি তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী যে রাগ করিয়া মাহুতের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, সেও যে একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক ছিল না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারিনা। আজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকের হাতে, কেল্‌বিনের হাতে, অথবা এডিসনের হাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনার সংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত হইবার হেতু নাই; মানবের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলি কোন্ অতীত কালে কোন্ অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার খবরও রাখে না। আমাদের যে অরণ্যবাসী পূর্ব্বপিতামহ সর্ব্বপ্রথমে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোনও এডিসনের কোনও উদ্ভাবনা তাহার সহিত তুলনীয় নহে। তুমি, আমি, সে, প্রত্যেকেই এই বিশ্ব-জগতের দিকে চাহিয়া আছি ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি, তাহাই আমাদের কাজে লাগাইতেছি। আমরা সকলেই বৈজ্ঞানিক, কেহ ছোট, কেহ বড়। প্রত্যেকেই আমরা কিছু-না-কিছু নূতন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং এই আবিষ্কৃত ঘটনা সমষ্টি পুঞ্জীভূত হইয়া ও পুরুষপরম্পরাক্রমে সঞ্চিত হইয়া মানব জাতির অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছি।

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্ব-জগতের পর্য্যবেক্ষক। সকলের দৃষ্টিশক্তি সমান নহে। কেহ উপর উপর দেখেন, কেহ তলাইয়া দেখেন। কাহারও দৃষ্টি স্থূল, কাহারও সূক্ষ্ম; কেহ দূরের বস্তু দেখেন, কাহারও দৃষ্টি সমীপদেশেই নিবদ্ধ। কেহ অত্যন্ত চক্ষুষ্মান, কেহ বা চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধের মত ব্যবহার করেন। কেহ আন্দাজে দূরত্ব নিরূপণ করেন, কেহ গজকাঠি হাতে লইয়া মাপিয়া দেখেন। কেহ সহজ চোখে তাকান, কেহ চোখের সম্মুখে চশমা ও পরকলা লাগাইয়া দেখেন। সহজ চোখে যাহা দেখা যায়, চোখের সামনে খানকতক কাচের পরকলা রাখিলে তার চেয়ে অধিক দেখা যায়, কাজেই যে বড় বৈজ্ঞানিক, সে দূরবীন দিয়া দূরের জিনিষ দেখে বা অণুবীক্ষণ দিয়া ছোট জিনিষ বড় করিয়া দেখে। জগতে যাহা আপনা হইতে ঘটিতেছে, কেহ তাহাই দেখিয়া তুষ্ট; কেহ বা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়া দেখিয়া তুষ্ট। পাঁচটা দ্রব্য পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরস্পর ব্যবহার দেখিলে, তাহাদের দ্বারা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়া দেখিলে, অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়—যাহা কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় না। এইরূপ ঘটনা-ঘটানর নাম পরীক্ষা করা, ইংরেজীতে বলে experiment করা; আমরা সকলেই কিছু-না-কিছু experiment করিতেছি। বৈজ্ঞানিকতা যাঁহার ব্যবসায়, তাঁহাদের কেহ অক্সিজন আর হাইড্রোজনে আগুন ধরাইয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ দস্তার উপর দ্রাবক ঢালিয়া দেখিতেছেন, কি হয়;

কেহ চুম্বকের নিকট লৌহখণ্ড ধরিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্ছার লেজ গজায় কি না; কেহ রোগীকে কোন ঔষধ গেলাইয়া দেখিতেছেন, সে শীঘ্র ভব-সংসার পার হয় কি না। এইরূপ ঘটনা ঘটাইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুচারু ব্যবস্থা করায় সম্প্রতি মনুষ্যের অভিজ্ঞতা অতি-মাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে এবং এই রীতির অবলম্বন হেতু বৈজ্ঞানিকতার মাহাত্ম্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফলে আমিও দেখি, তুমিও দেখ, আর লর্ড কেল্‌বিনও দেখেন: কিন্তু তুমি আমি যাহা দেখি, লর্ড কেল্‌বিন তাহার তুলনায় অনেক অধিক দেখেন, অনেক সূক্ষ্ম দেখেন, আন্দাজ না করিয়া মাপ করিয়া দেখেন এবং দেখিতে যাহাতে ভুল না হয়, তাহার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করেন; ইন্দ্রিয় যাহাতে প্রতারিত না করে, তাহার ব্যবস্থা করেন। আবার আমরা যাহা কাজে লাগাইতে পারি না, কেল্‌বিন অবলীলাক্রমে তাহা কাজে লাগান; আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক; কেহ অতি ছোট, কেহ অতি বড়।

বিশ্ব-জগতের ঘটনা-পরম্পরা বৈজ্ঞানিক বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন; কিন্তু উহা কেন ঘটিতেছে, কি উদ্দেশ্যে ঘটিতেছে, তাহা কিছু বলিতে পারেন কি? এই প্রশ্নের এক মাত্র উত্তর—না। বৃন্তচ্যুত নারিকেল ভূমিতে পড়ে; কিন্তু কেন পড়ে, তাহার উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্য্যন্ত দেন নাই, কেহ দিবেন না। পৃথিবীর আকর্ষনে পড়ে বলিলে, কোনও উত্তর হইল না; কেন না, পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে, তার পরেই এই প্রশ্ন আসিবে। পৃথিবী বিকর্ষণ না করিয়া আকর্ষণ করে কেন, তাহা কে জানে? বিকর্ষণ করিলে অবশ্য আমাদের সুবিধা হইত না, নারিকেল আমাদের ভোগে লাগিত না; কিন্তু পৃথিবী যদি বিকর্ষণই করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতাম বোঁটা হইতে খসিবা মাত্র যদি নারিকেল তাহার শস্য সমেত ও ক্ষীর সমেত বেলুনের মত উধাও হইয়া উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক হতাশভাবে ঊর্দ্ধমুখে দূরবীক্ষণ লাগাইয়া চাহিয়া দেখিতেন এবং কত মিনিটে কত ঊর্দ্ধে উঠিল, তাহার হিসাব রাখিতেন। কিন্তু নারিকেল ফল্ রসকরায় পরিণত হইত না। পদার্থ-বিদ্যা খুলিয়া ছেলেরা দেখিত, লেখা আছে, পৃথিবী সকল দ্রব্যকেই আকর্ষণ করেন, কিন্তু নারিকেলের প্রতি তাঁহার অন্য ব্যবহার; নারিকেলকে তিনি টানেন না, ঠেলিয়া দেন। মনুষ্যজাতির সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী নারিকেলকেও টানিতেছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু কেন যে পৃথিবীর এই আকর্ষণ প্রবৃত্তি, তাহার কোনও উত্তর নাই। হয়ত নিউটনের কোনও পরবর্ত্তী পুরুষ দেখাইবেন, নারিকেল ও পৃথিবীর মাঝে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, যাহার ফলে এই আকর্ষণ; অথবা পিছন হইতে নারিকেল এমন কিছু ঠেলা পাইতেছে, তাহাতেই তাহার ভূ-পতনে প্রবৃত্তি; কিন্তু ইহাতেও সেই 'কেন'র উত্তর মিলিল না। কোন পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন, পিছন হইতে কণিকা-বৃষ্টির ঠেলা পাইয়া উভয় দ্রব্য পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই অনুমান সঙ্গত হইলেও, সেই কণিকা-বৃষ্টিই বা কেন

হয় এবং ঠেলাই বা কেন দেয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই।

এইরূপ কারণ-অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকের কতকটা অধিকার আছে বটে; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। জাগতিক বিধান বৈজ্ঞানিকের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতেছে; কোন ঘটনাই তাঁহার পরামর্শ লইয়া যাইতেছে না। তিনি কেবল বসিয়া বসিয়া দেখিবার অধিকারী। তিনি যাহা দেখেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন, তাহারই আলোচনা করেন এবং সম্ভব হইলে সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের কি কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান করেন। জগতের যত ঘটনা ঘটিতেছে, সবই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপে ঘটিত, কোনটার সহিত কোনটার কোন সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। অন্ততঃ তিনি ঐরূপ ঘটনাকে কোনরূপেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। সূর্য্য যদি প্রত্যহ পূর্ব্বে না উঠিতেন; দোকান হইতে চাল কিনিয়া ঘরে আসিয়া যদি দেখা যাইত—তাহার অর্দ্ধেক নাই; খাইতে বসিয়া যদি কোন দিন দেখা যাইত—যত খাই, তত ক্ষুধা বাড়ে; লুচি ভাজিতে গিয়া যদি দেখা যাইত—কড়াইয়ের ঘি হঠাৎ কেরোসিন হইয়া গিয়াছে; তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে হইত এবং মনুষ্যকেও জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িতে হইত। সুখের বিষয়, প্রকৃতিদেবীর এইরূপ খেয়াল নাই। প্রকৃতিতে একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গতি আছে। আজ যাহা যেরূপে ঘটে, কালও তাহা সেইরূপে ঘটিয়া থাকে। আবার অনেকগুলা ঘটনা একই রকমে ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খলা আছে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু আছে, তাহা দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকলা চোখে, মাপকাঠি হাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করেন। তোমার আমার চোখে যে শৃঙ্খলা ধরা পড়ে না, বৈজ্ঞানিকের চোখে তাহা ধরা পড়ে। তিনি জাগতিক বিধি-বিধানের আবিষ্কার করেন। নারিকেল-ফলের গতির যে নিয়ম, চাঁদের গতিরও সেই নিয়ম, গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম, আবার জোয়ার-ভাটায় মহাসাগরের অম্বুপৃষ্ঠের উত্থান-পতনেও সেই নিয়ম। ইহা নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও চোখে পড়ে নাই; নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, তাহাতেই নিউটনের নিউটনত্ব।

ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টা। জগতে যাহা ঘটিতেছে এবং সেই ঘটনা-পরম্পরা যে নিয়মে চলিতেছে, তাহাই তিনি দেখেন। কিন্তু তিনি জগতের কতটুকু দেখেন? এইখানে বলিতে বাধ্য হইব যে, দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ প্রভৃতি সহস্র যন্ত্র সহায় থাকিতেও তিনি জগতের অতি অল্প অংশই দেখিতে পান। কেন না, বিশ্ব-জগতের অন্ত কোথায়, তাহা তিনি এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য আপাততঃ জগৎকে অনন্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পাঁচটার অধিক ইন্দ্রিয় নাই; এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও আবার নানা দোষে অসম্পূর্ণ। আচার্য্য হেলম্‌-হোলৎজ একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চক্ষু, উহাতে এত দোষ বিদ্যমান যে, যদি কোনও শিল্পী ঐরূপ নানাদোষ-দুষ্ট

যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত, তিনি তাহার দাম দিতেন না। ইন্দ্রিয়গুলির দোষ-সংশোধনের ও ক্ষমতা-বর্দ্ধনের সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াও জগতের অতি অল্প অংশই তিনি প্রত্যক্ষগোচর করেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের এক আনা প্রত্যক্ষ-গোচর; পনর আনা অনুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রত্যক্ষগোচর ও অনুমান-লব্ধ জগতের বাহিরে ও ভিতরে জগতের আর একটা বৃহত্তর অংশ কল্পিত হয়, যাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোনও কথা বলিতেই সাহস করেন না। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক ক্রমশই জগতের জ্ঞাত অংশ হইতে অজ্ঞাত অংশে অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অজ্ঞাত জগৎ ক্রমশই তাঁহার জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিতেছে। যে অংশ এখনও অজ্ঞাত আছে, সেই অজ্ঞাত অংশ সম্বন্ধে অনেক অনেক রকম কল্পনা-জল্পনা করেন; অধিকাংশ স্থলে কল্পনা-জল্পনা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়; কখনও বা তাহার কিছু একটা মূল পাওয়া যায়। যে সকল অসাধারণ ঘটনাকে আমরা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা প্রায়ই এই অজ্ঞাত বা অল্প জ্ঞাত জগৎ হইতেই আসে। তাহার অসাধারণত্ব দেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠি; আমাদের পরিচিত জগতের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। পরিচিত জগতের যে সকল ঘটনাবলীকে আমরা নিয়মবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে উহারা খাপ খায় না। এই জন্য ঐ সকল ঘটনার সত্যতা-বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। বিজ্ঞান ব্যবসায়ী বড় সাবধানে চলেন; অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর না করিলে চলে না বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাঁহার সংশয় কিছুতেই মেটে না। বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা একেবারে অসাধারণ ও পরিচিত জগতের সহিত অসমঞ্জস তাহাদের সত্যতা অগ্নিপরীক্ষা করিয়া না লইলে তাঁহার মনের ধোঁকা কিছুতেই যায় না। প্রত্যক্ষলব্ধ কোন ঘটনা যতই অদ্ভুত হউক বা যতই অসাধারণ হউক, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার তাঁহার একেবারেই নাই। তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে এবং পরিচিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আপাততঃ তাহার স্থান দিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে স্থান মিলিবে, এই ভরসায় থাকিতে হইবে। যে-কোনও ব্যক্তি একটা অসাধারণ বর্ণনা করিলেই তাহা মানিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। কেন না, বর্ণনাকারী মনুষ্য অসত্য-বাদী না হইলেও ভ্রান্তিপর হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহার সকল কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। কিন্তু ক্রুক্স বা ওয়ালাসের মত ব্যক্তি যখন কোন অসাধারণ ঘটনার বিবরণ লইয়া উপস্থিত হন, তখন নীরব হইয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বলা উচিত যে, জাগতিক কোন ঘটনা যতই অসাধারণ হউক, তাহাকে অতি-প্রাকৃত বলা উচিত নহে। যখনই আমি উহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিলাম এবং যখনই উহার সত্যতা অঙ্গীকার করিলাম, তখনই ব্যাবহারিক জগতের অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল; উহা অতিপ্রাকৃত থাকিল না। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকেরা যত অদ্ভুত ও অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে; কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা অতিপ্রাকৃত হইবে না। ব্যবহারিক জগতে অতিপ্রাকৃতের স্থান নাই।

প্রত্যক্ষগোচর, অনুমানলব্ধ ও কল্পিত, এই তিন অংশ একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-জগতের একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্ব-জগতের প্রকৃত মূর্ত্তি যে কি, তাহা কোনও বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার যে কয়টা ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য বা কল্পনাগম্য হইবার উপায় নাই। যদি ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক থাকিত, অথবা এই ইন্দ্রিয়গুলিই অন্যরূপ জ্ঞানের আমদানি করিত, তাহা হইলে জগতের মূর্ত্তিও তাঁহার নিকট অন্যরূপ হইত। কেমন হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতেও আসে না। আপাততঃ তিনি ঐ রূপ রস গন্ধাদি পাঁচটা বস্তুকে দেশে ও কালে সন্নিবেশিত করিয়া, জগতের এই মূর্ত্তির মধ্যে নানা অবয়ব সন্নিবিষ্ট করিয়া, একটা বিশাল যন্ত্র-কল্পনায় প্রয়াস পাইতেছেন। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়বের একটা কার্য্য নির্দ্দেশ করা আবশ্যক এবং সকল অবয়বের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। আপন আপন কার্য্য-সাধন করিয়া পরস্পরের সম্পর্ক আশ্রয়ে সেই অবয়বগুলি সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সমুদয় যন্ত্রটিকে চালাইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট থাকেন। যত ক্ষণ তিনি কোন একটা যন্ত্রাঙ্গের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, বা সেই যন্ত্রাঙ্গটি কি উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়াছে, নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। এইখানে তাঁহাকে বুদ্ধির খেলা খেলিতে হয়। কল্পিত বিশ্ব-যন্ত্রটির পরিচালন-বিধি বুঝিবার জন্য নানা অঙ্গের কল্পনা করিতে হয়, নানা সম্পর্কের কল্পনা করিতে হয়। নিউটন এবং ফ্যারাডে, লাপ্লাস এবং জে জে. টম্‌সন, ডাল্‌টন এবং আরিনিয়স, ডারুইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি মনীষিগণ এইরূপ কল্পনার জন্য আপনাদের অসামান্য ধীশক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা অণু পরমাণু ইলেকট্রন প্রভৃতি নানা কাল্পনিক পদার্থের ইট-পাটকেল জোটাইয়া, স্থিতি গতি মাধ্যাকর্ষণ যোগাকর্ষণ প্রভৃতি নানা কাল্পনিক দ্রব্যের চুণ সুরকি ও কলকবজা জোগাড় করিয়া, জড় আর শক্তি, এই দ্বিবিধ অত্যন্ত কাল্পনিক উপাদানে প্রাকৃতিক জগদ্‌যন্ত্রের একটা কৃত্রিম আদর্শ বা মডেল তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহার সাহায্যে প্রাকৃতিক জগদ্‌যন্ত্রে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই কৃত্রিম মডেল সর্ব্বতোভাবে মন-গড়া মডেল। এখনও তাঁহাদের কল্পনা প্রাকৃত জগদ্‌যন্ত্রের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রদর্শনে সমর্থ হয় নাই। এখনও কোন যন্ত্রাঙ্গ কিরূপে কোন্ কাজ করিয়া জগদ্‌যন্ত্রকে এমনি ভাবে চালাতেছে, সর্ব্বত্র তাহার মীমাংসা হয় নাই। জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্ কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনা-বোধ আবির্ভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইনবাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে; অতএব জীব যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু জগদ্-যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবে দেখিলে ঐ ঐ

ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় নাই। বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকগণের কল্পিত জগদ্‌যন্ত্র প্রাকৃত জগদ্‌যন্ত্রের একটা মনগড়া আদর্শ বা মডেল মাত্র। এই মডেলের বা নকলের সহিত আসলের কোথাও কোথাও কিছু কিছু মিল আছে মাত্র। এই কল্পিত মডেলে এখনও জীবের ও জড়ের মধ্যে এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান সম্যক্ লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের এখানে একটা, ওখানে একটা দরজা ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু জগদ্‌যন্ত্রের মডেল এখনও নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে শিকল দিয়া জোড়া লাগাইবার উপায় এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

আর একটা কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরমদয়ালু শ্রোতৃগণকে অব্যাহতি দিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের যত কিছু চেষ্টা, সমস্তই কেবল 'আত্মরক্ষার জন্য, জীবন-যুদ্ধে বাহ্য জগতের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষার জন্য। মনুষ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য লইয়া বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বাহ্য জগৎকেই আপনার জীবন-রক্ষায় নিয়োগ করা। অরণ্যবাসী মনুষ্য যে দিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শস্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই শস্য আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির ফলকে সুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লাবরেটারিতে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসারী কারখানা অদ্যাপি চলিতেছে। এই আত্মরক্ষার প্রযত্নে ও আত্মপুষ্টির প্রযত্নে আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজ্রে এক দিন যাঁহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, পাখা টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শক্তিচয়কে আমরা আমাদের কাজে মজুর খাটাইতেছি। কবি-কল্পিত লঙ্কেশ্বর স্বর্গের সমস্ত দেবতাকে সেবকত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের তপস্যাবলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা লঙ্কেশ্বর হইয়াছি। যে বাহ্য জগতের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ্য জগৎ এক দিন না এক দিন আমাদের উপরে জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর দম্ভের সহিত প্রভুত্ব খাটাইয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির জয়জয়কার দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ?

মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের হেয়, তাহার বর্জ্জনে আমরা সুখ লাভ করি; আর যাহা আমাদের হিতকর, তাহাই আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমরা সুখ লাভ করি। জীবের মধ্যে যাহারা সুখ-ভোগে অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে এবং করে বলিয়াই তাহারা জীব -রক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আমরা মনুষ্য হইয়াও জীব; অতএব আমরাও অন্য জীবের ন্যায় জীবন-রক্ষার্থ সুখান্বেষী হইয়া হেয়-বর্জ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে তৎপর আছি; তাই আমাদের জীবন-রক্ষার ও জীবন-সমৃদ্ধির অনুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের অভিমুখ। আমরা যে স্বভাবতঃ সুখান্বেষণ করি, তাহার এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু মনুষ্যের একটা বিশেষ অধিকার আছে, ইতর জীবের হয়ত তাহা

নাই। মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্যে সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সুখে তাহার কোন লাভ নাই, জীবন-রক্ষায় এতদ্দ্বারা তাহার কোন আনুকূল্য হয় না; ইহা উদ্দেশ্যহীন সুখ :—ইহা অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল বস্তু, ইহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ বলাই উচিত। মনুষ্য এই বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী। এই আনন্দে মনুষ্যের কোন হিত ঘটে কি না, এই প্রশ্ন তুলিতে গেলে সেই আনন্দের নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। মনুষ্য গান গাহিয়া যে আনন্দ পায়, মনুষ্য কবিতা শুনিয়াও যে আনন্দ পায়, নদী-তীরে বসিয়া নদী-স্রোতের ধ্বনি শুনিয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের পর্য্যায়-ভুক্ত। উহার উচ্চতর সোপানে উঠিয়া প্রকৃতির মূর্ত্তির দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, প্রকৃতির মূর্ত্তিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের শ্রী আবিষ্কার করিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহাও সেই পর্য্যায়ের আনন্দ ; তাহাতেও জীবনরক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। তুলিতে গেলে সেই আনন্দের বিশুদ্ধি ও নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে ; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধারে আলোক আনিয়া, এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো ষ্টীমশিপ আর এরোপ্লেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। মানব-সমাজে মারামারি কাটাকাটি রক্তারক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশালা বা বিলাসীর আরাম-নিকেতন কিছুতেই শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানব জাতির অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়া জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল আমাদের শ্রবণে-ন্দ্রিয় বধির করিতেছে, বাহ্য জগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রভুত্বলাভের জয়জয়কার সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকতা-স্পর্দ্ধি-মানব-সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের শোণিত-পানে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তখন জীবন-যুদ্ধের ভীষণতা যে বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে মৃদুতা ধারণ করিবে, মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কোন অবিশ্বাস নাই। এই ক্রূর সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে চিত্তক্ষেত্রে শান্তির বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ করিতেছি, সেই আনন্দ কতকটা সমর্থ হইবে। বৈজ্ঞানিকের গর্ব্ব এই ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন ; আমরা অঞ্জলি ভরিয়া উহার ধারা-পানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান কোটি মানবের পাদ-পীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই ধূলি-বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাকে কলুষিত করিও না! ঋষি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়াপুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্ব্বাস্বাদলাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যাবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখের কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।

বিজ্ঞানে পুতুলপূজা

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, ইউক্লিডের এই প্রতিজ্ঞার চেয়ে নিরীহ প্রস্তাব বোধ করি জগতে আর কিছুই হইতে পারে না। ইহা এত সহজ বোধ্য এবং সর্ব্বজনবোধ্য যে, ইহার প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান কেহ কর্ত্তব্য মনে করেন না ; এই জন্য ইহা ইউক্লিডপ্রণীত শাস্ত্রের আরম্ভেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থান লাভ করিয়াছে। ইউক্লিডের শাস্ত্র সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আকৃতি এবং বৃহত্তা মাত্র লইয়াই ইউক্লিডের কারবার। তিনি যে সমস্ত দ্রব্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, তাহাদিগকে খরিদ করিতে দাম লাগে না, ডাকে পাঠাইতে মাশুলও লাগে না, তাহাদের আছে কেবল দৈর্ঘ্য অথবা বিস্তার অথবা বৃহত্তা মাত্র। দুইটা দ্রব্য দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে ও বৃহত্তায় তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারাও পরস্পর সমান বলিয়া গৃহীত হয়, যে ছাত্র ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বা চতুর্থ প্রতিজ্ঞা কোন রকমে পার হইয়া পঞ্চমে আসিয়া আটকাইয়া যায়, সেও এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য স্বীকার করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ইউক্লিডের সীমানা ছাড়াইয়া যখন অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, তখনও এই স্বতঃসিদ্ধে দ্বিধাবোধের কোন সম্যক্ হেতু পাওয়া যায় না। রামু আর দামু উভয়ে যদি হরির সঙ্গে ঠিক একবয়সী হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সমান বয়সী হইবে ; উভয়ের গায়ের রং যদি ঠিক কেদারের মত ঘন কৃষ্ণ হয়, তাহা হইলে তাহারা পরস্পর সবর্ণ হইবে ; এই সকল তথ্য স্বীকার করাইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হয় না। ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য : ইহার অন্যথাভাব কল্পনাতেও বোধ করি আসে না।

যে সকল বিষয়ের অন্যথাভাব কল্পনাতে আসে, যাহার অন্যথাভাব মনে আনিতে আমাদের বুদ্ধিবৃদ্ধি আঘাত পায় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে ; তাহার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ বা অন্যরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। আকাশের বর্ণ নীল, চিনি খাইতে মিষ্ট, কেদারের বয়স সতের বৎসর তিন মাস, বৃন্তচ্যুত নারিকেল ফল বেলুনের মত উধাও না উঠিয়া ভূমিতে পড়ে, নেপোলিয়ন খুব বীর ছিলেন, ইত্যাদি সত্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে লব্ধ সত্য ; ইহা অন্যরূপ হইতে পারিত। ইহার অন্যথাভাব আমরা স্বচ্ছন্দে কল্পনা করিতে পারি। সেইরূপ চাপ পাইলে বায়ু সঙ্কুচিত হয়, গরমে বরফ গলিয়া জল হয়, চুম্বকে লোহা টানে ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপার সত্য হইলেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে ; প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই সকল সত্য প্রতিষ্ঠিত। চুম্বক যদি লোহাকে না ঠেলিয়া দিত, শোলা যদি জলে না ভাসিয়া ডুবিয়া যাইত, তাহা হইলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি কিছুতেই আহত হইত না ; আমরা ঐ সকল বিপরীত ঘটনাকেই প্রাকৃতিক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতাম।

অতএব সত্যের শ্রেণীভেদ রহিয়াছে।

কতকগুলি সত্য আমরা মানিতে বাধ্য, না মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি বিদ্রোহাচরণ করিবে; যদি কেহ উহাতে দ্বিধা বোধ করে, পাগলা গারদে তাহার স্থান। আবার কতকগুলি সত্য আছে; তাহা মানিতে আমরা বাধ্য নহি; তাহা না মানিলে বুদ্ধিবৃত্তি অবজ্ঞাত হয় না, তাহার উলটা মানিলেও কেহ পাগল বলিতে পারিবে না, তবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিতে হইবে।

যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান, এই সত্যটি কোন্ শ্রেণীর সত্য? ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ-নিরপেক্ষ সত্য হইতে পারে; কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রেও কি তাহাই? পদার্থবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইব। একটা সোনার গিনি খানিকটা জলের সমান গরম, একটা রূপার টাকাও সেই জলের সমান গরম, গিনি ও টাকা সমান গরম হইবে কি না? যে-কোন ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিবে,—হাঁ সমান উষ্ণ হইবে বৈ কি? এই উত্তর সত্য, কিন্তু কিরূপ সত্য? ইহা কি ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধের মত স্বতঃসিদ্ধ সত্য?

যাঁহারা পদার্থবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ইহা সত্য বটে, কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। উভয়ে জলের সমান উষ্ণ হইয়াও পরস্পর সমোষ্ণ না হইতেও পারিত। হয় নাই যে, তাহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

আমরা হাতে ছুঁইয়া স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন্ জিনিষটা গরম, কোন্‌টা ঠাণ্ডা মোটামুটি স্থির করিয়া থাকি, কিন্তু পদার্থবিদ্যা স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর বিশ্বাস করিতে একেবারে নারাজ।

পদার্থবিদ্যা-মতে উত্তাপ নামে এমন একটা কিছু আছে, যাহা কোন দ্রব্যে আবদ্ধ থাকিতে চায় না, তাহা সর্ব্বদা দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চলাফেরা করে। যে দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা বলেন, সেই দ্রব্যে উষ্ণতা অধিক, আর যে দ্রব্যে উত্তাপ প্রবেশ করে, পদার্থবিদ্যা-মতে সেই দ্রব্যের উষ্ণতা অল্প; কোথায় উষ্ণতা অধিক, আর কোথায় অল্প, তাহা জানিবার পদার্থবিদ্যার মতে ইহাই একমাত্র উপায়; এবং উষ্ণতার তারতম্যের ইহাই একমাত্র লক্ষণ। যদি দুইটি দ্রব্য পাশাপাশি রাখিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে উত্তাপের বিনিময় হইতেছে না, অর্থাৎ এটার উত্তাপ ওটায় অথবা ওটার উত্তাপ এটায় আসিতেছে না, তখনই বুঝিতে হইবে, উভয় দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। পদার্থবিদ্যার ভাষায় উষ্ণতা আর উত্তাপ এক নহে। উত্তাপ চলাফেরা করে, উষ্ণতর দ্রব্য হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া শীতলতর দ্রব্যে প্রবেশ করে। যেখানে দেখিবে, দুই দ্রব্যের মধ্যে উত্তাপের যাতায়াত নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে, উষ্ণতারও প্রভেদ নাই; উভয় দ্রব্য সমান উষ্ণ; কাজেই উত্তাপের চলাফেরা বন্ধ। উত্তাপের এই আচরণ দেখিয়া উষ্ণতার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয়। জল যেমন উঁচু হইতে নীচে গড়াইয়া আসে, উত্তাপ তেমনিই গরম জিনিষ হইতে ঠাণ্ডা জিনিষে আসে; জলের সহিত উচ্চতার যে সম্বন্ধ, উত্তাপের সহিত

উষ্ণতার সম্বন্ধ খানিকটা সেইরূপ। ঘরের মেঝের কোন দিকটা উচু স্থির করিতে হইলে জল ঢালিয়া দিলে বুঝা যায়, উঁচু দিক্ হইতে নিচু দিকে জল গড়াইয়া আসে। সেইরূপ উত্তাপ কোথা হইতে কোথায় আসিতেছে নিরূপণ করিলেই উষ্ণতা কোথায় অধিক, কোথায় অল্প; তাহা বুঝা যাইবে।

উষ্ণতার যদি এই লক্ষণ হয়, তাহা হইলে গিনিটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে এই যে, গিনিটা জলে ফেলিলে গিনির উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ গিনিতে যাইবে না। সেইরূপ টাকাটা জলের সমান উষ্ণ বলিলে বুঝাইবে যে, টাকাটা জলে ফেলিলেও টাকার উত্তাপ জলে বা জলের উত্তাপ টাকায় যাইবে না। বেশ কথা—তাহা না যাক। ধরিয়া লইলাম, গিনি ও জলের মধ্যে উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদের পরস্পর আচরণ এইরূপ। টাকা ও জলের মধ্যেও উত্তাপের চলাচল হইতেছে না; উহাদেরও পরস্পর আচরণ এইরূপ। এখন গিনি ও টাকা যদি কাছাকাছি পাশাপাশি রাখা যায়, উহাদের পরস্পর আচরণ কিরূপ হইবে? উহাদের মধ্যে পরস্পর উত্তাপের বিনিময় হইবে কি না? কে বলিতে পারে, হইবে কি না? গিনি সোনার জিনিষ—অবস্থাভেদে সে জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। টাকা রূপার জিনিষ—অবস্থাভেদে সেও জলের উত্তাপ লয় না, জলকে উত্তাপ দেয় না। কিন্তু এমন কি বাধ্যবাধকতা আছে যে, গিনি ও টাকা—অর্থাৎ এক টুকরা সোনা ও এক টুকুরা রূপা সেই অবস্থাতে পরস্পরের মধ্যেও উত্তাপের লেনা-দেনা করিবে না? করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। লজিক শাস্ত্র ইহার কোন উত্তর দিতে অক্ষম। তবে পর্য্যবেক্ষণে উত্তর পাওয়া যাইবে, হাঁ কি না?

আর একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। সোনার গিনি যে জলের প্রতি যে আচরণ করিতেছে, রূপার টাকাও সেই জলের প্রতি সেই আচরণ করিতেছে, অতএব সোনা ও রূপা পরস্পর সেইরূপ আচরণ করিবে, এরূপ বাধ্যবাধকতা আছে কি না? গদাধরের সঙ্গে রামের যে আচরণ, গদাধরের সঙ্গে শ্যামের সেই আচরণ, তাহা বলিয়া কি রাম শ্যামের পরস্পর আচরণও ঠিক সেইরূপ হইবে? গদাধর রামকে দেখিলে ঘুষি তুলে, গদাধর শ্যামকে দেখিলেও ঘুষি তুলে, অতএব রাম ও শ্যামকে দেখিলে ঘুষি তুলিবে, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য? যদি বল, রাম-শ্যামের দৃষ্টান্ত লইলে এখানে চলিবে না, রাম শ্যাম স্বাধীন জীব, তাহাদের কর্ম্ম তাহাদের ইচ্ছাধীন; কিন্তু সোনারূপা জড় দ্রব্য মাত্র, সর্ব্ববিধ স্বাধীনতায় বর্জ্জিত, ইহা পদার্থবিদ্যার ব্যাপার;—আচ্ছা, পদার্থবিদ্যা হইতে একটা দৃষ্টান্ত লইব। খানিকটা চা-খড়িতে সল্‌ফুরিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাঁস করে, নাইট্রিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাঁস করে, তাই বলিয়া সল্‌ফুরিক এসিডে নাইট্রিক এসিড ঢালিলেও ফ্যাঁস করিবে? কখনই না। চা-খড়ির প্রতি সল্‌ফুরিক এসিডের আচরণ ঐ উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে: আবার চা-খড়ির প্রতি নাইট্রিক এসিডের আচরণ এই উভয় দ্রব্যের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। চা-খড়ির প্রতি এসিড দুইটার আচরণ দেখিয়া তাহাদের পরস্পরের আচরণ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

সেইরূপ সোনার গিনি ও রূপার টাকা পরস্পর উত্তাপ বিনিময় করিবে কি না, তাহা সোনা ও রূপা উভয়ের ধাতুগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সোনা কিংবা রূপা প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্য জলের প্রতি কিরূপ আচরণ করে, তাহা দেখিয়া পরস্পরের আচরণ কিছুতেই স্থির করা যায় না। লজিকের ভাষায় বলা যাইতে পারে, ঐ দুই premise হইতে কোনরূপ conclusion অর্থাৎ সিদ্ধান্ত টানা চলে না।

লজিকে পারে না বটে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ পারে। প্রকৃতপক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, গিনি যখন জলের উত্তাপ লয় না, টাকাও যখন জলের উত্তাপ লয় না, গিনি ও টাকা তখন,—কেন জানি না, গিনি ও টাকা তখন পরস্পরের উত্তাপের লেনা-দেনা করে না, প্রকৃতির এই বিধান। ইহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য—ইহা পরীক্ষিত সত্য: স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে। প্রকৃতির ব্যবস্থা এইরূপ। কাজেই আমরা উহা মানিয়া লই। ব্যবস্থা অন্যরূপ হইতে পারিত; গিনির উষ্ণতা জলের সমান, টাকার উষ্ণতাও সেই জলেরই সমান, এরূপ হইয়াও গিনি ও টাকা সমোষ্ণ না হইতেও পারিত। না হইলে তাহাই আমাদিগকে মানিতে হইত, প্রকৃতির উপর আমাদের কোনরূপ হুকুম চলিত না।

দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হইলে উহারা পরস্পর সমান হইবে, ইউক্লিডের শাস্ত্রে ইহা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও সকল শাস্ত্রে ও সকল ক্ষেত্রে উহা স্বতঃসিদ্ধ হইবে না, ইহা দেখা গেল; কিন্তু দুই দ্রব্যকে কখন্ কোন্ গুণ দেখিয়া সমান বলিব, তাহাও একটা উৎকট সমস্যা।

শরীরী জড় দ্রব্যের বেলায় সমস্যা ত বটেই; ইউক্লিডের শাস্ত্রের মত যে সকল শাস্ত্র অশরীরী দ্রব্য লইয়া বিচার করেন, সেখানেও সমস্যা নিতান্ত সহজ নহে।

মনে কর, দুই গাছা লাঠি সমান দীর্ঘ কি না, স্থির করিতে হইবে। এক গাছা লাঠি শ্যামবাজারে রামের নিকট, আর এক গাছা বৌবাজারে শ্যামের নিকট আছে। দৈর্ঘ্যের তুলনা দুই উপায়ে হইতে পারে। শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিয়া দুই গাছা লাঠি পাশাপাশি রাখিয়া মিলাইয়া দেখা যাইতে পারে, উহাদের দৈর্ঘ্য সমান কি না? একটার উপর আর একটাকে চাপাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান কি না, তাহা নিরূপণের প্রথা ইউক্লিড বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় উপায়—অন্য একটা মাপকাঠি বা গজকাঠি শ্যামবাজারে আনিয়া শ্যামবাজারের লাঠির ও বৌবাজারে আনিয়া বৌবাজারের লাঠির দৈর্ঘ্য নিরূপণ করা চলিতে পারে।

যদি এই গজকাঠির মাপ দেখা যায়, উভয় লাঠিই দৈর্ঘ্যে সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি, তাহা হইলে উভয়কেই সমান দীর্ঘ বলিয়া ধরা হয়। বলা বাহুল্য, কার্য্যতঃ এই রীতি অবলম্বন করাই সুবিধা; এবং ইহার মূলই হইল ইউক্লিডের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু এইখানে কোন ব্যক্তি যদি বিদ্রোহী হইয়া পূর্ব্বপক্ষ করিয়া বসেন, দৈর্ঘ্য তুলনায় এই রীতি দুষ্ট, আমি ইহা মানিব না, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরুত্তর করা কঠিন হইয়া পড়ে। উষ্ণতার ইতরবিশেষ প্রভৃতি কতিপয় কারণে একই দ্রব্যের দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বজনসম্মত; একই জিনিষ গরম হইলে

দৈর্ঘ্যে বাড়ে, ঠাণ্ডায় দৈর্ঘ্যে কমে; শ্যামবাজার ও বৌবাজারে যদি উষ্ণতার কোন তারতম্য না থাকে, তাহা হইলে এ তর্ক উঠিবে না। কিন্তু যিনি বাদী, তিনি একবারে মূলে টান ধরিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন, শুদ্ধ স্থানভেদেই কি দৈর্ঘ্যের ইতরবিশেষ হইতে পারে না? যে আকাশে বা যে দেশে আমাদের এই জগৎ অবস্থান করিতেছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের এমন ধর্ম্ম কি থাকিতে পারে না যে, এক স্থানের দ্রব্যকে কেবল অন্য স্থানে লইয়া যাইবা মাত্র অন্য কারণ অসত্ত্বেও তাহার দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়? ইহা অসম্ভবও নহে, অকল্পনীয়ও নহে।

তুমি শ্যামবাজারের লাঠিকে বৌবাজারের লাঠির সহিত মিলাইয়া উভয়ের দৈর্ঘ্য সমান বলিতেছ; কিন্তু আমি বলিতেছি, একের দৈর্ঘ্য অন্যের দ্বিগুণ। তবে শ্যামবাজারের লাঠি বৌবাজারে আনিবা মাত্র তাহার দৈর্ঘ্য কমিয়া অর্দ্ধেক হয়; আবার বৌবাজারের লাঠি শ্যামবাজারে আনিবা মাত্র উহার দৈর্ঘ্য দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যতক্ষণ এক লাঠি শ্যামবাজারে, অন্য লাঠি বৌবাজারে, ততক্ষণ তাহাদের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না। গজকাঠি দিয়া মাপিলেও ইহার মীমাংসা হইবে না। সকল দ্রব্যেরই দৈর্ঘ্য যদি স্থানসাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে গজকাঠিরও দৈর্ঘ্য স্থান-সাপেক্ষ হইবে। উহা শ্যামবাজারে আনিবা মাত্র উহার ইঞ্চির দাগগুলা বড় বড় হইবে, এবং বৌবাজারে আনিবা মাত্র দাগগুলা খাটো হইয়া পড়িবে। কাজেই শ্যামবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চি বৌবাজারের সাত ফুট পাঁচ ইঞ্চির সমান না হইলেও এই প্রভেদ ধরিবার কোন উপায় পাওয়া যাইবে না।

ফলে আমাদের বিশ্ব-জগৎ যে দেশে অবস্থিত, সেই দেশের যদি এইরূপই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ স্থানভেদে দৈর্ঘ্যের ব্যত্যয় হইলেও আমরা কোনরূপ পরিমাপের দ্বারা তাহা ধরিতে পারিব না; কেন না, যে গজকাঠি লইয়া পরিমাপ করিতে যাইব সেই গজ-কাঠিই যখন স্থানভেদে ছোট-বড় হইয়া যায়, তখন এই প্রচলিত পরিমাপ, পদ্ধতি সেখানে চালাইব কিরূপে?

অপরপক্ষ বলিবেন, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান যখন বলিতেছে, স্থানভেদে এরূপ দৈর্ঘ্যভেদের কোন প্রমাণ নাই, এবং প্রচলিত পরিমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কাহাকেও কখন জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় নাই, তখন এ সকল নিষ্ফল ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি তুলিয়া লাভ কি? সমুদায় ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যা প্রচলিত পরিমাণ-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যার যাবতীয় সম্পাদ্যে ও উপপাদ্যে কেহ কখনও কোন ভুল বাহির করিতে পারেন নাই; তখন এরূপ তর্ক উপস্থিত করিয়া উপহাস্য হইবার দরকার কি?

ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, জীবনযাত্রার জন্য যে কাণ্ডজ্ঞানটুকু আবশ্যক, সেই কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে জীবনযাত্রা একরকম নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়। প্রকৃতিদেবী, যিনি মনুষ্যকে জীবনযাত্রায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যকে যে ন্যায়-শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেই হইবে, এরূপ তাঁহার আদেশ নাই। গোপশু হইতে মনুষ্যপশু পর্য্যন্ত কাহাকেও তিনি জীবনযাত্রা বিষয়ে ন্যায়-শাস্ত্রের অধীন করিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। ঘাস-জলের ব্যবস্থা হইলেই গরুর গোজীবন

চলে ; আবার ডাল-রুটির ব্যবস্থা হইলেই মানুষের জীবনযাত্রা নির্বিঘ্নে চলিয়া যায় ; এবং পৃথিবীর উপর যে দেড়শত কোটি মনুষ্য পশু বিচরণ করিতেছে, তাহাদের পৌনে ষোল আনার অধিক লোক এই ডাল-রুটির অধিক কিছু চাহে না ; ইহাতেই তাহারা সম্পূর্ণ তৃপ্ত আছে। আজিকার বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে আমরা যে কল-কারখানা বসাইয়া পৃথিবীতে একটা তোলপাড় আরম্ভ করিয়াছি, ভূপৃষ্ঠের উপর ছুটা ছুটি করিবার জন্য নিরেট ভূমির উপর রেলগাড়ী চালাইয়া, সাগর-পৃষ্ঠের উপর কলের জাহাজ চালাইয়া, আর হাওয়ার ভিতরে হাওয়ায় উড়িবার জন্য হাওয়ার জাহাজ চালাইয়া লম্ফ-ঝম্ফ আরম্ভ করিয়াছি, ইহাও সেই ডাল-রুটির জন্য। ডাল-রুটির অন্বেষণ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর উদ্দেশ্য এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের অভ্যন্তরে আবিষ্কার করা যায় না। এই ডাল রুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইলেও উহাকে একেবারে পরম পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কতগুলি লোক চাহে না ও চাহিবে না। তাহাদের মতে ঐ ডালরুটি-বিষয়ক কাণ্ডজ্ঞানই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে ; তাহার অতি-রিক্ত আরও কিছু নহিলে তাদের প্রাণের পিয়াসা কিছুতেই মিটে না। এই পিয়াসা মিটাইবার জন্যই নৈয়ায়িকেরা তৈলের আধার পাত্র বা পাত্রের আধার তৈল, এই বিচারে জীবন কাটাইতেন ; এবং এই পিয়াসা মিটাইবার জন্য এই সেদিনও শেফীল্ড শহরে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশনে গণিত-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি বার আর পাঁচে সতের, এই তথ্যটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য বটে কি না এবং সর্ব্বত্র সত্য বটে কি না, তাহা অন্বেষণের জন্য মাথা কুটিতে পণ্ডিতদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন।

ক্ষেত্রতত্ত্বের ন্যায় ব্যাবহারিক শাস্ত্র কতকগুলি সংজ্ঞা ও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া তাহার ভিত্তির উপর বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে ; এবং সেই অট্টালিকার মধ্যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা অবাধে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মূল আকর্ষণ করিয়া যুক্তির অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে সেই স্বতঃসিদ্ধগুলির সারবত্তা সম্বন্ধে বিচার চলিতে পারে। একটা মাত্র গজকাঠি লইয়া যখন আমরা শ্যামবাজারে ও বৌবাজারে, হুগলিতে ও দিল্লীতে, ভূমণ্ডলে ও সূর্য্যমণ্ডলে ও সপ্তর্ষি-মণ্ডলে দীর্ঘতা মাপিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা ধরিয়া লই যে, উষ্ণতাদির তারতম্যে ঐ দৈর্ঘ্যের তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু কেবল মাত্র দেশভেদে বা স্থানভেদে সেরূপ কোন তারতম্য হয় না। ইহা আমরা ধরিয়া লই, এবং মানিয়া লই মাত্র ; কিন্তু মানা উচিত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখি না। মানা উচিত হউক আর অনুচিতই হউক, আমাদের জীবনযাত্রায় ইহাতে কোনরূপ ঠকিতে হয় না। ঠকিতে হয় না, কেন না, কোন দুই দ্রব্যকে যখন আমরা কোন বিষয়ে সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করি, ঐ সমানতা আমাদের মনঃকল্পিত একটা সংজ্ঞা মাত্র ; আমরা একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ মনগড়া পারিভাষিক অর্থে 'সমান' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার মধ্যে কোন পরমার্থ তত্ত্ব নিহিত থাকে না। ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিত্তি লইয়া আজ-কাল যে টানাটানি পড়িয়া গিয়াছে, তাহার ইতিহাসের যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের নিকট আমার বাচালতা মার্জ্জিত হইবে।

দুইটা জিনিষকে আমরা সমান বলি কখন্? দূর হইতে নিকটে আনিয়া এটার

পাশে ওটা রাখিয়া, অথবা এটার উপর ওটা চাপাইয়া যদি দেখিতে পাই, দুইটার দৈর্ঘ্য মিলিয়া গিয়াছে, তখন আমরা তাহাদিগকে সমান বলি। নিকটে থাকিলেও সমান বলি, দূরে থাকিলেও সমান বলি। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'সমান' এই শব্দটির সংজ্ঞাই এই। দূরে থাকিতে উহাদের দৈর্ঘ্যের কোন প্রভেদ ছিল কি না সে প্রশ্নই আমরা তুলি না। সমান শব্দটিকে যদি ঐ সঙ্কীর্ণ অর্থ দেওয়া যায়, এবং এই অর্থেই আমরা যদি সর্ব্বদা ঐ শব্দ ব্যবহার করি, তাহা হইলে সেই প্রশ্ন তুলিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এবং সেই সংজ্ঞা অবলম্বন করিয়া যদি কোন শাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করি, সেই শাস্ত্রেও কোন ভুল আসে না।

সোনা, রূপা ও জল, ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অপেক্ষা বৈসাদৃশ্যই প্রথমে নজরে পড়ে। ঔজ্জ্বল্যে, বর্ণে, স্পর্শে, শব্দে, কোন বিষয়েই ইহারা সদৃশ নহে; অথচ উহাদের পরস্পর একটা সাদৃশ্য আছে, যাহা আছে বলিয়া ঐ তিন দ্রব্যকেই আমরা জড় পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। প্রশ্ন হইতে পারে, সেই সাধারণ ধর্ম্ম কি, যাহা স্বর্ণখণ্ডে, রৌপ্যখণ্ড এবং খানিকটা জলেও বর্ত্তমান রহিয়াছে? যাহা আছে বলিয়া ঐ তিন পদার্থই জড়ত্ব লাভ করিয়াছে?

তিনটা দ্রব্যের একটা সাধারণ ধর্ম্ম অতি সহজেই ধরা পড়ে; উহার নাম ভার। সোনা, রূপা, জল, তিনেরই ভার আছে; এবং যে সকল দ্রব্যকে আমরা জড় দ্রব্য বলি, তাহাদের সকলেরই ভার আছে; অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভার তাহা হইলে জড়ত্ব। কিন্তু যাঁহারা পদার্থবিদ্যার একটা চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভার জড়ত্ব নহে। উহা জড় দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম হইলেও স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; উহা আগন্তুক ধর্ম্ম, আকস্মিক কারণে উহার উৎপত্তি। আমাদের এই পৃথিবীর এমন একটা গুণ আছে, যাহাতে সকল দ্রব্যই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে পতনোন্মুখ; এবং এই পতনোন্মুখতা আছে বলিয়াই ভূপৃষ্ঠে সকল দ্রব্যের ভার আছে। সোনারূপার যে ভার, তাহা সোনারূপার নিজগুণে নহে, সে ভার পৃথিবীর সমীপে অবস্থিতিসাপেক্ষ। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে যাইবে, ভার ততই কমিবে; আবার ভূপৃষ্ঠে কূপ খুঁড়িয়া নীচে নামিলে ভার তাহাতেও কমিবে। কলিকাতার কোন দ্রব্য দার্জ্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ভার একটু কমে; ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্যের ভার নব্বই মণের ভারের সমান, চাঁদ যত দূরে আছে, তত দূরে লইয়া যাইতে পারিলে তাহার ভার এক সেরের ভারের সমান দেখা যাইবে। আবার ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া যদি ভূকেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া ঐ নব্বই মণের ভার এক কাঁচ্চার ভারের সমান হইত না, একবারে লোপ পাইত। অতএব সোনা রূপা বা যে-কোন জড় দ্রব্যের ভারকে সেই দ্রব্যের স্বাভাবিক নিজস্ব ধর্ম্ম বলিতে পারি না; উহা পৃথিবীর সন্নিধানে অবস্থিতি হইতে উৎপন্ন ধর্ম্ম; উহা একটা আকস্মিক ঘটনা বা আগন্তুক ঘটনা হইতে লব্ধ ধর্ম্ম; পৃথিবী বা তদ্বিধ কোন প্রকাণ্ড জিনিষ নিকটে না থাকিলে কোন জিনিষেরই ভার থাকিত না।

কাজেই ভার দেখিয়া জড়ত্বের নিরূপণ হয় না। এক মণ চাউলের ভার যদি

কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে উহার ভার বহনের ক্লেশ কাহাকেও সহিতে হইত না; কিন্তু তাহার তণ্ডুলত্ব, যাহার উপর উহার উদারপূরণের শক্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহার কিছুই লাঘব হইত না। কলিকাতার চাউল দার্জিলিঙে লইয়া গেলে তাহার ভার কিছু কমে, কিন্তু উদর-পূরণের শক্তি কিছুই কমে না। ফলে চাউলের কিছু মাত্র ভার না থাকিলেও দোকানদার উহার পুরা মূল্য দাবি করিত; তবে ঘরে আনিবার সময় মুটে-ভাড়াটা হয়ত লাগিত না। সেইরূপ সোনার ভার না থাকিলেও উহার সুবর্ণত্ব কিছুই কমিত না,—যে সুবর্ণত্বের উপর ভামিনী-সমাজে উহার সমাদর প্রতিষ্ঠিত; বরং ভামিনীদের মধ্যে যাঁহারা এক-শ ভরিতেই এখন সন্তুষ্ট হন, তাঁহারা তখন এক-শ মণের দাবি করিয়া বসিতেন।

জড়ের জড়ত্ব যদি ভারে না হয়, তবে জড়ের জড়ত্ব কিসে? ইংরেজীতে mass বলিয়া একটি শব্দ আছে, উহাই জড়ের জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক। কথায় কথায় বলা হয় যে, এই mass-এর অর্থ quantity of matter। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ mass শব্দের ভাল প্রতিশব্দ নাই; গ্রন্থলেখকেরা অনুবাদে যাঁহার যে শব্দ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। আমিও একটা নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিব; mass অর্থে বস্তু শব্দ প্রয়োগ করিব। আশা করি, কালে একটা কোন পারিভাষিক শব্দ লেখকেরা একমত হইয়া গ্রহণ করিবেন। এই দ্রব্যটা massive—ইহার mass বেশী—এই অর্থে আমি বলিব, ইহাতে বস্তু আছে অনেকখানি। এই বস্তু শব্দকেই জড়ত্ব-বিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এই বস্তু-পরিমাণ নিরূপণের উপায় কি? পদার্থবিদ্যা এই উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতাই জড়ত্ব; এই ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর মাত্রা নিরূপিত হয়। যে-কোন দ্রব্যে ধাক্কা দিলে উহা বিচলিত হয় অর্থাৎ কতকটা বেগ অর্জ্জন করে। যদি সমান ধাক্কা পাইয়া সমান বেগে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে উহাদের উভয়ের বস্তু সমান বলিয়া গৃহীত হয়। যদি সমান বেগ অর্জ্জন না করে, তাহা হইলে উভয়ের বস্তু অসমান বলিয়া গণ্য হয়। যেটার বেগ অধিক হইবে, সেটার বস্তু অল্প; যেটার বেগ অল্প হইবে, সেটার বস্তু অধিক। শূন্য কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা হটমট করিয়া ছুটিয়া পড়ে; পূর্ণ কুম্ভে ধাক্কা দিলে উহা কিঞ্চিৎ মাত্র বিচলিত হয়। অতএব পূর্ণ কুম্ভের বস্তু-পরিমাণ অধিক, শূন্য কুম্ভের অল্প। দুইটা হাতীর দাঁতের ভাঁটা পরস্পরের অভিমুখে সমান বেগে ছুটিয়া আসিলে পরস্পরের ধাক্কা খাইয়া বিপরীত মুখে ফিরিয়া যায়। যদি সমান বেগে ফিরিয়া আসে; তবে তাহাদের বস্তু সমান বলা হয়। আর যদি অসমান বেগে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে যেটার বেগ অধিক সেটায় বস্তু অল্প, যেটার বেগ অল্প সেটায় বস্তু অধিক বলিয়া গৃহীত হয়।

পরস্পরের ধাক্কা পাইয়া যাহা অধিক বিচলিত হয়, তাহাতে অল্প বস্তু ও যাহা অল্প বিচলিত হয়, তাহাতে অধিক বস্তু আছে। দুই সমান বস্তু সমান ধাক্কা খাইয়া সমান বেগেই অর্জ্জন করে। বস্তু-পরিমাণের ইহাই বিজ্ঞানসম্মত উপায়। ওজন করিয়া বস্তু নির্দ্দেশের চেষ্টা অনুচিত; কেন না, স্থানভেদে ভারের তারতম্য হয়;

কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিতেছি, যাহা জড়ের জড়ত্ব, স্থানভেদে তাহার কোন তারতম্য হয় না। এক সের চা'লের বা দশ ভরি সোনার ভার সর্ব্বত্র সমান নহে, কিন্তু এক সের চা'ল সর্ব্বত্রই এক সের চা'ল, আর দশ ভরি সোনা সর্ব্বত্রই দশ ভরি সোনা। সের আর ভরি প্রকৃত পক্ষে বস্তু-পরিমাণ নির্দ্দেশ করে, ভারের পরিমাণ নির্দ্দেশ করে না। এক ভরি সোনা আর এক ভরি রূপা, উভয়ে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য থাকিলেও উভয়েরই বস্তু পরিমাণ সমান; কেন না, সমান ধাক্কায় উহারা সমান বলে বিচলিত হয়। হুগলিতেও হয়, আবার দিল্লীতেও হয়, ভূমণ্ডলেও হয়, আবার চন্দ্রমণ্ডলেও হয়। কাজেই এই ভরি-পরিমিত বস্তু সোনা-রূপার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নিজস্ব ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম পৃথিবীর সান্নিধ্যের কোন অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এক ভরি সোনা আর এক ভরি রূপার বস্তু যেন সমান হইল, কিন্তু উহাদের ভার সমান হইবে কি না? তর্কশাস্ত্রে এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। কোন নৈয়ায়িক পণ্ডিত শত বৎসর মাথা ঘামাইয়াও এই প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিবেন না। বস্তু আর ভার এক নহে; বস্তু সমান হইলেই ভার সমান হইবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। জড় পদার্থের ভার উহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; কিন্তু যাহাকে বস্তু বলিয়াছি, তাহা জড় দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কাজেই এক ভরি সোনা ও এক ভরি রূপার বস্তু-পরিমান সমান হইলেও উহার ভার সমান হইতেও পারে, হইতে নাও পারে। সমান বটে কি না, উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

ভারের হেতু পৃথিবীর সান্নিধ্য—পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান। পৃথিবীর টান কোন্ জিনিষের উপর অধিক, তাহা পৃথিবীকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। যদি আমাদের গৃহকর্ত্রীদিগের মত পৃথিবী সোনাকেই বেশী পছন্দ করেন, তাহা হইলে এক ভরি সোনার ভার এক ভরি রূপার ভারের চেয়ে অধিক হইবে; আর যদি পৃথিবীর সেরূপ কোন পক্ষপাত না থাকে, তাহা হইলে এক ভরি সোনা ও এক ভরি রূপার ভার সমানই হইবে।

পৃথিবীর এইরূপ পক্ষপাত আছে কি না, তাহা পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের যিনি শীর্ষস্থানীয়, সেই নিউটন পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর এরূপ কোন পক্ষপাত নাই। এ বিষয়ে পৃথিবী একেবারে উদাসীন। পৃথিবীর কাছে মুড়ি-মিছরির এক দর, কাঁচ-কাঞ্চন তুল্যমূল্য, লোষ্ট্র-কাঞ্চনে সমান আদর। নিউটন পেণ্ডুলমের সাহায্যে এই তত্ত্ব নির্ণয় করেন: যিনি পদার্থবিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই ইহা জানেন; যিনি জানেন না, তাঁহাকে দুই কথায় বুঝাইতে পারিব না, অতএব এই বিচার লইয়া সময়-ক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না যে, এক ভরি সোনার ভার ঠিক এক ভরি রূপার ভারের সমান হইবে; অথবা পাঁচ সের চাউলের ভার পাঁচ সের লোহার বাটখারার ভারের সমান হইবে। বস্তু সমান হইলেই যে ভার সমান হইবে, ইহা নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও বলিবার অধিকার ছিল না; অথচ অদ্ভুত এই

যে, নিউটনের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইতেই মহাপণ্ডিত হইতে মহামূর্খ পর্য্যন্ত সকলেই ভারের সমতা দেখিয়াই বস্তুর সমতা মানিয়া লইয়া আসিতেছি।

তুলদাঁড়ির এক পাল্লায় চাউল আর অন্য পাল্লায় লোহার বাটখারা রাখিয়া, নিক্তির এক ধারে রূপা এক ধারে সোনা রাখিয়া, আমরা ভারের সমতা দেখিয়া লই। ঐ তুলাদণ্ড বা নিক্তি ওজনের যন্ত্র, ভার নিরূপণের যন্ত্র, বস্তু-নিরূপণের যন্ত্র নহে। ওজন করিয়া দেখি আমরা ভার, কিন্তু চাই আমরা বস্তু। চাউলের যদি ভার নাই থাকিত, তাহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি হইত না; ক্ষুধানিবৃত্তি সমান হইত, পরন্তু মুটে-ভাড়া লাগিত না। সোনার ভার না থাকিলে গৃহিণীদের লাভ বিনা লোকসান হইত না। কাজেই চাই আমরা বস্তু, কিন্তু দেখিয়া লই ভার। নিক্তির দুই পাল্লায় বস্তু সমান হইলে ভারও সমান হয়; কেন না, পৃথিবী অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে দুই ধারেই সমান টান দেন; সোনা আছে কি রূপা আছে, তাহা দেখেন না। পৃথিবী যদি সোনারূপার সমান আদর না করিতেন, তাহা হইলে দুই পাল্লায় সমান বস্তু রাখিলেও ওজনে ভার সমান হইত না। সোনার প্রতি টান অধিক হইলে সোনার দিক্‌টাই পৃথিবীর দিকে ঢলিয়া পড়িত। অতএব বস্তুসামান্যে ভারসামান্য হয়, ইহাও পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে।

রসায়নবেত্তা পণ্ডিতের হাতে এই নিক্তি যন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করে। এই যন্ত্রটি কাড়িয়া লইলে তিনি একবারে ঢালতলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারে পরিণত হন। কিন্তু নিক্তি যত ক্ষণ হাতে থাকে, তত ক্ষণ তিনি গাণ্ডীবধারী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।

এই নিক্তির সাহায্যে তিনি এক অদ্ভুত তথ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। লোহা আর গন্ধক একত্র তপ্ত করিলে উহা এক নূতন দ্রব্যে পরিণত হয়, তাহা না—লোহা, না—গন্ধক। এই অভিনব জিনিষে লোহার লোহত্ব বা গন্ধকের গন্ধকত্ব কিছুই থাকে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্বাদ, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া উভয়ের যোগে এক নূতন জিনিস তৈয়ার হয়।

রসায়নবিৎ পণ্ডিত কিন্তু নিক্তির ওজনে দেখাইবেন, পুরাতন দ্রব্য সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার ভারটুকু যায় নাই। লোহা আর গন্ধক ওজন করিয়া লয়, দেখিতে পাইবে যে, যে-নূতন দ্রব্য উভয়ের সম্মিলনে উৎপন্ন হইল, তাহার ভার নিক্তির ওজনে লোহার ভারের ও গন্ধকের ভারের ঠিক যোগ-ফল।

ফলে জিনিষের রূপান্তর হয়, কিন্তু নূতন জিনিষে সাবেক ভারটুকু বজায় থাকে। আবার যখন পৃথিবীর নিরপেক্ষতার ফলে ভার সমান দেখিলে বস্তুও সমান বলিতে হয়, তখন মানিতে হয় যে, যখন এই রাসায়নিক সম্মিলনে ভারের তারতম্য হয় নাই, তখন বস্তুর পরিমাণেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই।

রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্ত নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের পরীক্ষাগারে সহস্রবিধ রাসায়নিক কাণ্ড অহরহঃ সম্পাদিত হইতেছে। আবার প্রকৃতির বৃহত্তর পরীক্ষাগারে কত রকমের রাসায়নিক কাণ্ড নিত্য ঘটিতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু নিক্তিধারী রসায়নবিৎ জোরের সহিত বলিতে চাহেন, এই সকল কাণ্ড কারখানায় জড় পদার্থের বস্তু-পরিমাণের কিছু মাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এক কণিকাও নূতন জন্মে

না, এক কণিকারও ধ্বংস হয় না। বস্তুর যখন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, অর্থাৎ জড়ের জড়ত্ব যখন কমেও না, বাড়েও না, তখন জড় পদার্থ অবিনাশী, এবং সম্ভবতঃ অনাদি। অতএব লাবোয়াশিয়ার সময় হইতে শতাধিক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড় পদার্থকে অমরত্ব দিয়া তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নানা উপাচারে তাহার পূজা আরম্ভ করিয়াছেন।

জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই, ইহা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য; নিক্তির ওজনে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ এমন পণ্ডিত অনেকে আছেন, যাঁহারা ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি বা অবস্তুতে বস্তুর পরিণতি, উভয়ই মানব-মনের কল্পনাতীত; অতএব ঐ তথ্য স্বতঃসিদ্ধ সত্য। অনেক বড় বড় দার্শনিক এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া এই স্বতঃসিদ্ধের সমর্থনে প্রয়াস পাইয়াছেন। সে দিনও দেখিলাম, আমষ্টার্ডম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলমানের কেমিষ্ট্রি গ্রন্থের ইংরেজী তর্জমায় এই প্রসঙ্গে ছোট হরপে মুদ্রিত হইয়াছে যে, জড় পদার্থের অবিনাশিতা কেবল পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্য নহে। উহার অন্যথাভাব কল্পনাতীত, অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ।

বস্তুহীন জড় পদার্থের কল্পনা হইতে পারে না, ইহা বলিতে পারি না, তবে ঐ সকল বস্তুহীন পদার্থকে জড় পদার্থ নাম না দাও, সে স্বতন্ত্র কথা। বৈজ্ঞানিকেরা কল্পনা করিয়াছিলেন যে, ঈথর নিজে বস্তুহীন পদার্থ, তবে ঈথরে ছোট ছোট ঘুর্ণি জন্মিয়া উহাকে বস্তুবিশিষ্ট জড় পদার্থে পরিণত করে। যাক, এই সকল হেঁয়ালির আলোচনায় এখন ক্ষান্ত থাকা যাক। কিন্তু আজকাল একটা নূতন তত্ত্বের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেটাকে একবারে ফেলিতে পারা যায় না। তাড়িত নামক পদার্থ এত কাল সম্পূর্ণ হেঁয়ালির মধ্যে ছিল। সেই হেঁয়ালি এখনও আছে; কিন্তু তাড়িতের কণিকা লইয়া এখন আমরা খেলাধূলা আরম্ভ করিয়াছি। রেডিয়ম নামক ধাতুর কথা খবরের কাগজের প্রসাদে সকলেই শুনিয়াছেন; এই রেডিয়ম হইতে তাড়িতের কণিকা সর্ব্বদা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কেবল রেডিয়ম কেন, আরও নানাধিক জিনিষ হইতে তাড়িতের কণা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা নূতন আবিষ্কার। এই তাড়িতকণিকাগুলি কিম্ভুতকিমাকার পদার্থ। ইহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে। এই তাড়িত-কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া চলে; কোথায় কত বেগে ছুটিতেছে, তাহাও নিরূপিত হইয়া গিয়াছে। কাচে রেশম ঘষিয়া বা গালায় পশম ঘষিয়া যখন ঐ ঐ বস্তুতে তাড়িতের সঞ্চার করা যায়, তখন তাড়িতের কণিকাগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া সরিয়া আসে, এবং নিশ্চল ভাবে স্থির থাকে। টেলিগ্রাফের তারের ভিতর দিয়া তাড়িতের কণিকাগুলি ধীরে চলে; কিন্তু রেডিয়ম ধাতু হইতে কণিকাগুলি অত্যন্ত বেগে ছুটিয়া বাহির হয়। এই তাড়িত কণিকাগুলি জড় পদার্থ বটে কি না, ইহাই সমস্যা। কণিকাগুলির ভার আছে কি না, কেহ জানে না, কিন্তু তাহাদের বস্তু আছে, সে বিষয়ে এখন বড় একটা সংশয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা দেখিয়া বস্তুর নিরূপণ হয়, জড়ের জড়ত্ব প্রতিপন্ন হয়। ঘোড়া হঠাৎ ছুটিলে সওয়ার পিছনে ঝুঁকিয়া পড়েন;

ঘোড়া হঠাৎ থামিলে সওয়ার সম্মুখে টলেন ; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, ঘোড়া এবং সওয়ার উভয়েরই দেহ জড়ত্বযুক্ত ; উভয়েরই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা আছে। তাড়িতেরও সেইরূপ ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবার ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই আজ আমরা তাড়িতের ধাক্কা প্রয়োগে টানাপাখা হইতে ট্রামগাড়ী পর্যন্ত চালাইতে সমর্থ হইয়াছি এবং বিজুলী বাতি জ্বালাইয়া আঁধার ঘর আলো করিতেছি। মাইকেল ফারাডে, যাঁহার প্রসাদে আজ আমরা বিজুলী বাতির আলো ও টানাপাখার হাওয়া ভোগ করিতেছি, তাড়িতের এই ধাক্কা দিবার ও ধাক্কা খাইবাব ক্ষমতা তাঁহারই আবিষ্কৃত। তাঁহার পূর্ব্বে এই তথ্য গুহায় নিহিত ছিল।

তাড়িতে যখন এই ক্ষমতা আছে, তখন উহা বস্তুবিশিষ্ট জিনিস এবং উহাতে জড়ত্ব বর্ত্তমান। তাড়িত-কণিকার আবিষ্কারের পর দেখা গিয়াছে, তাড়িতের কণিকা-গুলিতেও এই জড়ত্ব বিদ্যমান আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাড়িতের কণিকা-গুলি যত ক্ষণ স্থির থাকে, অচল থাকে, তত ক্ষণ উহাদের জড়ত্ব থাকে না ; যখন বেগে চলে, তখনই উহাদের জড়ত্ব জন্মে ; এবং যখন বেগ খুব বাড়ে, তখন জড়ত্বও বাড়িয়া যায়। যাঁহারা বিশেষজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের নিকট এই সকল কথা নিতান্তই হেঁয়ালি ঠেকিবে ; কিন্তু উপায় নাই। এই সকল বাক্যের তৎপরতা বুঝাইবার এ সময় নহে। সোনা রূপা, জল বাতাস প্রভৃতি আমাদের চিরপরিচিত জড় পদার্থের সহিত এই অভিনব জড় পদার্থের এইখানে প্রভেদ। পাঁচ ভরি সোনার বস্তু-পরিমাণ সর্ব্বদাই পাঁচ ভরি ; উহা বাক্সে বন্ধ থাকিলেও পাঁচ ভরি, আর বেগে ছুটিলেও পাঁচ ভরি। কিন্তু তাড়িত-কণিকাগুলি যখন ধাতু-পদার্থের গায়ে নিশ্চলভাবে জমিয়া থাকে, তখন উহাদের বস্তু-পরিমাণ নাস্তি ; যখন টেলি-গ্রাফের তার বাহিয়া চলিতে থাকে, তখন অস্তি ; আর যখন রেডিয়ম হইতে ছুটিয়া বাহির হয়, তখন অত্যন্ত অধিক মাত্রায় অস্তি। সেকেণ্ডে দশ বিশ হাজার ক্রোশ বেগে ছুটিতেছে, এমন তাড়িত-কণিকা আজকাল বৈজ্ঞানিকদের হাতের মুঠায় ; ঐ সকল কণিকার বস্তু-পরিমাণ প্রচুর। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়াছেন যে, যে-কণিকার বেগ সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশের কাছাকাছি, তাহার জড়ত্ব একবারে অপরিমেয়—পরিমাণের অতীত হইবার সম্ভাবনা হয়। সোনা রূপা, জল বাতাসের বস্তু-পরিমাণ বেগ বাড়িলে বাড়ে না, কিন্তু তাড়িত-কণিকার বেগ-বৃদ্ধির সহকারে উহার পরিমাণও বাড়িয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তাড়িত-কণিকাকে জড় পদার্থ বলিব কি না, এইরূপ আপত্তি ঘটিতে পারে। কিন্তু জড় পদার্থ—সোনা রূপার মত জড় পদার্থ—বহুসংখ্যক তাড়িত-কণিকার সমবায়ে উৎপন্ন, এইরূপ একটা নূতন কথা উঠিয়াছে। রেডিয়ম প্রভৃতি ধাতু-দ্রব্যের পরমাণুগুলি আপনা হইতে শত খণ্ডে ভাঙ্গিতেছে এবং সেই ভঙ্গুর পরমাণুর মধ্য হইতে তাড়িত-কণিকা ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, জড় পদার্থের পরমাণুগুলি বহু তাড়িত-কণিকাযোগেই নির্ম্মিত। প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে শ-দরুনে বা হাজার দরুনে তাড়িত-কণিকা আটকান আছে ; আটকান আছে বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট

পরিধির মধ্যে তাহারা বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক-একটা পরমাণু যেন এক-একটা ঘূর্ণি—বহুসংখ্যক তাড়িত-কণিকার ঘূর্ণি। কেল্‌বিন ঈথরের মধ্যে ঘূর্ণির কল্পনা করিয়াছিলেন ; এখন কল্পনা হইতেছে, জড় পরমাণু তাড়িত-কণিকার ঘূর্ণি। ঘূর্ণির মাঝে পড়িয়া কণিকাগুলি বেগে ঘুরিতেছে, এই জন্যই উহাদের বস্তুমত্তা ; এবং কণিকাগুলির বস্তুমত্তার ফলে পরমাণুটিরও বস্তুমত্তা। এই বস্তুমত্তা যখন বেগসাপেক্ষ, তখন জড় পদার্থের উৎপত্তি নাই বা ধ্বংস নাই বলিয়া শান্তি উপভোগ আর চলিবে না। বেগ বাড়িলে যদি বস্তু বাড়িয়া যায়, তখন বস্তুর উৎপত্তি নাই, এ কথা টিকিবে কেমন করিয়া ?

জড় পদার্থের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানশাস্ত্র হইতে জড় পদার্থকে একবারে নির্ব্বাসন করিতে চাহেন এবং জড়ের স্থানে শক্তি নামক পদার্থকে বসাইয়া তাঁহারই শ্রীচরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ করিতে চাহেন। জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে ইঁহারা অনিচ্ছুক। আমাদের জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে কারবার করে না ; শক্তির সহিতই ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ; শক্তির আঘাত পাইয়া শক্তির বাহনস্বরূপ জড়ের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। এই হেতু জড়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারবার না দেখিয়া জড় পদার্থের কল্পনা হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্রকে অব্যাহতি দিতে এই দলের পণ্ডিতেরা উৎসুক। আগে বলা হইত, জড় শক্তি-দেবতার বহিন ; শক্তির আধার জড়। এখন ইঁহারা বলিতেছেন, শক্তি সর্ব্বময়ী ; জড়ের অস্তিত্ব কল্পনাই অনাবশ্যক ; জড়ের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের কোন ক্ষতি হইবে না।

বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত এই শক্তির তাৎপর্য্য কি ? কাব্যের ভাষা ছাড়িয়া বিজ্ঞানের ভাষায় উপস্থিত হইলে দেখা যায়, এই শক্তি কাজ করিবার শক্তি। এই কাজ শব্দটি আবার বিজ্ঞানশাস্ত্রে অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই কাজ করা আর বোঝা নামান প্রায় একই কথা। কোন ভারী জিনিষ যখন উপর হইতে নীচে নামে, তখন সে কাজ করে ; আর যত উর্দ্ধে উঠে, তত কাজ করিবার ক্ষমতা পায়। পৃথিবীর টানে সকল বস্তুরই ভূকেন্দ্রাভিমুখে চলিবার প্রবৃত্তি আছে ; সেই প্রবৃত্তির অনুসরণে ভূমির অভিমুখে যাহা পড়ে, তাহা কাজ করে। প্রোফেসর রামমূর্ত্তির মত বুকের উপর চব্বিশ ঘণ্টাকাল হাতী চড়াইয়া রাখিলে কোন কাজ হয় না, কিন্তু এক কাঁচ্চা দ্রব্য হাত-খানেক নীচে নামিলেই খানিকটা কাজ হয়। দুই হাত নামিলে দ্বিগুণ কাজ হয়। যেখানে যত রকম শক্তি আছে, সমস্তই এই কাজ করিবার শক্তি। বেগে চলন্ত বস্তুর শক্তি আছে ; কেন না, চলন্ত বস্তু যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিয়া সেই বোঝাকে কাজ করিবার শক্তি দেয়। তপ্ত দ্রব্যের শক্তি আছে ; কেন না, উহার উত্তাপ দ্বারা যন্ত্রযোগে বোঝা তুলিতে পারা যায়। তাড়িতযুক্ত দ্রব্যের শক্তি আছে ; কেন না, ঐ তাড়িত প্রয়োগেও আমরা বোঝা তুলিতে পারি। কয়লাতে শক্তি আছে ; কেন না, ঐ কয়লা পোড়াইয়া আমরা বোঝা তুলিতে পারি। এঞ্জিনে আমরা কয়লা পোড়াইয়া কয়লার অন্তর্নিহিত শক্তি বাহির করিয়া লই এবং সেই শক্তির প্রয়োগে বড় বড় বোঝা উর্দ্ধে তুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র জড়কে অবিনাশী বলিয়াছিল,—আর উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তির অবিনাশিতা প্রতিপন্ন করিয়া জয়ধ্বজা তুলিয়াছে। শক্তির অবিনাশিতা অর্থে এই বুঝা যায় যে, শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহার পরিমাণের কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এই তত্ত্বটি স্পষ্ট বুঝিতে হইলে দুই একটা দৃষ্টান্ত আবশ্যক হইবে।

চলন্ত দ্রব্যের শক্তিমত্তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু চলন্ত দ্রব্যের শক্তি অতি সহজে উত্তাপে পরিণত করা যায়। নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির ঘা মারিলে হাতুড়ি ও নেহাই উভয়ই গরম হইয়া উঠে ; চলন্ত রেল গাড়ীর এঞ্জিন ব্রেক দিয়া থামাইবার সময় এঞ্জিনে, গাড়ীতে, আরোহীতে ও লগেজে যে শক্তিরাশি সঞ্চিত ছিল, তাহার সমস্তটা উত্তাপে পরিণত হইয়া ব্রেকের পিঠ হইতে ঝর-ঝর করিয়া অগ্নিকণা নিকলিতে থাকে। চলন্ত দ্রব্য থামিয়া যায়, তাহার শক্তির তিরোধান ঘটে ; কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে খানিকটা উত্তাপের আবির্ভাব হয়। এখানে হইল চলন্ত দ্রব্যে যে শক্তি নিহিত ছিল সেই শক্তির উত্তাপে পরিণতি। আবার উত্তাপের পরিণতিতে নিশ্চল দ্রব্য চলচ্ছক্তি পাইয়া বেগে চলিতে থাকে। উদাহরণ এঞ্জিন ; এখানে কয়লা পোড়াইলে উত্তাপ জন্মে, সেই উত্তাপের কিয়দংশের তিরোভাব ঘটে ; তৎপরিবর্ত্তে এঞ্জিনযুক্ত রেলগাড়ী মায় আরোহী ও লগেজ চলিতে আরম্ভ করে—অর্থাৎ চলচ্ছক্তি অর্জন করে। উত্তাপ লুপ্ত হয়, উত্তাপের স্থানে শক্তি অন্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। বলা হয়, এই সকল দৃষ্টান্তে শক্তির ধ্বংস বা উৎপত্তি হয় না ; তবে দেখা যায় যে, শক্তি এক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে ; কিন্তু শক্তির পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে নাই। দেখা যায় যে, জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শক্তির আনাগোনা, চলাফেরা চলিতেছে ; সেই অবসরে শক্তি এক মূর্ত্তি ছাড়িয়া অন্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিতেছে ; কিন্তু শক্তির পরিমাণের ইতরবিশেষ ঘটিতেছে না। জগতে ক্রিয়াশীল যাবতীয় শক্তির যাবতীয় মূর্ত্তি কুড়াইয়া সঙ্কলিত করিলে দেখা যাইবে, শক্তির পরিমাণে ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। শক্তির এক কণিকা কেহ নূতন উৎপাদন করিতে পারে না বা এক কণিকা কেহ ধ্বংস করিতে পারে না।

বিশ্ববিখ্যাত জুল সাহেব এইরূপ হিসাব দিয়াছিলেন। এক সের জলকে এক ডিগ্রী গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, সেই উত্তাপকে যদি এঞ্জিন-যোগে রূপান্তরিত করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা এক সের জল পোনে আট শত ফুট উর্দ্ধে তোলা চলিবে। পক্ষান্তরে পোনে আট শত ফুট উঁচু হইতে এক সের জল ঢালিয়া দিলে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা যদি ছড়াইয়া না পড়িয়া সেই এক সের জলেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ঐ জল এক ডিগ্রী গরম হইবে। অর্থাৎ এক সের জলকে পোনে আট শত ফুট উপরে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তি উত্তাপে পরিণত হইলে সেই জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রী মাত্র বাড়াইয়া দিবে।

সর্ব্বত্র এইরূপ হিসাব বাঁধা আছে। এতটা চলচ্ছক্তি খরচ করিয়া আমরা এতটা উত্তাপ পাই, আবার এতটা উত্তাপ খরচ করিয়া আমরা এতটা চলচ্ছক্তি পাই।

সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এক রকমের শক্তি পাওয়া যায় না। কোন স্থানে কোন রকমের শক্তির তিরোভাব ঘটিলে অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, কোন-না-কোন স্থানে অন্য রকমের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, শক্তির রূপ পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। শক্তি অবিনাশী, সম্ভবতঃ অনাদি।

বলা হয়, এক সের জল এক ডিগ্রী গরম করিতে যে উত্তাপ লাগে, আর এক সের জলকে পৌনে আট শত ফুট উচ্চে তুলিতে যে শক্তি লাগে, উভয়েরই পরিমাণ সমান। কিন্তু এই সমানতা কিরূপ? এই প্রবন্ধের আরম্ভেই এই সমান শব্দটির তাৎপর্য্য লইয়া কিছু গোলে পড়া গিয়াছিল। এখানেও সেই গোল আছে কি না?

একটা টাকা দুইটা আধুলির সমান: কিরূপ সমান? টাকা যে জিনিষে অর্থাৎ যে রূপাতে নির্ম্মিত, আধুলিও সেই রূপাতে নির্ম্মিত। এ বিষয়ে টাকায় ও আধুলিতে সমানতা আছে। নিক্তির এক পাল্লায় টাকা, আর পাল্লায় দুটা আধুলি রাখিলে দেখা যাইবে, উভয়েরই ভার সমান। তুলা-যন্ত্রে ভারের তুলনা করিয়া সমান দেখা যায়, অতএব এক টাকা ভার-পরিমাণে দুই আধুলির তুল্য। আবার ভার সমান হইলে বস্তুপরিমাণ সমান হয়, এই হেতু বস্তুপরিমাণেও উহারা তুল্য। পরন্তু এক টাকার বদলে দুই আধুলি এবং দুই আধুলির বদলে এক টাকা সর্ব্বদা পাওয়া যায়; উহাদের মূল্য সমান; অতএব বাজারে খরিদ-বিক্রয়ে, বিনিময় ব্যাপারে উহারা তুল্যমূল্য। অতএব একটা টাকা ও দুইটা আধুলি উপাদানে সমান, ভারে সমান ও বস্তুপরিমাণে সমান এবং মূল্যেও সমান।

আবার আমরা বলি, একটা টাকা ষোল আনা পয়সার সমান। এবার কিরূপ সমান? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এখানে উপাদান এক নয়; ভারও এক নয়; একটা টাকায় যে বস্তু আছে, ষোল আনা পয়সায় বস্তু তার চেয়ে প্রচুর অধিক আছে; তবে কিসে সমান? উত্তর,—উভয়ের মূল্য সমান; এক টাকার বদলে সর্ব্বদা ষোল গণ্ডা পয়সা এবং ষোল গণ্ডা পয়সার বদলে সর্ব্বদা একটা টাকা পাওয়া যায়, এই বলিয়া উহারা তুল্যমূল্য; এখানে সমান অর্থে তুল্যমূল্য; সকল বিষয়ে তুল্য নহে।

অতএব টাকাকে আমরা যে অর্থে দুই আধুলির সমান বলি, ঠিক সে অর্থে উহাকে ষোল আনা পয়সার সমান বলিতে পারি না। ইংরেজী ভাষায় এক টাকা ও ষোল আনা পয়সাকে equal না বলিয়া equivalent বলা হয়।

শক্তি পক্ষে সমানতা কিরূপ হইবে? এক রকমের শক্তি খরচ করিয়া যখন আমরা তাহার বিনিময়ে অনুরূপ শক্তি পাই এবং সেই বিনিময়ের হার যখন বাঁধা আছে, কতটার বদলে কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বাঁধা আছে, তখন ইহার ঐ দুই মূর্ত্তিভেদকে তুল্য না বলিয়া তুল্যমূল্য বলাই উচিত; equal বা সমান বা তুল্য না বলিয়া equivalent বা তুল্যমূল্য বলাই উচিত। খানিকটা উত্তাপের বিনিময়ে যতটা গতিশক্তি পাওয়া যায়, তাহাকে উত্তাপের equal না বলিয়া উত্তাপের equivalent বলাই হইয়া থাকে। জুল সাহেব heatএর mechanical equivalentই বাহির করিয়াছিলেন।

বস্তুতই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদের মধ্যে আর কোনরূপ সাদৃশ্য বা সজাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এক মাত্র দৃষ্ট হয় তুল্যমূল্যতা। তাড়িত শক্তির সহিত তাপশক্তির কোথায় কোন গূঢ় সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা এখনও বলিতে পারেন না, কিন্তু এতটা তাড়িত শক্তির বদলে এতটা তাপশক্তি পাওয়া যাইবে, তবে তাঁহারা অক্লেশে নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন। একটা টাকা বদল দিয়া কত পয়সা পাওয়া যাইবে, অথবা একখানা নোটের বদলে কত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা গবর্মেণ্ট বাঁধিয়া দিয়াছেন। যত দিন গবর্মেণ্টের সেই আইন প্রচলিত থাকিবে, তত দিন ঐরূপ বিনিময়ে কাহাকে ঠকিতে হইবে না। হাজার টাকার বদলে একখানা চোতা কাগজ পাইয়াও আমি অশ্চিন্ত থাকিব যে, আমার সম্পত্তিতে এক পয়সা কমে নাই : আমার ধানের পরিমাণে কিছু মাত্র ক্ষতি হয় নাই। প্রকৃতিরাণীর গবর্মেণ্টেও ঐরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। এখানেও তাড়িত শক্তির বিনিময়ে উত্তাপ ও উত্তাপের বিনিময়ে তাড়িত শক্তি পাওয়া যায় এবং বিনিময়ের হারও নিৰ্দ্দিষ্ট আছে। হার নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়াই হাজার মণ বোঝা তুলিতে কত মণ কয়লা পোড়াইতে হইবে, তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারি এবং চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া বিজুলি বাতি জ্বালাইতে কত গ্রেণ কয়লা বা দস্তা পোড়াইতে হইবে, তাহার হিসাবেও কখনও ঠকিতে হয় না। দুই গবর্মেণ্টে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতিরাণীর এলাকা বিশ্বব্যাপী ; আর তাঁহার আইন-কানুনে, বিধিব্যবস্থায় কখনও খামখেয়ালি নাই। তদ্ভিন্ন উভয়ত্র আর কোন ভেদ নাই!

যদি একটা গরুর বদলে দশটা ভেড়া ও দশটা ভেড়ার বদলে একটা গরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই গো-স্বামী, সমস্ত গরুকে ভেড়ায় পরিণত করিয়া মনে মনে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন,—আমার গোশালায় কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই এবং বিনিময়েব ঐ হার যদি চিরকাল বজায় থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ অদল-বদল করিয়া কখনও তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না ; এমন কি, এই অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে দশটা গরু একটা ভেড়ার সমান বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া গরু ভেড়া হইবে না বা ভেড়া কখনও গরু হইবে না ; এবং গরু ও ভেড়া সর্ব্ব বিষয়ে সমান করিয়া গৃহীত হইবে না। আমার গোয়াল-ঘরে যে সম্পত্তি গরুমূর্ত্তিতে বা ভেড়ার মূর্ত্তিতে বা গরু ভেড়া এই দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে সঞ্চিত আছে, তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই বলিয়া যতই বড়াই করি, বাজার-দরে উভয়ের মূল্য হঠাৎ কমিয়া গেলে আমার সেই বড়াই চুরমার হইয়া যাইবে। এই বৃহত্তর বিশ্বশালায় শক্তির কখনও ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে ইহা একটি পরীক্ষালব্ধ সত্য ; কিন্তু ইহার ভিতর কোনরূপ স্বতঃসিদ্ধতা নাই। এই যে পারিভাষিক অর্থ, তাহা আমরাই অর্পণ করিয়াছি। কাজ করিবার ক্ষমতাকেই আমরা শক্তি বলি ; এই পারিভাষিক অর্থ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনগড়া। এবং সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাইবে যে, সেই কল্পিত মনগড়া পদার্থের বিবিধ মূর্ত্তির মধ্যে যে সম্পর্ক আমরা আবিষ্কার করিতেছি, তাহারও অধিকাংশই আমাদের মনগড়া। এই শক্তির কোন ধর্ম্ম আমরা যদি পর্য্যবেক্ষণ আবিষ্কার করি, তাহাতে স্বতঃসিদ্ধতা কিছুই থাকিতে পারে না।

ফলে যে সকল জাগতিক সত্য লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করি ও তাহাদিগকে সনাতন সার্ব্বভৌমিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি, মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহারা সর্ব্বত্রই আমাদের মনঃকল্পিত সত্য। সত্যরূপী পরম দেবতা কোথায় কি ভাবে আছেন আমরা জানি না ; আমরা কেবল "উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং" কতকগুলা মনগড়া পুতুল স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া তাহাদের পূজা করিতেছি।

ফলতঃ আমরা পাঁচটি মাত্র সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া এই বিশ্ব-জগতের কিয়দংশমাত্র প্রত্যক্ষ করি ; এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর কোথায় কি আছে, তাহার কোন সন্ধান রাখি না। অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আমাদের জ্ঞান আবদ্ধ আছে ; ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যদি কোন কালে না পাই, তাহা হইলে এই সঙ্কীর্ণ সীমার বাহিরে আমরা কখনও যাইতে পারিব না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় যেরূপে যে ভাবে আমাদিগকে জানায়, তেমনি ভাবে সেইরূপে আমরা জানিতে পারি। দর্শন শ্রবণ স্পর্শ প্রভৃতি পরিচিত ব্যাপারের উপযোগী বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গুলি না থাকিয়া অন্য কোনরূপ ব্যাপারের উপযোগী অন্য কোনরূপ ইন্দ্রিয় যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইত। বর্ত্তমান প্রাকৃতিক বিধানে জাগতিক অভিব্যক্তির পরিণামে আমরা বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বর্ত্তমান মনোবৃত্তি পাইয়াছি। বিশ্ব-জগৎ আমাদিগকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, আমরা সেইরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছি ও গড়িয়া উঠিতেছি, এবং এই সঙ্কীর্ণ গঠনপ্রণালীর ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে অংশকে আমরা যে ভাবে দেখিবার অধিকার পাইয়াছি, সে অংশকে সেই ভাবেই দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয় অন্যরূপ হইলে জগতের মূর্ত্তিও অন্যরূপ হইত ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষায় সেই একই জগতের মূর্ত্তির অন্যরূপ বিবরণ দিত। যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় বিকৃত বা সর্ব্বসাধারণের তুল্য নহে, তাহার নিকট জগতের মূর্ত্তিও অন্যরূপ ; এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান ভাষা তাহার নিকট অর্থহীন। আমরা অধিকাংশ লোকে যাহা দেখিতেছি, তাহা বিশ্ব-জগতের একটা বিশিষ্টরূপ সঙ্কীর্ণ মূর্ত্তি মাত্র ; —আমাদেরই বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে লব্ধ এই মূর্ত্তি আমরা আমাদের মতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছি, এবং ইহার বিশেষ বিশেষ অংশের বিশেষ বিশেষ নাম দিয়াছি। জড় ও শক্তি আমারই মনঃকল্পিত পদার্থ মাত্র। একটা সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে উহাদের অবিনাশিতা আমরা কল্পনা করিয়া লইয়াছি। অন্যরূপ পারিভাষিক অর্থ দিলে এই জড়ের এবং এই শক্তির অবিনাশিতা থাকিত না ; তাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভাষা অন্যরূপ হইত, কিন্তু ফল অন্যরূপ হইত না। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-কর্ম্ম সেই সঙ্কীর্ণ মনগড়া-মূর্ত্তি কল্পনার প্রধান উপায়। বিশ্ব-জগৎকে যেরূপে যে ভাবে দেখিলে আমাদের জীবনযাত্রা সুসাধ্য হয়, বিশ্ব-জগৎ আমাদিগকে তেমনই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে ও আমরাও বিশ্ব জগৎকে তেমনই ভাবে দেখিতেছি। বাহ্য জগৎ আর অন্তর্জ্জগৎ পরস্পরকে পরস্পরের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইয়াছি ; অন্য ভাবেও যে গড়িতে পারিত না, এমন নহে। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উভয়ের পরস্পর উপযোগিতা না থাকিলে আমরা ক্ষণ মাত্র টিকিতে

পারিতাম না। উপযোগিতা আছে বলিয়াই আমাদিগকে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় না। প্রকৃতির বিধানই এইরূপ। জীবনযাত্রায় ঠকিতে হইলে আমরা টিকিতে পারিতাম না। কিন্তু গোড়ার কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পিত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে এই সকল পরীক্ষালব্ধ বা পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে পরমার্থ-সত্য কিছুই নাই। সমস্তই ব্যবহার মাত্র; আমরা দেবতাকে না পাইয়া কতকগুলি পুতুল কল্পনা করিয়াছি এবং এক-একটি পুতুলের এক-একটি মূর্তি কল্পনা করিয়াছি। বিজ্ঞানবিদ্যা যে মানুষের মনগড়া মূর্ত্তিগুলির জন্য দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শো-পচারে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানের কোন দোষ বা হীনতা নাই; কেন না, যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তাহা মানুষেরই বিজ্ঞান; প্রকৃতি সঙ্কীর্ণ ভাবে—জীবনযাত্রার অনুকূল সঙ্কীর্ণ ভাবে—মানুষকে গড়িয়াছেন বলিয়াই মানুষের বিজ্ঞানকেও তন্নির্ম্মিত সঙ্কীর্ণ দেবালয়ের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে।

আরও একটু সূক্ষ্ম কথা এই যে, আমরা সকলে বিশ্ব জগতের যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে সর্ব্বোতোভাবে এক বা সমান নহে; আমার দৃশ্যমান জগতের রূপ তোমার দৃশ্যমান জগতের রূপের সমান নহে; আফিমের নেশায় জগতের রূপ ভিন্ন হয়; পাগলের নিকট জগতের রূপ অত্যন্ত ভিন্ন। সুস্থ মানবের পক্ষেও প্রত্যেকের নিকট জগতের রূপে কিছু না-কিছু ভেদ আছে। আমরা দশ জনে মিলিয়া প্রত্যেকের বিশিষ্ট অংশ বর্জ্জন করিয়া যে সাধারণ অংশটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া জগতের যে রূপ কল্পনা করি, বিজ্ঞানবিদ্যা কেবল সেই রূপেরই আলোচনা করে এবং তাহারই বিবরণ দিবার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের আলোচিত বিশ্ব-জগৎ প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ হইতে ভিন্ন; বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎ প্রকৃতপক্ষে মানব সাধারণের জন্য কল্পিত একটা কাল্পনিক জগৎ; উহার কোনরূপ পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই বা থাকিতে পারে না। এই কাল্পনিক জগতের সহিত, আমরা প্রত্যেকে যে জগতের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি, সেই জগতের যেখানে মিল দেখিতে পাই না, সেখানে আমরা হতবুদ্ধি হই ও নানারূপ অতিপ্রাকৃতের বিভীষিকা দেখি। আমাদের সকলের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা করিয়া লই এবং আমাদের নিজের প্রত্যক্ষ কোন কোন ঘটনার সেখানে স্থান দেখিতে না পাইয়া প্রকৃতির বাহিরে বা প্রকৃতির উর্দ্ধে একটা কিম্ভূতকিমাকার অতিপ্রাকৃত জগতের অস্তিত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ করি। বিজ্ঞানবিদ্যার মত ব্যাবহারিক বিদ্যার সহিত পারমার্থিক বিদ্যার বা তত্ত্ববিদ্যার চিরন্তন বিরোধের মূল এইখানে। বিচারপথে আরও একটু অগ্রসর হইলে দেখিতে পাই যে, 'আমরা' এই বহুবচনান্ত পদপ্রয়োগেও পরমার্থতঃ আমার অধিকার নাই; কেন না, যে তোমাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আমি এই বহুবচন প্রয়োগের অধিকারী হইয়াছি, সেই তোমরাও সেই কল্পিত বাহ্য জগতেরই অধিবাসী। বিজ্ঞানবিদ্যা তোমাদিগকে নহিলে অচল, কিন্তু পরমার্থবিদ্যা তোমাদের অস্তিত্ব স্বীকারে একেবারে বাধ্য নহে। তখন এক মাত্র আমিই বিদ্যমান থাকি, এবং প্রাকৃত জগৎ ও অতিপ্রাকৃত জগৎ উভয়ই আমার খেলার জন্য কল্পিত হইয়া দাঁড়ায়।

মৎকল্পিত ও মদ্রচিত বিশ্ব-জগতের দেবালয় জুড়িয়া আমিই এক মাত্র পরমদেবতা অধিষ্ঠান করি।

আমিই এই বিশ্ব-জগতের কল্পনাকর্ত্তা এবং আমিই উহার রচনাকর্ত্তা; ইংরেজীতে বলিলে আমিই এই বিশ্ব-জগতের ডিজাইনার ও আমিই উহার আর্কিটেক্ট। আমিই উহার 'রূপ' দিয়াছি এবং আমিই উহার 'নাম' দিয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে, কি জানি, কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি, এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর এক জন কল্পনাকর্ত্তার ও রচনাকর্ত্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ড শ্রমে আমি প্রবৃত্ত হই। অথবা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ, পরাধীনবৎ, বদ্ধবৎ আচরণেই,—এই পণ্ড শ্রম-স্বীকারেই,—আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।